গোয়েন্দাপীঠ

লালবাজার

এক ডজন খুনের রুদ্ধশ্বাস নেপথ্যকথা

সুপ্রতিম সরকার

স্বর্গত মা-বাবা...
মঞ্জুশ্রী সরকার এবং শক্তিব্রত সরকারকে

ভূমিকা

এই বইয়ের ভূমিকা লেখার অনুরোধটি যখন এল, অস্বীকার করব না, একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছিলাম।

বইটিতে সংকলিত সুপ্রতিম সরকারের লেখাগুলি সাইবার-দুনিয়ায় উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে বাংলায় এমন মনোগ্রাহী রহস্যকাহিনি লেখা হয়নি, মত পোষণ করেছেন বহু পাঠক-পাঠিকা। বইয়ের আকারে যখন প্রকাশিত হচ্ছে সেই লেখাগুলি, কীভাবে শুরু করব মুখবন্ধ, ধন্দে ছিলাম তা নিয়ে। ইন্টারনেটের শরণাপন্ন হয়ে অস্বস্তি আরও বাড়ল, যখন দেখলাম বইয়ের ভূমিকা তাঁদেরই সচরাচর লিখতে বলা হয়, যাঁদের নিজেদের প্রকাশিত বই রয়েছে, বা যাঁরা বিরল কোনও কৃতিত্বের অধিকারী। আমার ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুটি শর্তের কোনওটিই প্রযোজ্য নয়। ব্যক্তিপরিচয়ে নয়, ভারতের অন্যতম দক্ষ পুলিশবাহিনীর প্রধান হিসেবেই এই ভূমিকা লেখা।

একটু তলিয়ে ভেবে অবশ্য মনে হল, ভাল লেখকদের যা যা বই পড়েছি এ পর্যন্ত, সেগুলির ভূমিকা যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের একজনের নামও মনে করতে পারছি না। তাঁরা কী লিখেছিলেন ভূমিকাতে, মনে নেই তা-ও। এই ভাবনাটি মাথায় আসতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, চিন্তাও অদৃশ্য হয়ে গেল। বস্তুত, কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজে এবং ওয়েবসাইটে 'রহস্য রবিবার' সিরিজের লেখাগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকমহলে যে 'ঝড়' উঠেছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় সংকলনটি প্রকাশ করতে একরকম বাধ্যই হয়েছি আমরা। লিখনশৈলীর বিষয়ে পাঠপ্রতিক্রিয়া ছিল অভূতপূর্ব। এবং সত্যি বলতে, লেখাগুলি একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে উপায় থাকে না। এটা কম কৃতিত্বের নয়, কারণ কাহিনিগুলি সত্য ঘটনানির্ভর, লেখকের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না তথ্য এবং তদন্তের দিশা থেকে বিচ্যুত হওয়ার। শুধু লিখনশৈলীই নয়, আলোচিত মামলাগুলি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাদের পরিশ্রম ও দক্ষতার এক প্রামাণ্য নিদর্শন। এঁরা কেউ কল্পনার Sherlock Holmes বা Hercule Poirot নন, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এঁদের রহস্যভেদের ক্ষমতা এবং তদন্তের দক্ষতা বিশ্বের সেরা পুলিশবাহিনীগুলির সঙ্গে তুলনীয়।

যে বাহিনীতে এমন দুঁদে গোয়েন্দারা রয়েছেন, রয়েছেন সুপ্রতিম সরকারের মতো ক্ষমতাধর লেখক, সেই বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া বিরল সম্মানের। কলকাতা পুলিশের অফিসারদের পেশাদারিত্ব নিয়ে আমার কখনই কোনও সংশয় ছিল না। তবে এটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সুপ্রতিমের লিখনশৈলী আমার কাছে ছিল সানন্দ বিস্ময়ের মতো। স্বাদু লেখনিতে গোয়েন্দাদের অনন্য দক্ষতার কাহিনি পাঠকমহলে বিপুল সমাদর পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

রহস্যভেদের কাহিনির সমাবেশ যে বইয়ে, তার ভূমিকা শেষ করা যাক রহস্য দিয়েই। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি আজ থেকে ঠিক ৬৯ বছর আগের একটি খুনের মামলার প্রতি, যার কিনারা আজ পর্যন্ত হয়নি। ঘটনাটি ঘটেছিল অন্য মহাদেশে, অস্ট্রেলিয়ায়। ১৯৪৮ সালের ১ ডিসেম্বর এক অজ্ঞাতপরিচয় 'Caucasian' পুরুষের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। শনাক্তকরণের মতো কোনও চিহ্ন ছিল না দেহে। ট্রাউজারের পকেটে শুধু পাওয়া গিয়েছিল ওমর খৈয়ামের বিখ্যাত বই 'রুবাইয়াৎ'—এর একটি ছেঁড়া পাতা। যাতে লেখা ছিল 'তামাম শুদ' (এটি একটি পারস্যদেশীয় শব্দ, যার মানে 'শেষ হওয়া')। পাঠকরা নিশ্চয়ই পরিচিত 'কাম তামাম' শব্দ দুটির সঙ্গে, যা হিন্দিতে বহুলব্যবহৃত, এবং যা 'খুন'-এর ইঙ্গিতবাহী।

খুনি এক্ষেত্রে পেশাদারি দক্ষতায় মৃতদেহের পরিধান থেকে মুছে দিয়েছিল শনাক্তকরণের সমস্ত সম্ভাব্য চিহ্ন। এই মামলাটি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে জটিল হত্যারহস্য হিসাবে খ্যাত। প্রচলিত ধারণা, খুনটি হয়েছিল

কোনও অজানা বিষের প্রয়োগে। 'রুবাইয়াৎ'-এর যে সংস্করণটির ছেঁড়া পাতা পাওয়া গিয়েছিল মৃতের ট্রাউজারের পকেটে, সেটি তদন্তকারীরা খুঁজে বের করেছিলেন। বইটিতে একটি সংকেত লেখা ছিল, যার মর্মোদ্ধার আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার পুলিশ তো বটেই, শিক্ষাজগতের গুণীজনের বহু বছরের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও। সংকেতটির অর্থ উদ্ধার করলে তবেই খুনির পরিচয় জানা সম্ভব, সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল পুলিশ।

সংকেতটি তুলে দিলাম নীচে। রহস্যরসিক পাঠক চেষ্টা করে দেখতে পারেন মর্মার্থ উদ্ধারের।

'গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার' আপনাদের ভাল লাগবে, আশা রাখি।

রাজীব কুমার আই.পি.এস.
নগরপাল, কলকাতা

১ ডিসেম্বর, ২০১৭

লেখকের কথা

শুরুতেই বলে নিই, এ বই কোনও নির্দিষ্ট পূর্বপরিকল্পনার পরিণতি নয়। কলকাতা পুলিশের জনপ্রিয় ফেসবুক পেজে পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে অনুরোধ করেছিলেন, পুরনো কিছু মামলা নিয়ে লিখতে, যার কিনারায় সাফল্য পেয়েছিল পুলিশ।

নগরপাল শ্রীরাজীব কুমারকে জানালাম একদিন, গত বছরের জুলাইয়ের শেষাশেষি। শুনেই এক কথায় রাজি, 'গুড আইডিয়া, লেখো, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ঐতিহ্যের কথা লিপিবদ্ধ থাকা তো উচিতই। লেখো।'

এ বইয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন নগরপালের উৎসাহবাক্যেই, তাঁরই প্রেরণায়। প্রতি রবিবার আমাদের ফেসবুকের পাতায় 'রহস্য রবিবার' শীর্ষকে পোস্ট হতে থাকল সাড়া-জাগানো কিছু পুরনো খুনের মামলার ইতিবৃত্ত। সাইবার-দুনিয়ার পাঠক-পাঠিকাদের প্রশ্রয় এবং সমর্থনে একের পর দুই, চারের পর পাঁচ, নয়ের পর দশ। লেখাগুলি বাঁধা পড়ুক দুই মলাটে, বই হোক, অনুরোধ এল অনেক। সেই অনুরোধকে শিরোধার্য করেই তড়িঘড়ি এই বইয়ের প্রস্তুতি এবং প্রকাশ।

পাঠকহৃদয়ে গোয়েন্দাকাহিনির আকর্ষণ চিরকালীন, লেখা বাহুল্য। হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত-মানিক বা নীহাররঞ্জনের কিরীটি, শরদিন্দুর ব্যোমকেশ বা সত্যজিতের ফেলুদা, কাহিনি এবং তার কুশীলবরা কল্পনার। লেখক স্বাধীনভাবে রহস্যের ঘনঘটা তৈরি করেন বিবিধ উপাদানে। এই বইয়ের কাহিনিগুলি চরিত্রে ভিন্ন। গোয়েন্দারা বাস্তবের, চরিত্ররা রক্তমাংসের এবং কাহিনি 'গল্প হলেও সত্যি'-র শ্রেণিভুক্ত। যা ঘটেছিল আর যেভাবে ঘটেছিল, সেই লক্ষ্মণরেখার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই কোনও।

কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইতিহাস শতাব্দীপ্রাচীন, পত্তন ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে, ১৮৬৮ সালে। সর্বজনবিদিত তথ্য, কলকাতা পুলিশকে তুলনা করা হত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে, দেশব্যাপী এতটাই সুনাম ছিল গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের। এবং এই সুনাম অর্জিত হয়েছিল অগণিত জটিল মামলার রহস্যভেদে ধারাবাহিক পেশাদারি দক্ষতায়। সেই মামলাগুলির থেকে বারোটি বেছে নিয়ে এই বইয়ে সংকলিত রইল তদন্তের নেপথ্যকথা। প্রতিটি মামলাই খুনের। প্রতিটিই কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে দিকচিহ্ন, হয় অপরাধীর বেনজির ভাবনায় বা পদ্ধতিতে, নয় তদন্তকারী অফিসারের নৈপুণ্যের মানদণ্ডে, কিংবা অভিযুক্তকে শাস্তিদানে বিজ্ঞানমনস্কতার বিরল প্রয়োগে।

আলোচিত মামলাগুলির সময়কাল পাঠক লক্ষ করবেন নিশ্চিত । বিংশ শতকের তিরিশের দশকের ঘটনা দিয়ে শুরু। শেষ মাত্র দশ বছর আগে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডে। যা প্রমাণ করে, কলকাতা পুলিশের রহস্যভেদের দক্ষতার 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে', এবং বাস্তবের ফেলু-ব্যোমকেশদের ধারাবাহিক কীর্তিতেই লালবাজার হয়ে উঠেছে গোয়েন্দাপীঠ।

জটিল খুনের মামলার তদন্ত অনেকাংশে তুলনীয় টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে। একদিনের ম্যাচ নয়, কুড়ি-বিশের বিনোদন তো নয়ই। ঘটে যাওয়া অপরাধের কিনারা করা সিঁড়ির প্রথম ধাপ মাত্র। সাক্ষ্যপ্রমাণ সংহত করে ঠাসবুনোট চার্জশিট পেশ করার পরও অসমাপ্ত থাকে কাজ। দীর্ঘ বিচারপর্বে অভিযুক্তের শাস্তিবিধান নিশ্চিত করতে পারলে তবেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় তদন্তের। রোম্যান্স-রোমাঞ্চ বর্জিত এই পথ পাড়ি দিতে অশেষ ধৈর্যের প্রয়োজন হয় তদন্তকারী অফিসারের। প্রয়োজন হয় শত প্রতিকূলতাতেও ক্রিজে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকার অধ্যবসায় এবং মনোসংযোগের। পাঁচ দিনের ক্রিকেটের মতো।

বাস্তবের সত্যান্বেষীদের সেই কর্মকাণ্ডই এই বইয়ের আধার। বাস্তবের অপরাধের তদন্তের আখ্যান বাংলা ভাষায় একেবারেই অমিল, এমন নয়, কিন্তু তদন্তপদ্ধতির সামগ্রিকতার প্রামাণ্য দলিল চোখে পড়ে না বড় একটা। সে অভাব যদি কিছুটাও দূর করতে পারে বইটি, তদন্তশিক্ষার্থীরা যদি কিছুমাত্রও উপকৃত হন আগামীতে, পরিশ্রম সার্থক।

লেখাগুলির সময়কাল গত বছরের জুলাইয়ের শেষ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। যে সময়টা কলকাতা পুলিশের অ্যানুয়াল পরীক্ষা, যে সময়টা শারদোৎসবের। পরীক্ষার প্রস্তুতির মধ্যেও লেখা গিয়েছে নগরপালের সোৎসাহ প্রশ্রয়ে। তাঁকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানানোর ধৃষ্টতা নেই, শ্রদ্ধা জানাই।

ধন্যবাদ প্রাপ্য ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার শ্রীঅতনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যিনি মামলাগুলির তথ্যতালাশে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। ধন্যবাদ অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার নীহারেন্দু রায়কে, যিনি আক্ষরিক অর্থেই কলকাতা পুলিশের 'সিধু জ্যাঠা', যিনি সরবরাহ করেছেন এই বইয়ে ব্যবহৃত দুর্মূল্য নথিপত্র। স্নেহভাজন সহকর্মী ইন্দ্রজিৎ দত্ত-কে ধন্যবাদ, ম্যানুস্ক্রিপ্ট টাইপ করায় হাসিমুখে অক্লান্ত থাকার জন্য।

বিনিদ্র রাতে যখন লিখেছি পেশার ব্যস্ততম সময়ে, পারিবারিক দায়দায়িত্ব একপ্রকার বিসর্জন দিয়েই, আগাগোড়া পাশে থেকেছে স্ত্রী ঋতুপর্ণা, যার সমর্থন না পেলে এই বই দিনের আলো দেখত না।

ছোটবেলা থেকে এদিক-ওদিক অকিঞ্চিৎকর লেখালেখি যতটুকু, দিশারী ছিলেন মা-বাবা। কেউই বেঁচে নেই। তবে যেখানেই থাকুন, জানি, পড়ছেন।

১ জানুয়ারি, ২০১৮
কলকাতা

সূচিপত্র

এভাবেও মেরে ফেলা যায়!

উফফ, কী একটা ফুটিয়ে দিয়ে চলে গেল!

পাঞ্জাবির হাতা ততক্ষণে গুটিয়ে ফেলেছেন বছর কুড়ির যুবক। পরীক্ষা করছেন ডান হাতের উপরের দিকের ক্ষতচিহ্ন। পিন ফোটালে যেমন হয়। জ্বালা করছে বেশ।

সে বহুকাল আগের কথা। বেলা আড়াইটে তখন। হাওড়া স্টেশনের গড়পড়তা দুপুর দ্রুত রওনা দিচ্ছে বিকেলের দিকে। ভারী ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে। ভিড়ে হাঁসফাঁস স্টেশন-চত্বর। যাত্রীদের লটবহর কাঁধে কুলিদের 'থোড়া সাইড দিজিয়েগা ভাইসাব!' মন ভাল বা খারাপ করে দেওয়া কু-ঝিকঝিক রেলগাড়ির। ইঞ্জিন থেকে চলকে ওঠা ধোঁয়া পাক খেতে খেতে ঊর্ধ্বমুখী। অমুক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে তমুক ট্রেন একটু পরেই পাড়ি দেবে গন্তব্যে, ঘোষণা মিনিটে মিনিটে।

সন ১৯৩৩। তারিখ ২৬ নভেম্বর। স্টেশনের চলতিফিরতি ভিড়ের নজর কাড়ছে পাকুড়ের জমিদারবাড়ির কনিষ্ঠ পুত্র অমরেন্দ্রচন্দ্র পান্ডের ঘরে ফেরার আয়োজন। পাত্রমিত্র-অমাত্যের দঙ্গল এসেছে স্টেশনে। ছোটখাটো শোভাযাত্রাই বলা চলে। অমরেন্দ্রর সঙ্গে যাবেন সহোদরা বনবালা। বিশেষ ঘনিষ্ঠ কমলাপ্রসাদ পান্ডে, অশোক প্রকাশ মিত্র এবং আরও অনেকে এসেছেন বন্ধুকে ছাড়তে। বৈমাত্রেয় দাদা বিনয়েন্দ্রও উপস্থিত।

ট্রেন ছাড়ব-ছাড়ব করছে, অমরেন্দ্র-বনবালাকে ঘিরে জটলা। বিদায়-সম্ভাষণের পালা চলছে। হঠাৎই উলটো দিক থেকে একটি লোক, গায়ে খদ্দরের ময়লা চাদর, দ্রুতপায়ে হেঁটে এসে অমরেন্দ্রকে হালকা ধাক্কা দিয়ে, কেউ কিছু বোঝার আগেই নিমেষে মিলিয়ে গেল ভিড়ে। আর অমরেন্দ্রর মুখ থেকে ছিটকে বেরল যন্ত্রণা, উফফ, কী একটা ফুটিয়ে দিয়ে চলে গেল!

আজ যে মামলার কথা, যখনকার কথা, পাঠক-পাঠিকাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্মই হয়নি, নিশ্চিত। প্রায় পঁচাশি বছর আগের ঘটনা এই মামলা বিরলতমের পর্যায়ভুক্ত। আজও আলোচিত হয় দেশ-বিদেশের অপরাধ-বিষয়ক লেখালেখিতে, গবেষণায়। বলা হয়, "One of the first cases of individual bioterrorism in modern world history." কী বাংলা হয়? জীবাণু-অস্ত্রে ব্যক্তিহত্যা? জুতসই হল না মোটেই। না হোক, ঘটনার বিবরণে আসি, যা পড়লে মনে হতে বাধ্য, এভাবেও মেরে ফেলা যায়!

পাকুড় হত্যা মামলা। টালিগঞ্জ থানা, কেস নম্বর ৬৭। ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধির তারিখ ১৭/২/৩৪। ৩০২/১২০ বি। খুন এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র। অনেকে শুনেছেন এই মামলার কথা, বিস্তর লেখাও হয়েছে এ নিয়ে। ইন্টারনেটেও পাবেন। তবে অধিকাংশ বিবরণেই নানা ভাষা-নানা মত-নানা অনুমান। বিভ্রান্তির অবকাশ অনেক। রইল প্রামাণ্য ঘটনাপ্রবাহ, কেস ডায়েরি থেকে, সযত্নে যা রক্ষিত আছে উত্তর কলকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে আমাদের সংগ্রহশালায়।

পাকুড় মামলার চার্জশিটের প্রতিলিপি

পাকুড়ের অবস্থান ঝাড়খণ্ডের উত্তর-পূর্বে। সাঁওতাল পরগনায়। বহুদিন সাহেবগঞ্জ জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থল ছিল। স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা মিলেছে '৯৪-এ। দেশের মানচিত্রে পাকুড় বিখ্যাত ব্ল্যাকস্টোনের জন্য। উত্তরে সাহেবগঞ্জ, দক্ষিণে দুমকা, পশ্চিমে গোদ্দা জেলা আর পূর্বে আমাদের মুর্শিদাবাদ-বীরভূম। প্রাক-

স্বাধীনতা আমলে দেশের অন্যতম ধনাঢ্য জমিদারির মালিকানা ছিল পাকুড়ের পান্ডে পরিবারের। সমসময়ের বংশলতিকার যেটুকু প্রয়োজন কাহিনির স্বার্থে, বলে নিই।

কুমার প্রতাপেন্দ্রচন্দ্র পান্ডের দুই স্ত্রী ছিলেন। দু'জনেই পরলোকগতা। প্রথম পক্ষের পুত্র বিনয়েন্দ্র, কন্যা কাননবালা। এক পুত্র, এক কন্যা দ্বিতীয় পক্ষেও। অমরেন্দ্র আর বনবালা। প্রতাপেন্দ্রর দাদা গত হয়েছেন, যাঁর নিঃসন্তান স্ত্রী বর্তমান। রানি সূর্যবতীদেবী। অমরেন্দ্রর মাতৃবিয়োগ হয়েছিল জন্মের বছরদুয়েকের মধ্যেই। সন্তানহীনা সূর্যবতী মাতৃস্নেহে লালন করেছিলেন শিশু অমরেন্দ্রকে।

কুমার প্রতাপেন্দ্র আর রানি সূর্যবতীর মধ্যে সমান ভাগাভাগি হয়েছিল জমিদারির বিষয়সম্পত্তি। জমিদারির বার্ষিক আয় ছিল লাখখানেকের ঢের বেশি। সে-যুগের নিরিখে কুবেরের বিষয়-আশয় প্রায়।

প্রতাপেন্দ্র মারা গেলেন ১৯২৯-এ। অমরেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্রর মধ্যে সম্পত্তির সমবণ্টন করে গিয়েছিলেন উইলে। অমরেন্দ্র তখনও নাবালক, বছর পনেরোর কিশোর। স্কুলের পাঠ শেষ করবেন কিছুদিনের মধ্যে। বিনয়েন্দ্রর বয়স তখন বাইশ, দায়িত্ব ছিল সম্পত্তির দেখাশোনার।

বিনয়েন্দ্র ছিলেন ইন্দ্রিয়সুখে আচ্ছন্ন মানুষ। জীবনদর্শন সহজ, "মেজাজটাই তো আসল রাজা, আমি রাজা নয়।" নানাবিধ দুর্লক্ষণ ছিল মেজাজের। দিনরাতের অধিকাংশ সময় 'জলপথেই' থাকতে পছন্দ করতেন। উদ্দাম নারীসঙ্গ স্বভাবগত, নিয়মিত নিশিযাপন বালিকাবালা এবং চঞ্চলা নামে দুই রক্ষিতার সাহচর্যে। প্রমোদবিলাসে মাঝেমধ্যে পাড়ি দিতেন বোম্বাই। রুপোলি পরদার রংবাহারে বরাবরের আকর্ষণ। সংযম এবং শৃঙ্খলা, দুইয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন কৈশোরেই।

অমরেন্দ্র ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। ভদ্র, নম্র, পারিবারিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী, নিয়মিত শরীরচর্চাও করেন। স্বভাবগুণে প্রবল জনপ্রিয় প্রজাকুলে। 'ছোটবাবু' বলতে অজ্ঞান পাকুড়ের আবালবৃদ্ধবনিতা।

স্কুলের পাট চুকিয়ে অমরেন্দ্র ভরতি হলেন পাটনা কলেজে। পড়াশুনোর খরচ নিয়মিত পাঠাতেও প্রায়ই গড়িমসি করতেন বিনয়েন্দ্র। অমরেন্দ্র আঠারোর চৌকাঠে পা দিলেন ফোর্থ ইয়ারে এবং সাবালকত্ব প্রাপ্তির পরই সম্পত্তির অংশের দায়িত্ব বুঝে নিতে চিঠি লিখলেন বিনয়েন্দ্রকে।

সেটা ১৯৩২ সাল। রানি সূর্যবতী থাকতেন দেওঘরে, সব খবরই পেতেন বিনয়েন্দ্রর টালমাটাল জীবনধারার। তিনিও পরামর্শ দিলেন অমরেন্দ্রকে, যথাসম্ভব দ্রুত বিষয়সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার।

মাত্রাছাড়া ভোগবিলাসে অবধারিত টান পড়বে, তাই বৈমাত্রেয় ভাইকে তার প্রাপ্য অংশ দিয়ে দেওয়ায় বিনয়েন্দ্রর অনীহা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আইন তো আর অনীহার অনুগত নয়, অমরেন্দ্রকে বুঝিয়ে দিতে হল প্রাপ্য অর্ধাংশ। এবং হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় দুই ভাইয়ের মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততা উৎপন্ন হল। বিস্তর চিঠিচাপাটি, তপ্ত বাক্যবিনিময়, সব।

পুজোর ছুটিতে অমরেন্দ্র বেড়াতে গেলেন দেওঘরে, রানি সূর্যবতীর কাছে। বিনয়েন্দ্রও এলেন কিছুদিন পরে। উঠলেন দেওঘরেরই অন্যত্র, বাড়ি ভাড়া করে। এক সন্ধেয় বিনয়েন্দ্র বললেন, চল বাবু (অমরেন্দ্রর ডাক নাম), একটু বেড়িয়ে আসি। বেরনো হল সান্ধ্যভ্রমণে। হঠাৎই বিনয়েন্দ্র বললেন, 'তোর জন্য একটা জিনিস এনেছি কলকাতা থেকে। এই দ্যাখ।' বলেই পকেট থেকে বার করলেন শৌখিন নাকে-আঁটা চশমা (Pince-nez glasses)। একরকম জোর করেই পরিয়ে দিলেন ভাইকে। পরানোর সময় নাকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই ব্যথা পেলেন অমরেন্দ্র। ছড়েও গেল একটু।

নাকে চাপটা কি একটু বেশিই দিয়েছিল দাদা? একটু খটকা যে লাগেনি অমরেন্দ্রর, এমনটা নয়। বন্ধুদের জানিয়েওছিলেন, বলেছিলেন সূর্যবতীকেও। সকলেই কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করেছিলেন শুনে। অস্বস্তি আশঙ্কায় পরিণত হল, যখন দিন তিনেক পরে মুখের একটি দিক ফুলে গিয়ে প্রায় অবশ হয়ে গেল অমরেন্দ্রর।

বিনয়েন্দ্র তার আগেই ফিরে এসেছেন কলকাতায়। পারিবারিক চিকিৎসককে খবর দেওয়া হল। তিনি

দেখেশুনে বললেন, টিটেনাসের সংক্রমণ। Anti-tetanus প্রতিষেধক চালু হল প্রথামাফিক।

চিকিৎসা চলাকালীনই বিনয়েন্দ্র দেওঘরে পাঠালেন তাঁর পরিচিত এক তরুণ ডাক্তারকে। নাম তারানাথ ভট্টাচার্য, কথাবার্তায় চৌকস। এসেই প্রস্তাব দিলেন মরফিন ইঞ্জেকশন দেওয়ার। ততদিনে দেওঘরের একাধিক চিকিৎসক দিনরাত পর্যবেক্ষণে রেখেছেন অসুস্থ অমরেন্দ্রকে। কেউই মানলেন না তারানাথের পরামর্শ।

বিনয়েন্দ্র ছিলেন গভীরতম জলের মাছ। নিজেই চলে এলেন দেওঘর, সঙ্গে তুলনায় অভিজ্ঞ এক চিকিৎসক, ডাক্তার দুর্গারতন ধর। যিনি চিকিৎসাবিদ্যার ব্যাপারে প্রভূত জ্ঞান বিতরণ করে চিকিৎসকদের রাজি করিয়ে ফেললেন একটি ইঞ্জেকশন দিতে। যেটি নিজেই সঙ্গে করে এনেছেন কলকাতা থেকে। দেওয়া হল ইঞ্জেকশন।

কলকাতায় রোগী দেখার জরুরি প্রয়োজনের অজুহাতে ডা. ধর আধঘণ্টা পরে কলকাতার ট্রেন ধরলেন। সঙ্গী বিনয়েন্দ্রও। এদিকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার ঘণ্টাখানেক পরই আচমকা দ্রুত শারীরিক অবনতি হতে শুরু করল অমরেন্দ্রর। প্রায় অচৈতন্য, রক্তচাপ যখন-তখন অগ্রাহ্য করছে বিপদসীমা। 'এই যায় সেই যায়' অবস্থা। সে যাত্রা কোনওক্রমে সামাল দিলেন ডাক্তাররা।

কয়েকদিন পর বিনয়েন্দ্র ফের উদয় হলেন দেওঘরে, ভাই কেমন আছে দেখার অছিলায়। সঙ্গে এবারও সেই ডাক্তার ধর এবং আরও একজন। ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য। ঢের শিক্ষা হয়েছে ততদিনে অমরেন্দ্রর বন্ধুবান্ধব-শুভানুধ্যায়ীদের। সূর্যবতীও কড়া নির্দেশ জারি করেছেন বিনয়েন্দ্রকে দেওঘরের বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়ার। দেওয়া হলও না। নিষ্ফলা বাদানুবাদের পর বিনয়েন্দ্র দুই সঙ্গী-চিকিৎসক সহ ফিরে গেলেন কলকাতায়।

অমরেন্দ্রর শরীরস্বাস্থ্য চিন্তায় ফেলল সূর্যবতীকে। যে ছেলের ছোটবেলার অভ্যেস ভোর পাঁচটায় উঠে শরীরচর্চার, সে বেলা দশটার আগে এখন বিছানাই ছাড়তে পারে না দুর্বলতার জেরে। বছর ঘুরে তখন ১৯৩৩। অমরেন্দ্রকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল সুচিকিৎসার প্রয়োজনে। হরিশ মুখার্জি রোডের একটি বিশাল বাড়ি ভাড়া করা হল। খবর দেওয়া হল সেই কিংবদন্তি চিকিৎসককে, যাঁর নামে কলকাতার এনআরএস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডা. নীলরতন সরকার রোগী দেখে ওষুধপত্র দিলেন। সঙ্গে পরামর্শ, কিছুদিন কাজকর্মের চিন্তা সম্পূর্ণ দূরে রেখে বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে আসার।

অমরেন্দ্র 'চেঞ্জে' গেলেন ভুবনেশ্বরে, কিন্তু অবস্থার তেমন উন্নতি হল না। মাথা ঘোরে, অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। খিদে কমে গিয়েছে। বই পড়তে ভালবাসতেন খুব, সে ইচ্ছেও যেতে বসেছে। বন্ধুরা নতুন বই পাঠালে দু'-চার পাতা উলটেই রেখে দেন। মাসকয়েক পর ভুবনেশ্বর থেকে ফিরে এলেন পাকুড়ে। ভগ্ন শরীরেই জমিদারির কাজকর্ম দেখাশোনা শুরু করলেন সাধ্যমতো।

বিনয়েন্দ্র এ সময়টা শান্তশিষ্ট দিনযাপন করছিলেন, ভাবার কারণ নেই কোনও। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না, ছকেরও না। চক্রান্তের শেষ অঙ্ক অভিনীত হল '৩৩ -এর নভেম্বরে। ১৮ তারিখ পাকুড়ের বাড়িতে সূর্যবতীদেবীর টেলিগ্রাম এল অমরেন্দ্রর নামে, 'কলকাতায় শীঘ্র আসিও। রাজস্ব-সংক্রান্ত আইনি আলোচনা রহিয়াছে।'

পত্রপাঠ কলকাতা রওনা দিলেন অমরেন্দ্র এবং গিয়ে আবিষ্কার করলেন, টেলিগ্রামটি ভুয়ো। সূর্যবতী আদৌ আসেননি কলকাতায়। তারবার্তাটি তাঁর নয়।

অমরেন্দ্র সব জানালেন সূর্যবতীকে। দু'জনেই সহমত হলেন, এ অপকর্ম বিনয়েন্দ্রর। জ্যাঠাইমা সূর্যবতী আদরের 'বাবু'-কে সতর্ক করে দিলেন, 'কাছেপিঠে ঘেঁষতে দিবি না দাদাকে।' অমরেন্দ্র সরাসরি জানতে চাইলেন দাদার কাছে টেলিগ্রামের ব্যাপারে। বিনয়েন্দ্র অম্লানবদনে অস্বীকার করলেন। এরই মধ্যে বিনয়েন্দ্র একাধিকবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন দুই পুত্রের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে প্রতাপেন্দ্রর রেখে যাওয়া দু'লাখ টাকার সিংহভাগ অমরেন্দ্রর অজ্ঞাতে সই জাল করে তুলে নেওয়ার। সবই জানতে পেরেছিলেন অমরেন্দ্র পারিবারিক

উকিলের মাধ্যমে। সে নিয়েও বচসা হল খানিক।

২৫ নভেম্বর, ১৯৩৩। পরের দিন অমরেন্দ্রর কলকাতা থেকে পাকুড়ে ফিরে যাওয়ার কথা দুপুরের ট্রেনে। সন্ধেবেলা অমরেন্দ্রর কলকাতার অস্থায়ী বাসস্থানে এসে হাজির বিনয়েন্দ্র। সব তিক্ততা ভুলে গিয়ে হঠাৎই যেন স্নেহশীল বড়দার ভূমিকায়। কথায় কথায় স্মৃতিচারণ করছেন শৈশব-কৈশোরের, কিঞ্চিৎ ঘনঘনই গলা বুজে আসছে কান্নায়, 'তুই আমাকে ভুল বুঝিস না বাবু, শরীরের যত্ন নিস ভাই।'

অমরেন্দ্র দাদার চরিত্র জানতেন, কুম্ভীরাশ্রুতে বিচলিত হওয়ার কারণ দেখলেন না কোনও। বিনয়েন্দ্র যাওয়ার আগে কথায় কথায় জেনে নিলেন, পরদিন ভাইয়ের ট্রেন কখন।

২৬ নভেম্বর। স্টেশনে অমরেন্দ্র এবং আত্মীয়বান্ধবরা একটু অবাকই সহাস্য বিনয়েন্দ্রকে দেখে। কেউ কেউ বললেনও, এ আপদ এখানে কেন? অমরেন্দ্র নিরস্ত করলেন উত্তেজিত স্বজনদের। যতই কুচক্রী হোন, বৈমাত্রেয় হলেও দাদা তো! স্টেশনে এসেছেন, ও ভাবে বিদেয় করে দেওয়া যায়? এর কিছু পরে অতর্কিতে উলটোদিক থেকে খদ্দরের চাদরমুড়ি অপরিচিতের দ্রুত ধাক্কা দিয়ে অন্তর্ধান, গাড়ি ছাড়ার পূর্বমুহূর্তের সে ঘটনা বলেছি শুরুতে।

পাঞ্জাবির হাতা তুলে অমরেন্দ্র দেখালেন ক্ষতচিহ্ন। আপাতদৃষ্টিতে মারাত্মক কিছু নয়। কিছুটা তরল পদার্থ পিন ফোটানোর জায়গা থেকে চুঁইয়ে পড়েছে পাঞ্জাবিতে। ট্রেন ছাড়তে তখন বাকি মিনিট পাঁচেক। সহোদরা বনবালা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অমরেন্দ্রর বন্ধু কমলাপ্রসাদ এবং অন্যরাও। বললেন, ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া যাক। দু'দিন পরই না হয় পাকুড় যাওয়া যাবে। বিনয়েন্দ্রও কপট উদ্বেগ দেখালেন প্রাথমিক, তারপর বললেন, 'এ তো সামান্য ব্যাপার, পাকুড়ে গিয়েও তো ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া যায়।' কমলাপ্রসাদ প্রতিবাদ করতে গেলে বিনয়েন্দ্র মেজাজ হারালেন, 'আমরা পাকুড়ের জমিদারবাড়ির। এসব তুচ্ছ ব্যাপারে তোমরা সাধারণরা মাথা ঘামাতে পারো। আমরা নয়।'

অমরেন্দ্রর কিছু জরুরি কাজও ছিল পরের দু'দিনে। ভাবলেন, ডাক্তার দেখিয়ে নেব বাড়ি ফিরে। বনবালাকে নিয়ে উঠে বসলেন পাকুড়গামী ট্রেনে। এবং মারাত্মক ভুল করলেন।

ভাইবোন যখন ট্রেনে বিকেলের জলযোগ সারছেন, কথোপকথন হল এইরকম।

—দাদাভাই, আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।

—কেন রে?

—না, ওই পিন ফোটানোর ব্যাপারটা । মনটা খচখচ করছে।

—ও কিছু না। পকেটমার-টার হবে। ছোট ক্ষুরটুর ছিল হয়তো হাতে।

—ক্ষুরে অমন দাগ হয়? আমি লোকটাকে আগে কোথায় যেন দেখেছি, মনে করতে পারছি না কিছুতেই ...

—যাহ্, কী যে বলিস। তুই আবার কোথায় দেখলি?

—না রে, দেখেছি কোথাও, একদম এক চেহারা।

—চেহারাটা তো আমিও দেখলাম। বেঁটে, মিশকালো, গায়ে খদ্দরের চাদর ছিল। পায়ে চপ্পল।

—দাদাভাই! মনে পড়েছে! আমরা গত সপ্তাহে যখন পূর্ণ থিয়েটারে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, ওই লোকটা টিকিট কাউন্টারের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল।

—আরে ধুর। তোর মনের ভুল। বেশি ভাবিস না তো।

বনবালার আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তা বোঝা গেল পরের দিন থেকেই। প্রবল অসুস্থ হয়ে পড়লেন অমরেন্দ্র। ২৮ তারিখ রাতে ফিরিয়ে আনা হল কলকাতায়। এবার উঠলেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের একটা ভাড়াবাড়িতে। ডাকা হল আর এক প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসককে। ডা. নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত। অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবু 'ব্লাড কালচার' করতে বললেন অবিলম্বে। ডান দিকের বাহুমূল ততক্ষণে ফুলে উঠেছে অমরেন্দ্রর।

জ্বর নামছেই না ১০৫ ডিগ্রির নীচে। কষ্ট পাচ্ছেন প্রচণ্ড। রক্তচাপ হোক বা হৃদ্‌স্পন্দন, প্রতি ঘণ্টায় একটু একটু করে চলে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অমরেন্দ্র জ্ঞান হারালেন, ৪ ডিসেম্বর সকালে প্রাণ। 'ব্লাড কালচার'-এর রিপোর্ট এল পরদিন। যার সারাংশ পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ডাক্তাররা। মৃতের রক্তে 'Pasteurella Pestis' ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ। যা শরীরে ঢুকলে plague-এ আক্রান্ত হওয়া অনিবার্য। প্লেগের মারণছোবলেই প্রাণনাশ অমরেন্দ্রর, সংশয়ের অবকাশ নেই তিলমাত্র।

রোগভোগে আপাত-স্বাভাবিক মৃত্যু। ময়নাতদন্ত হল না, দাহ হল নিয়মমাফিক। মুখাগ্নি করলেন বিনয়েন্দ্র, কেঁদে ভাসালেন। ওই কুনাট্য সহ্য করতে হল অমরেন্দ্রর ঘনিষ্ঠদের। যাঁদের আগাগোড়াই সন্দেহ ছিল বিনয়েন্দ্রর উপর। পিন ফোটানোর ঘটনা নিশ্চয়ই বিনয়েন্দ্ররই মস্তিষ্কপ্রসূত, দৃঢ় বিশ্বাস ছিল অমরেন্দ্রর বন্ধুদের। কিন্তু প্রমাণ কই? সন্দেহের বশে তো আর কাউকে ফাঁসিকাঠে চড়ানো যায় না।

স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করা এক যুবকের অকালমৃত্যু, তা-ও প্লেগে! চিন্তায় পড়ে গেলেন কলকাতার চিকিৎসকমহল। দিকপাল ডাক্তাররা শেষ সময়ে চিকিৎসা করেছিলেন, কথা বলেছিলেন অমরেন্দ্রর আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে, নথিবন্দি করেছিলেন দিনকয়েক আগের পিন ফোটার ঘটনা এবং পরবর্তী সমস্ত রোগলক্ষণ। গোলমাল আছে কিছু, চিকিৎসকদল আন্দাজ করেছিলেন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায়।

ডাক্তাররা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই ১২ ফেব্রুয়ারি একঝাঁক প্রশ্ন পাঠালেন ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডিরেক্টরের কাছে। প্লেগের 'bacilli' কি হাইপোডারমিক নিডলের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো যায়? গেলে কত পরিমাণে? যতটা যায়, ততটা কি প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট? এ ছাড়া আরও বেশ কিছু, টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি। বিস্তারিত উত্তর এল চার দিন পর, ১৬ তারিখ। বলা হল, এই মৃত্যু অস্বাভাবিক, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটানো হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে এ জিনিস ঘটেনি। অতএব, 'homicidal death'—খুন! এবং যে 'bacilli'-ঘটিত মৃত্যু, তা কলকাতায় পাওয়া যায় না। একমাত্র বোম্বাইতেই (সেসময়ের নামটাই রাখলাম বাণিজ্যনগরীর) মেলে Haffkine Institute-এ।

অমরেন্দ্রর বন্ধুরা কিন্তু হাল ছাড়েননি দাহকার্য সাঙ্গ হওয়ার পরও। ট্রপিক্যালের রিপোর্ট আসার একমাস আগেই ঘটনার সবিস্তার বিবরণ সমেত কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন পাকুড় জমিদারবাড়ির পারিবারিক উকিল। অভিযোগ দায়ের করার মতো নথিপত্র ছিল না হাতে। তাই কেস নথিবদ্ধ করা হয়নি তখনও, কিন্তু পুলিশের গোপন অনুসন্ধান এবং নজরদারি চালু হয়েছিল বিনয়েন্দ্র এবং তারানাথের গতিবিধির উপর। গোয়েন্দারা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন প্রাক্-মৃত্যু চিকিৎসা যাঁরা করেছিলেন, সেই ডাক্তারদের সঙ্গে। অলিখিত তদন্ত একরকম শুরুই হয়ে গিয়েছিল।

ডা. এন আর সেনগুপ্তকে পাঠানো সাক্ষীদানের সমন

১৬ ফেব্রুয়ারি ট্রপিক্যাল মেডিসিনের রিপোর্ট আসামাত্রই কমলাপ্রসাদ টালিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন। পাঁচজন অভিযুক্ত। বিনয়েন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে, ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য, ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য, ডাক্তার দুর্গারতন ধর এবং সেই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি, যে স্টেশনে পিন ফুটিয়েছিল।

FIR হয়েছে খবর পাওয়ামাত্র পালালেন বিনয়েন্দ্র। পালিয়ে যাবেন কোথায়, নজরদারি তো ছিলই অষ্টপ্রহর। গ্রেফতার করা হল সে-রাতেই। আসানসোল স্টেশনে, ট্রেনের কামরা থেকে। ডা. ধর ধরা পড়লেন পরের দিন, তারানাথ আরও একদিন পরে। ১৮ ফেব্রুয়ারির সকালে। ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য মাসখানেক পর, ২৪ মার্চ।

কিন্তু যে লোকটি পিন ফুটিয়েছিল? বেঁটে, কালো, খদ্দরের চাদরমুড়ি দেওয়া অপরিচিত? বিনয়েন্দ্র স্বীকার করলেন, তিনিই লোকটাকে পূর্ণ থিয়েটারে পাঠিয়েছিলেন অমরেন্দ্রকে চিনে নিতে। কিন্তু লোকটির নাম-ঠিকানা এক-একবার এক-একরকম বলে চললেন, কোথাও খোঁজ মিলল না হাজার চেষ্টাতেও। ছবি-টবি

আঁকিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার পরেও না।

দুটো সম্ভাবনা ছিল। এক, প্রচুর টাকাপয়সা দিয়ে আততায়ীকে চলে যেতে বলেছিলেন বিনয়েন্দ্র ভিনরাজ্যের কোনও প্রত্যন্ত এলাকায়, যেখান থেকে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। দুই, ঘটনার পর বিনয়েন্দ্রই লোক লাগিয়ে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিয়েছিলেন আততায়ীকে। যাতে ভবিষ্যতে ব্ল্যাকমেলের আশঙ্কাও নির্মূল করে দেওয়া যায় চিরতরে। দ্বিতীয়টাই সম্ভবত ঘটেছিল, ধারণা হয়েছিল তদন্তকারীদের।

জিজ্ঞাসাবাদে অমরেন্দ্র-হত্যার পরিকল্পনা যা জানা গেল, তা ঘোর লজ্জায় ফেলে দেবে যে-কোনও রুদ্ধশ্বাস গোয়েন্দা কাহিনিকে। ভাবুন একবার, প্রায় এক শতক আগে স্থির মস্তিষ্কে এক বছর তিরিশের যুবক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটিয়ে ভাইকে খুনের প্ল্যান করছে! শরদিন্দুর উপন্যাসে সাইকেল থেকে নিক্ষিপ্ত গ্রামোফোন পিন বা শজারুর কাঁটা দিয়ে খুনের কাহিনি বহুপঠিত। বাস্তবের বিনয়েন্দ্রর কুকর্মের অভিনবত্ব তুলনায় ঢের বেশি কূটবুদ্ধির, সন্দেহ নেই কোনও।

সম্পত্তির ন্যায্য প্রাপ্য অমরেন্দ্র দাবি করার দিন থেকেই বিনয়েন্দ্র ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেন ভাইকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার। নাকে আঁটা চশমার মাধ্যমে Tetanus সংক্রমণের চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, তখন আরও প্রাণঘাতী কিছুর সন্ধানে মনোযোগী হলেন বিনয়েন্দ্র। ষড়যন্ত্রের শরিক হলেন তারানাথ। যিনি আদপে ডাক্তারই নন (ভুয়ো ডাক্তার সে-যুগেও ছিল!)। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে 'Calcutta Medical Supply Concern' নামে এক ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করতেন। সেই সুবাদে অসুখবিসুখ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা হয়েছিল। তারানাথই বুদ্ধি দিলেন, ঘাতক হিসাবে প্লেগ অব্যর্থ।

কিন্তু ভাবলেই তো হল না, প্রয়োগের উপায়? তার চেয়েও জরুরি, প্লেগের bacilli পাওয়া যাবে কোথা থেকে? কে দেবে? বোম্বাইয়ের হফকিন ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারের শরণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত হল।

'Haffkine Institute for Training, Research and Testing' স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৯ সালে, বোম্বাইয়ের পারেল অঞ্চলে। প্রতিষ্ঠাতা Dr Waldemar Mordecal Haffkine শুরুতে নাম রেখেছিলেন 'Plague Research Laboratory'। তারানাথ টেলিগ্রাম করে ইনস্টিটিউটে জানালেন, তাঁর ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা রয়েছে। ব্যাকটেরিয়া-বাহিত রোগ নিয়ে গবেষণা করছেন, plague bacilli প্রয়োজন। ইনস্টিটিউট উত্তরে জানাল, কলকাতার surgeon general —এর সুপারিশ পাঠালে বিবেচনা করে দেখা হবে আর্জি। কিন্তু কে দেবে অজ্ঞাতকুলশীল তারানাথকে ওই মহার্ঘ সুপারিশপত্র, আর কেনই বা দেবে?

তা হলে? ডা. শিবপদ ভট্টাচার্য ও ডা. দুর্গারতন ধরের সঙ্গে ফের যোগাযোগ করলেন বিনয়েন্দ্র-তারানাথ। যথেষ্ট অর্থের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে দুই চিকিৎসকও যোগ দিলেন প্লেগ-পরিকল্পনায়। ডা. ভট্টাচার্য দীর্ঘ সুপারিশ পাঠালেন তারানাথের হয়ে। উত্তর এল নেতিবাচক।

বিনয়েন্দ্র তবু অদম্য, একাধিকবার বোম্বাই গেলেন। সরকারিভাবে সুবিধে করতে পারলেন না। মরিয়া চেষ্টায় ইনস্টিটিউটের দুই ডাক্তারকে বিপুল অঙ্কের টাকার প্রলোভন দেখালেন লাগাতার। বিলাসবহুল Sea View Hotel-এ ব্যবস্থা করলেন যথেচ্ছ বিনোদনের, দিনের পর দিন। দুই ডাক্তার প্রলোভনে নতিস্বীকার করলেন শেষমেশ, কিন্তু লিখিত প্রমাণ রাখলেন না। সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে বিনয়েন্দ্র-তারানাথের কাছে পৌঁছল 'লাইভ প্লেগ কালচারের' vial। সেটা ৭ জুলাই, ১৯৩৩। তারানাথকে সুযোগ করে দেওয়া হল বোম্বাইয়ের প্লেগ হসপিটালে 'bacteriologist' পরিচয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার। সাদা ইঁদুরের উপর ব্যাকটেরিয়া-বিষ প্রয়োগ করে নিশ্চিত হলেন তারানাথ।

এরপর যা ঘটেছিল, লিখেছি আগেই। কুড়ি বছরের যুবকের দেহে প্লেগ bacilli ঢুকিয়ে বিরলতম হত্যা। যা হইচই ফেলে দিয়েছিল আসমুদ্রহিমাচলে।

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতর, দাবিই করা যাক, অসামান্য তদন্ত করেছিল। যা মুক্তকণ্ঠে তারিফ করেছিলেন জজসাহেব তাঁর রায়ে। তদন্তকারী অফিসার শুরুর দিকে ছিলেন সাব ইনস্পেকটর শরৎচন্দ্র মিত্র,

পরে ইনস্পেকটর এম এল রহমান। আততায়ীকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রায় শূন্য। এমন অবস্থায় বাকি ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তিদান নিশ্চিত করতে ভরসা শুধু অকাট্য যুক্তিতে মোটিভকে প্রমাণ করা এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণের (circumstantial evidence) জালটি এমন ভাবে বোনা যাতে ঘটনাপরম্পরার গতিপথ (chain of events) দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। এ কাজ যে কী ভীষণ কষ্টসাধ্য, সে তদন্তকারী অফিসারই শুধু জানেন।

মোটিভের অংশটি অবশ্য সহজসাধ্যই ছিল। অমরেন্দ্রর মৃত্যুতে বিনয়েন্দ্র যে লাভবান হতেন, সেটা তো জলবৎ তরলং ছিল। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ একত্রিত করার দুরূহ কাজটি সুসম্পন্ন করতে প্রাণপাত করেছিলেন কলকাতার গোয়েন্দারা। বিনয়েন্দ্রর বোম্বাইযাত্রার দিনপঞ্জি এবং হোটেলবাসের প্রতিটি নথি জোগাড়, রেজিস্টারের হস্তাক্ষরের সঙ্গে অভিযুক্তের হস্তাক্ষর মেলানো, হফকিন ইনস্টিটিউটে যাতায়াতের প্রমাণ সংগ্রহ, তারানাথের টেলিগ্রাম এবং ডা. ভট্টাচার্যের সুপারিশপত্র, যে দোকান থেকে ইঁদুর কেনা হয়েছিল সেটি খুঁজে বের করে মালিকের জবানবন্দি, যে ট্যাক্সিতে করে বোম্বাইয়ের প্লেগ হসপিটালে পৌঁছেছিলেন তারানাথ, সেটিকে খুঁজে বের করা, পুঙ্খানুপুঙ্খ এমন আরও যে কত, লিখলে তালিকা দীর্ঘতর হতে থাকবে। বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন দরাজ সাহায্যের, নিয়মিত কলকাতার নগরপালের সঙ্গে আলোচনা করতেন তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে।

বিচারপর্বে অঢেল অর্থব্যয় করবেন বিনয়েন্দ্র, প্রত্যাশিতই ছিল | লাভ হয়নি যদিও। নিম্ন আদালত ফাঁসির আদেশ দেয় বিনয়েন্দ্র ও তারানাথকে। মুক্তি দেওয়া হয় ডা. ধর এবং ডা. ভট্টাচার্যকে। উচ্চ আদালতে আপিল পেশ হয় যথানিয়মে। ফাঁসির আদেশ কমে সাজা হয় 'কালাপানির', যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বিচারক লেখেন রায়ে, "probably unique in the annals of crime।"

মামলার নথিপত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে খুনের প্রস্তুতিপর্বে তারানাথকে ষড়যন্ত্রী আশ্বাস বিনয়েন্দ্রর, কেউ জানবে না, কে পিন ফুটিয়েছিল। খুনিই না পেলে পুলিশ কাঁচকলা করবে! সহজ হিসেব।

সহজ? সহজ আর থাকল কই? প্রেক্ষিত আলাদা, ব্যঞ্জনাও বহুমাত্রিক। তবু, এ কাহিনির উপসংহারে শঙ্খ ঘোষের কবিতার লাইন ঝলকে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত—

"এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে
সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।"

মানুষ বড় শস্তা, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো

দৃশ্য-১
৩০ জানুয়ারি, ১৯৫৪, ভোর সোয়া পাঁচটা, বড়জোর সাড়ে পাঁচ।

ভোর হয়েছে, সকাল নয়। রাসবিহারী থেকে চেতলার দিকে যেতে ডানহাতে কালীঘাটের বাস্তুহারা বাজার। দোকানপাটের ঝাঁপ খুলতে খুলতে সে আরও অন্তত কয়েক ঘণ্টা। বাজারের সাফাইকর্মীদের বেশির ভাগই অবশ্য উঠে পড়েন দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই। বেলা একটু বাড়লেই মেলা লেগে যাবে লোকের। আগে থেকে সাফসুতরো করে না রাখলে পরে সামলে ওঠা দায়।

এমনই একজন কর্মীর প্রথম চোখে পড়ল কাগজের মোড়কগুলো। তিনটে পাশাপাশি। পড়ে রয়েছে কেওড়াতলা শ্মশানের কাছে একটি শৌচালয়ের পাশে। সে তো কত কিছুই এদিকে-ওদিকে পড়ে থাকে, কিন্তু এ তো অন্যরকম! প্রথম দর্শনেই আঁতকে ওঠার মতো। নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা কাগজের মোড়কগুলোর একটার কিছু অংশ ছিঁড়ে গিয়েছে। শুকিয়ে যাওয়া রক্তের লালচে ছোপ কাগজে। ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটো আঙুল। ডাক্তারবদ্যি হওয়ার প্রয়োজন নেই, এক ঝলকেই বোঝা যায়, আঙুল মনুষ্যদেহের।

আতঙ্কিত চিৎকার-চেঁচামেচিতে লোক জড়ো হল দ্রুত। খবর গেল টালিগঞ্জ থানায়। অফিসাররা এসে কৌতূহলী ভিড় সরালেন প্রথমে, খোলা হল মোড়ক। একের পর দুই, দুয়ের পর তিন। বেরোল দুটো হাতের টুকরো টুকরো খণ্ড। বাহুমূল থেকে কনুই। কনুই থেকে আঙুল। ছিন্নভিন্ন। কাগজের মোড়কটি দেখা হল খুঁটিয়ে। ২১ নভেম্বরের 'যুগান্তর'।

দৃশ্য-২
৩০ জানুয়ারি, ১৯৫৪, ভরদুপুর।

সবে খেয়ে উঠেছেন কালীঘাট পার্কের বহুদিনের দারোয়ান। শীতের ঝিমধরা দুপুরে ইতস্তত ঘুরছেন গাছগাছালিতে ঘেরা উদ্যানের এদিক-সেদিক, রোজকার অভ্যাসমতো। ঘুরতে ঘুরতেই চোখ আটকে গেল একটা আমগাছের পিছনে। ঝোপঝাড়-আগাছার জঙ্গলে কী পড়ে আছে ওগুলো? চারটে কাগজের মোড়ক, বাঁধা ওই নারকেল দড়ি দিয়েই। কৌতূহলবশত খুলেই ফেললেন। ভিতরে যা দেখলেন, ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটাছুটি করে এরপর শ'খানেক পথচলতি মানুষের ভিড় জুটিয়ে ফেলতে লাগল খুব বেশি হলে মিনিটদুয়েক।

একটি মোড়কে হাঁটু থেকে কাটা দুটি পায়ের অংশ। দ্বিতীয়টিতে নারীশরীরের উপরিভাগ ত্রিখণ্ডিত অবস্থায়। তিন নম্বর মোড়কে ধড় থেকে আলাদা করে দেওয়া মাথা। নাক-কান-ঠোঁট-চুল বিহীন। মুখের চামড়া চেঁছে তুলে নেওয়া হয়েছে। আঘাতের তীব্রতায় চূড়ান্ত বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে মুখাবয়ব। কয়েকগাছি চুল, মাত্র কয়েকগাছিই, লেগে রয়েছে কপালের উপরে।

শেষ মোড়কটিতে মিলল একটি ভ্রূণ। যাতে চোখ বুলোলেই মালুম হয়, পৃথিবীর আলো দেখার আর বেশি দেরি ছিল না। মৃতা সন্তানসম্ভবা ছিলেন, প্রসবমুহূর্ত এসেই গিয়েছিল প্রায়।

ফের থানাপুলিশ। খবর পেয়েই টালিগঞ্জ থানার অফিসাররা ছুটলেন ঊর্ধ্বশ্বাসে, সকালের উদ্ধার হওয়া দেহাংশ নিয়ে ধন্দ তখনও কাটেনি। লালবাজার থেকেও হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দাদের নিয়ে গাড়ি ছুটল। গন্তব্য, লেখা বাহুল্য, কালীঘাট পার্ক।

চারটি মোড়কই দেখা গেল 'যুগান্তর'-এর। ২১ নভেম্বর, ১৯৫৩, ১০ জানুয়ারি, ১৯৫৪, ২৫ জানুয়ারি ও ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫৪।

পার্কের চিরুনিতল্লাশিতে পাওয়া গেল আরও একটি মোড়ক। রাখা ছিল একটি বালির বস্তার নীচে। যার ভিতর থেকে বেরল দুই ঊরুর টুকরো টুকরো অংশ।

মোড়ার জন্য ব্যবহৃত কাগজ? সেই 'যুগান্তর'-ই।

দৃশ্য-৩

২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪, মধ্যরাত অতিক্রান্ত।

লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্টারোগেশন রুম। লাগাতার জেরায় ধুঁকছেন মধ্যতিরিশের যুবক। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে সন্ধে নাগাদ, চলছে বিরামহীন। অবলীলায় সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শুরুর কয়েক ঘণ্টায়। এমনটাই হয় জটিল মামলায়, জানি আমরা অভিজ্ঞতায়। জেরার প্রাথমিক পর্বে অভিযুক্ত কিছুতেই স্বীকার করে না অপরাধ। আত্মপক্ষ সমর্থনে যা বলার, যে ভাবে বলার, বলতে দেওয়া হয় সব। তদন্তকারীরা শুনতে থাকেন নিরাবেগ নিস্পৃহতায়, বক্তব্যের অসংগতি লিপিবদ্ধ হতে থাকে নীরবে।

একটা সময়ের পর, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার আত্মতুষ্টি যখন অজান্তেই ঘিরে ধরে অভিযুক্তকে, আসল খেলা শুরু হয় ঠিক তখন। প্রশ্নের তাস একটার পর একটা ফেলতে থাকেন গোয়েন্দারা, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় জবানবন্দির অসংগতি, যার ধাক্কায় বেআব্রু হয়ে যায় বয়ানের মিথ্যাচার।

তেমনটাই হল সে-রাতে। প্রশ্নের চক্রব্যূহে ক্রমশ দিকভ্রান্ত হতে থাকলেন যুবক। প্রথম দিকের 'ভাঙব, তবু মচকাব না' ভাবটা কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি তখন। স্নায়ু যে বিদ্রোহ করতে শুরু করেছে, জানান দিচ্ছে কপালের স্বেদবিন্দু। ভঙ্গুর হয়ে এসেছে রক্ষণ।

সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, তৎকালীন ওসি হোমিসাইড, বুঝলেন, কাঙ্ক্ষিত স্বীকারোক্তি আসা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। এলও অল্পক্ষণ পরেই। 'স্যার, আমিই মেরেছি ওকে। কেটে ফেলে দিয়েছি টুকরো টুকরো করে। এ ছাড়া উপায় ছিল না আর!' বলেই মুখ ঢেকে টেবিলে মাথা গুঁজে দিলেন অভিযুক্ত।

সমরেন্দ্র জলের গ্লাস এগিয়ে দিলেন, 'নিন, খান। অনেক সময় আছে। ধীরেসুস্থে বাকিটা বলুন।' রাত তখন পাড়ি দিচ্ছে ভোরের ঠিকানায়। সূর্যের দাপট কিছু পরেই দখল নেবে অন্ধকারের।

বেলারানী দত্ত হত্যা মামলা। টালিগঞ্জ থানা, কেস নম্বর ১১৬, তারিখ ৩১/১/৫৪। খুন এবং প্রমাণ লোপাট, ৩০২/২০১ আইপিসি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নারীশরীরের দেহাংশ খবরের কাগজে মুড়ে, বিকৃত এতটাই যে শনাক্তকরণ প্রায় অসাধ্য। সাম্প্রতিক অতীতে এ ধরনের কিছু ঘটনা ঘটেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ইন্টারনেটের দৌলতে সেসব মামলার বিবরণও সহজলভ্য। চিত্রায়িতও হয়েছে সিরিয়ালে-সিনেমায়। কিন্তু সেই সদ্য স্বাধীনোত্তর সময়ে এমন কেস কলকাতায় কেন, দেশের অন্যত্র বা বিদেশেও আদৌ হয়েছিল কি না, তথ্য নেই প্রামাণ্য।

ঘটনা প্রচারিত হওয়ার পর শহর কলকাতায় প্রবল চাঞ্চল্য প্রত্যাশিতই ছিল। চাঞ্চল্যের অভিঘাত ক্ষীণতর হয়েছে সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে, কিন্তু বিরলের মধ্যে বিরলতম হিসেবে এই মামলার চিরস্থায়ী স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে অপরাধ-গবেষণার ইতিহাসে।

নারকীয় হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্র সময় খরচ করলেন না তৎকালীন নগরপাল। দায়িত্ব পড়ল হোমিসাইড শাখার ওসি ইনস্পেকটর সমরেন্দ্রনাথ ঘোষের উপর, আগে লিখেছি যাঁর কথা।

ময়নাতদন্ত হল ৩১ জানুয়ারি। পচনপ্রক্রিয়া ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে দেহাংশে। খণ্ডিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটি একটি করে অশেষ অধ্যবসায়ে জোড়ার চেষ্টা করলেন ডাক্তাররা। সাত-আট ঘণ্টার প্রাণান্তকর

পরিশ্রমে পূর্ণবয়স্কা নারীশরীরের রূপ নিল জোড়া লাগানো দেহাবশেষ। দুটি বিশেষত্ব নজরে এল মৃতদেহে। এক, দুটি পায়েরই পাতা অস্বাভাবিক লম্বা। দুই, বাঁ ঊরুর উপর একটি কাটা দাগ।

যিনি পোস্টমর্টেম করলেন, তাঁর বক্তব্য ছিল দ্বিধাহীন। মৃত্যু ঘাড়ের কাছে ধারালো কিছুর আঘাতে, যা "ante mortem and homicidal in nature"। শরীরের বাকি অগুনতি আঘাতচিহ্ন মৃত্যুর পর, "post mortem injuries"।

এ পর্যন্ত তো হল। কিন্তু আসল কাজই তখনও বাকি, মৃতার শনাক্তকরণ। মুখ ক্ষতবিক্ষত, চামড়া বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই আর। কে খুন হলেন, সেটা না জানলে কীভাবে খুন, কে খুনি, এগোনোর রাস্তাই তো একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায় তদন্তের।

শেষ চেষ্টা করা হল। খবর পাঠানো হল চুঁচুড়া-নিবাসী ডাক্তার মুরারীমোহন মুখার্জির কাছে। যিনি তখন কলকাতার কারনানি হাসপাতালে প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের প্রধান, বিস্তর নামডাক।

ডাক্তার মুখার্জি এলেন, অক্লান্ত শ্রমব্যয় করলেন। মুখের আদল কিছুটা এল বটে, কিন্তু তা চিহ্নিতকরণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। পচনক্রিয়া (Putrefaction) শুরু হয়ে গিয়েছিল দেহাংশে। না হলে প্লাস্টিক সার্জারি ফলদায়ক হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল। ভারতের ইতিহাসে অপরাধ-তদন্তে সম্ভবত এই মামলাতেই প্রথম প্লাস্টিক সার্জারির শরণাপন্ন হওয়া।

কলকাতা পুলিশের তরফে ঘটনার বিশদ প্রচার করা হল। কাগজে মৃতার অবয়বের ছবিও ছাপানো হল, যা তোলা হয়েছিল ময়নাতদন্তের পর। দিন গড়িয়ে সপ্তাহ পেরোল, সামান্যতম খবরও এল না।

মর্গে খণ্ডিত দেহাংশ জোড়া হয়েছে

নীলরতন সরকার হাসপাতালের মর্গে দেহ রাখা হল প্রায় কুড়ি দিন। এর পর মৃতার কপালে আটকে থাকা কিছু চুল, হাতের-কোমরের-পায়ের-ঊরুর কিছু অস্থিমজ্জা সংরক্ষিত করে অশনাক্ত দেহ পুড়িয়ে ফেলা হল প্রথামাফিক।

শনাক্ত করার জন্য কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি পুলিশ। যেখানে দেহের টুকরোগুলি ফেলা হয়েছিল, তার আশেপাশের অন্তত শ'খানেক বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। শুধু শহরে নয়, রাজ্যের প্রতিটি থানায় বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। কোথাও কোনও মহিলার নামে মিসিং ডায়েরি হয়েছে কি না। সূত্র মেলেনি কোনও।

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ। প্রায় মাসখানেক গড়িয়ে গিয়েছে ঘটনার। তদন্তে কণামাত্র অগ্রগতি ব্যতিরেকেই। কিনারাসূত্র আপ্রাণ চেষ্টাতেও অধরা থাকলে শতকরা নব্বই ভাগ তদন্তকারীকে একটা সময় গ্রাস করেই অনিবার্য হতাশা। যা ক্রমাগত অবচেতনে বাজাতে থাকে কাটা রেকর্ড, 'অনেক হল, এবার হাল ছেড়ে দেওয়া যাক, কত মামলারই তো কিনারা হয় না।'

এমতাবস্থায় হতাশাকে প্লেগবৎ পরিত্যজ্য রাখাটাই সফল তদন্তকারীর কষ্টিপাথর। সমরেন্দ্র হাল ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। ফুটবলের তুলনা টানলে, ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনা নয়, ছিলেন আদ্যন্ত জার্মান মনোভাবাপন্ন। হারার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত না হারায় বিশ্বাসী, শিল্পের থেকে বরাবর প্রাধান্য দিতেন শৌর্যকে।

কথায় বলে, ভাগ্য বীরেরই সহায় হয়। আর, তদন্তের অভিজ্ঞতা বলে, ভাগ্য সহায় হয় একমুখী অধ্যবসায়েরও। কৃপাদৃষ্টি দেয় আচম্বিতে, ঘটে যায় অভাবিত সমাপতন।

যেমনটা হল ২৫ ফেব্রুয়ারির রাতে। রাত সাড়ে ন'টা-পৌনে দশটা হবে তখন। কর্মব্যস্ত দিনের শেষে বাড়ি ফিরছিলেন সমরেন্দ্র। ক্লান্ত, অবসন্ন। ঠান্ডাও লেগেছে একটু, হালকা সর্দিকাশিতে বিব্রত। গাড়ি ছুটছে টালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে রাসবিহারীর দিকে। হঠাৎই খেয়াল হল, একটা কাশির ওষুধ কিনে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। রসা রোডের কাছাকাছি এসে চোখে পড়ল প্রায় পাশাপাশিই দুটো ওষুধের দোকান। একটার ঝাঁপ ফেলছে

কর্মচারী, Royal Medical Store। পাশেরটা খোলা, South Calcutta Pharmacy। গাড়ি দাঁড়াল দোকানের সামনে।

দোকানের ছিরিছাঁদ দেখলে ভক্তি হওয়ার কথা নয়। টুলে বসে একজন কর্মচারী, অপরিচ্ছন্ন পোশাক। মুখে জন্মজন্মান্তরের বিরক্তি। দোকানের তাক-আলমারির সিংহভাগই খালি, কিছু ওষুধপত্র সাজানো অবিন্যস্ত। পুলিশের গাড়ি থেকে খদ্দের নামতে দেখে সামান্য নড়েচড়ে বসলেন কর্মচারী।

—কাশির ওষুধ লাগবে একটা।

—দাঁড়ান স্যার, দেখছি।

মিনিটখানেক দেখেশুনে কর্মচারী দেঁতো হেসে যে উত্তর দিলেন, একটু রেগেই গেলেন সমরেন্দ্র।

—স্যার, জ্বর-মাথাব্যথার আছে। কাশির ওষুধ ছিল, স্টক শেষ।

—তা এমন দোকান খুলে রেখেছ কেন? বন্ধ করে দিলেই হয়। মালিক কোথায় তোমার?

—মালিক তো স্যার মাসখানেক হল আসছেন না।

—সে জন্যই এই অবস্থা দোকানের। কী নাম মালিকের? দোকানটা তুলে দিতে বলে দিয়ো।

—স্যার, বীরেন দত্ত। খবর পাঠিয়েছেন, বাইরে আছেন। রোজ সন্ধেবেলা দোকানে বসতেন। এই প্রথম এতদিন ধরে দেখছি না।

পাওয়া গেল না ওষুধ, চালক স্টার্ট দিলেন গাড়িতে। সামান্য এগনোর পরই গাড়ি থামালেন সমরেন্দ্র। দোকানের কর্মচারী কী বলল যেন? মালিক মাসখানেক ধরে আসছেন না? আরও তো বলল, 'এই প্রথম এত দিন ধরে...'। সমরেন্দ্র 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই'-এর তত্ত্বে ভরসা রাখতেন। মনের খচখচানি দূর করতে চালককে বললেন, যা তো আবার, দোকানটার মালিকের ঠিকানা জেনে আয়।

জানা হল। ৫৫/৪/২ টার্ফ রোড। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের অদূরেই। শরীর বইছিল না, তবু মনে হল সমরেন্দ্রর, একবার ঘুরেই আসি। গেলেন, দেখলেন বীরেন দত্তর ঘর তালাবন্ধ। প্রতিবেশীদের থেকে জানলেন, গত বেশ কয়েক বছর ধরে ওই ঘরেই বীরেন থাকেন স্ত্রী বেলাকে নিয়ে। একটি ছ' বছরের ছেলেও আছে। জানুয়ারির শেষে সন্তানসম্ভবা বেলা ভরতি হয়েছিলেন শিশুমঙ্গলে, এমনটাই তাঁরা শুনেছিলেন বীরেনের কাছে। ৩০ জানুয়ারির পর বীরেনকে তাঁরা আর দেখেননি, ছেলেকে নিয়ে চলে গিয়েছেন।

কিনারার সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেলে যে-কোনও তদন্তকারী অফিসারের যা হয়, তা-ই হল সমরেন্দ্রর। অ্যাড্রিনালিনের বাড়তি ক্ষরণ শিরা-উপশিরায়। এ অনুভূতি বড় পরিচিত পুলিশের, যাঁরা জটিল মামলার তদন্ত করেছেন, তাঁরা জানেন। লিখে বোঝানোর নয় সবটা।

বেলা দত্ত নামে কোনও সন্তানসম্ভবা যে গত এক মাসে 'শিশুমঙ্গল' হাসপাতালে ভরতি হননি, সেটা বার করতে লাগল ঘণ্টাদুয়েক। রহস্য আর পরদানশিন থাকল না।

আক্ষরিক অর্থেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দারা। একটি লোককে খুঁজে বার করতে হবে। নাম জানা আছে। জানা হয়ে গিয়েছে কোথায় কীসের দোকান, বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেশীরা চেহারার বিবরণ দিয়েছেন। এর পরও সন্দেহভাজনকে পাওয়া যাবে না, হয়? সোর্স লাগানো হল একাধিক। বীরেন দত্তর পারিবারিক এবং ব্যবসায়িক ঠিকুজিকুষ্ঠির খোঁজখবর শুরু করার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই খবর এল। বীরেনের নাকি হরিশ মুখার্জি রোডেও আস্তানা আছে একটা, যাতায়াত নিয়মিত।

নজরদারি চালু হল। ২৭ ফেব্রুয়ারির ভোরে ১০২এ হরিশ মুখার্জি রোডের একটি বাড়ি থেকে চাদর মুড়ি দিয়ে এক ভদ্রলোককে বেরতে দেখা গেল। কেদার বোস লেনের মুখে আটকাল সাদা পোশাকের পুলিশ।

—আপনি কি বীরেন দত্ত?

—হ্যাঁ, কেন?

—বেলা দত্ত কি আপনার স্ত্রী?

—হ্যাঁ... কিন্তু...কেন বলুন তো?

—যা জানতে চাইছি, উত্তর দিন। উনি কোথায়?

—লজ্জার কথা কী আর বলব! বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে প্রেমিকের সঙ্গে।

—গাড়িতে উঠুন, আমরা লালবাজার থেকে আসছি। বাকি কথা ওখানেই হবে।

খুনের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া বিবরণে আসার আগে একটু পূর্বকথন জরুরি। বীরেন দত্ত, ডাকনাম বেচু, বয়স ৩৪। বজবজের কাছের একটি গ্রামে কেটেছিল ছেলেবেলা। বাবা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাব-ইনস্পেকটর। বয়স যখন মাত্র এক, বাবা গত হলেন। তার কয়েক মাসের মধ্যে মা-ও। দুই দিদি, আভা ও কনক। যাঁদের শ্বশুরবাড়ি যথাক্রমে আন্দুল ও কলকাতায়। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর কিছুদিন থাকলেন দিদার গ্রামের বাড়িতে। ভরতি হলেন স্কুলে।

বীরেনের দুই খুড়তুতো দাদা নবনী দত্ত ও যতীন্দ্র দত্ত থাকতেন ভবানীপুরের চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। বয়স যখন আট-নয়, দাদারা বীরেনকে নিয়ে এলেন কলকাতায় নিজেদের কাছে। বালক বীরেনকে ভরতি করে দেওয়া হল রামরিক ইনস্টিটিউশনে।

পড়াশোনায় যে বিশেষ মন ছিল বীরেনের, এমন অভিযোগ অতি বড় শুভানুধ্যায়ীর পক্ষেও করা কঠিন ছিল। রেজাল্ট তো খারাপ হচ্ছিলই, উপরন্তু ক্লাস পালিয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমা, বিড়ি-সিগারেট-মদ। উচ্ছন্নে যাওয়ার ইঙ্গিত ক্রমশ স্পষ্টতর হচ্ছিল। দাদারা একদিন বকাবকি করলেন খুব, চড়-থাপ্পড় খরচ করলেন দরাজহস্তে। ক্লাস এইটের বীরেন রেগেমেগে চলে এলেন আন্দুলে দিদির শ্বশুরবাড়িতে।

বেলারানী দেবী

জামাইবাবুর ওষুধের দোকান ছিল, টুকটাক কাজ শুরু করলেন সেখানে। ১৯৩৪ থেকে ’৪৪, দশ বছর কাটল আন্দুলেই। খুড়তুতো দাদা নবনীর বরাবরই কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল ‘বেচু’র প্রতি। নিয়মিত খবর রাখতেন। আন্দুলে গেলেন একদিন খোঁজখবর নিতে, যেমন যেতেন মাঝেমধ্যে। বীরেনকে একটু ছন্নছাড়া দেখলেন, মায়াই হল একরকম। ফের নিয়ে এলেন কলকাতায়। বীরেন তখন বছর চব্বিশের যুবক। বড় জামাইবাবু শ্যালককে ভালবাসতেন খুব। রসা রোডে ‘South Calcutta Pharmacy’ নামে একটি দোকান করেছিলেন কিছুদিন আগে। সেটা লিখে দিলেন বীরেনের নামে।

দাদা নবনীর রমেশ মিত্র রোডের বাড়িতে বসবাস শুরু করলেন বীরেন। নবনীর কন্যা কমলা তখন সতেরোর কিশোরী। ছটফটে, হাসিখুশি, প্রাণবন্ত। খুড়তুতো দাদার মেয়ের প্রেমে পড়লেন বীরেন। কমলাও ভেসে গেলেন কৈশোরের আবেগে। অনুরাগ ছিল উভয় পক্ষেই।

কমলাকে নিয়ে একদিন বাড়ি থেকে পালালেন বীরেন, উঠলেন সদানন্দ রোডের এক ভাড়াবাড়িতে। চেষ্টাও করলেন বারদুয়েক নবনীর বাড়ি গিয়ে বোঝাতে, ফল হল না। তুমুল বাদানুবাদ হল। নবনীর পরিবার এই সম্পর্ককে মানলেন না কিছুতেই। মেয়েরও এই গৃহত্যাগে সম্মতি আছে বুঝে নবনী সম্পর্ক ত্যাগ করলেন কমলার সঙ্গে। পুলিশে অভিযোগ করবেন ভেবেছিলেন প্রথমে। শেষমেশ অবশ্য বিরত থাকলেন সামাজিক মর্যাদাহানির আশঙ্কায়।

সদানন্দ রোডের বাড়িতে সংসার পাতলেন বীরেন, নতুন নামও দিলেন কমলার। ‘বেলারানী’। আইনসিদ্ধ বিয়ের প্রথাগত রীতিনীতি অবশ্য মানলেন না বীরেন, বেলার শত অনুরোধ সত্ত্বেও। সিঁথিতে নাম-কা-ওয়াস্তে সিঁদুর ঠেকিয়ে নিরস্ত করলেন বেলাকে, স্বামী-স্ত্রী পরিচয়েই দিন কাটতে লাগল। পুত্রসন্তানের জন্ম হল বছরদুয়েকের মধ্যে। নাম রাখা হল বথীন্দ্রনাথ দত্ত, আদরের ডাক ‘বোতন’।

সন্তানের জন্মের পর বীরেন-বেলা সদানন্দ রোডের বাড়ি থেকে উঠে এলেন ৫৫/৪/২, টার্ফ রোডে। যত সময় গেল, বীরেন ক্রমে বেলার প্রতি নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে লাগলেন। আলাপ হল শ্রীকৃষ্ণ লেনের বাসিন্দা

শ্রী সরোজকান্তি বসুর কন্যা মীরার সঙ্গে। ’৪৮-এর মাঝামাঝি রেজিস্ট্রি বিয়ে সেরে ফেললেন। বেলার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ গোপন করেই। বীরেনের দিদি-জামাইবাবুরা জানতেন বেলা-কাহিনি, কিন্তু তাঁরাও তীব্র বীতশ্রদ্ধ ছিলেন ওই সম্পর্ক নিয়ে। ভাবলেন, বেলা তো এক অর্থে রক্ষিতাই মাত্র, বিয়ে হলে যদি সম্পর্কে ইতি পড়ে, ভালই। এতে যে কারওরই ভাল হবে না, বেলারই হোক বা মীরার, বা বীরেনেরও, সেটা বিলক্ষণ বুঝেও। ওই যে, স্নেহ বড় বিষম বস্তু!

বিয়ের পরে প্রথম দু’বছর গোয়াবাগানে দিদির শ্বশুরবাড়িতে মীরাকে রাখলেন বীরেন। সেখানেই জন্ম হল এক কন্যাসন্তানের, যে পৃথিবীর মায়া কাটাল ভূমিষ্ঠ হওয়ার দু’দিন পরেই। মীরা সদ্যোজাতা কন্যার মৃত্যুশোকে আচ্ছন্ন ছিলেন কিছুদিন। শোকের প্রাবল্য কিছুটা কমলে বীরেনকে বললেন, বাড়ি খুঁজতে শুরু করো, আলাদা থাকব। বাস্তবিকই, কোন বিবাহিতা মহিলাই বা চান ওভাবে থাকতে ননদের অনুগ্রহে?

নাছোড়বান্দা মীরার জোরাজুরিতে বীরেন ১০২এ হরিশ মুখার্জি রোডের একতলার একটি ছোট ঘর ভাড়া নিলেন। ১৯৫৩-য় জন্ম নিল বীরেন-মীরার শিশুপুত্র।

আশ্চর্য কৌশলী রোজনামচা ছিল বীরেনের! কতই বা দূরত্ব টার্ফ রোড আর হরিশ মুখার্জি রোডের? অথচ, বছরের পর বছর মীরাকে জানতে দেননি বেলার কথা, বেলাকে মীরার! দুপুরের খাওয়া সারতেন টার্ফ রোডে, মীরাকে বলতেন, কাজের ব্যস্ততায় মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিতে হয় ওয়াইএমসিএ—র ক্যান্টিনে। রাতটা সপ্তাহের অধিকাংশ দিন কাটাতেন হরিশ মুখার্জি রোডের ভাড়াবাড়িতে। বেলাকে বুঝিয়েছিলেন, দোকানের ওষুধপত্র কেনার কাজে শহরের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে ঘনঘন।

বিবেকবর্জিত দুশ্চরিত্র ছিলেন বীরেন, ঠিকই। কিন্তু সত্যের স্বার্থে স্বীকার্য, গুণও ছিল কিছু। ছোট থেকেই পাড়ায় যাত্রা-নাটকে অভিনয় করতেন এবং নেহাত মন্দ করতেন না। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োয় যাতায়াত ছিল নিয়মিত। সেখানেই আলাপ-পরিচয় প্রযোজক-পরিচালকদের সঙ্গে। একটা-দুটো নয়, অভিনয় করেছিলেন ছ’টি ছবিতে। যার মধ্যে বাঙালির সর্বকালীন মহানায়কের কেরিয়ারের দ্বিতীয় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘কামনা’-ও ছিল। বাকি ছবিগুলি ‘নারী’, ‘মহাকাল’, ‘শুভদা’, ‘নিষ্কৃতি’ এবং ‘পাপের পথে’।

‘পাপের পথে’ আক্ষরিক অর্থেই পা বাড়ানো অবশ্য ওই স্টুডিয়োপাড়া থেকেই। জুটে গেল কিছু ইয়ারদোস্ত। রেসের মাঠ, জুয়ার ঠেক আর নিষিদ্ধ পল্লির ত্র্যহস্পর্শে দিশা হারালেন। ফার্মাসির কাজকর্মে মন দিতেন না আর। কর্মচারীদের উপর ছেড়ে দিলেন পুরোটাই। ফল, বাণিজ্যলক্ষ্মী বিরূপ হলেন, শুরু হল অর্থসংকট। এমনিতেই দুটো সংসার চালানো যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। কষ্টেসৃষ্টে তবু চলছিল। কিন্তু বীরেন চোখে অন্ধকার দেখলেন, যখন জানলেন, বেলা দ্বিতীয়বারের জন্য সন্তানসম্ভবা।

—এর পর?

—আমি আর পারছিলাম না স্যার। একে ব্যবসায় মন্দা চলছে। অনেক ধারদেনা হয়ে গিয়েছিল। তার উপর বেলা আর মীরাকে মিথ্যে বলে বলে ক্লান্ত। ভয় হত স্যার, যে-কোনও দিন ধরা পড়ে যাব। মীরা তো সন্দেহ করতে শুরু করেইছিল, বেলাও মাঝেমধ্যেই জিজ্ঞেস করত, রোজ রাত্রে কীসের এত কাজ? যখন শুনলাম, বেলা আবার মা হতে চলেছে, প্রথমেই মাথায় এল, আবার একগাদা খরচের ধাক্কা। ঠিক করলাম, বেলাকে সরিয়ে দেব। আর কোনও উপায় ছিল না স্যার, বিশ্বাস করুন!

বিশ্বাস-অবিশ্বাস পরে। জিজ্ঞাসাবাদের গোড়ার কথা, খুব বেশি বিরাম দিতে নেই স্বীকারোক্তির সময়। গোয়েন্দারা থামতে দিলেনও না। বীরেন বলে চললেন।

—এক চোট রাগারাগি করলাম প্রথমে। বললাম, এ সন্তান আমার নয়, হতে পারে না। আমার রাতে বাইরে থাকার সুযোগ নিয়েছ তুমি। শুনে বেলা প্রথমে কাঁদল, তারপর ঝগড়াঝাঁটি হল খুব।

খুনের পরিকল্পনায় একমাত্র পথের কাঁটা ছিল পুত্র বোতন, বয়স তখন ছয়। কী করা যায়? মীরার কাছে আষাঢ়ে গপ্পো ফাঁদলেন বীরেন। বললেন, এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন পথদুর্ঘটনায়। রেখে গিয়েছেন ছ’বছরের ছেলেকে, যে এখন সর্বার্থেই অনাথ। মীরা রাজি থাকলে হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে

রাখতে চান। মীরা আবেগপ্রবণ স্বভাবের ছিলেন, সম্মতি দিলেন এক কথায়।

২৭ জানুয়ারি, ১৯৫৪। বেলা তখন পূর্ণ সন্তানসম্ভবা। ফার্মাসি থেকে বাড়ি ফিরলেন বীরেন। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। বোতন ঘুমোচ্ছে অকাতরে। বেলা রুটি-আলুভাজা সাজিয়ে দিলেন থালায়। বীরেন নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলেন। এবং করেই গালিগালাজ শুরু করলেন বেলাকে, আমি এক পয়সাও খরচ সেই বাচ্চার জন্য করব না, যে আমার নয়। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল বেলার, মেজাজ হারালেন, তোমার কীর্তিকলাপ জানতেও আর বাকি নেই কারও।

বীরেন সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। বেমক্কা মারধর শুরু করলেন। রান্নাঘরে রাখা দা দিয়ে বেলার ঘাড়ে কোপ বসালেন। বেশ কয়েকবার। অবিরাম রক্তক্ষরণ এবং মৃত্যু কিছুক্ষণের মধ্যেই। কাঠের আলমারিতে কাপড়চোপড় ছিল। সেসব বার করে আলমারিতেই ঢুকিয়ে দিলেন মৃতদেহ। ধুয়েমুছে পরিষ্কার করলেন রক্তস্রোত। তার আগে বেলার শরীরে যা গয়নাগাটি ছিল, খুলে নিলেন সব। ছ'জোড়া সোনার চুড়ি, সোনার আংটি, কানের দুল, সব। এবং, এত কিছুর পর, ঘুমিয়ে পড়লেন নিশ্চিন্তে!

খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র

উদ্ধার করা বেলারানীর বালা

টার্ফ রোডের বাড়ির দু'তলায় একাই থাকতেন বেণু নামের এক অবিবাহিতা মহিলা। যাঁর সঙ্গে বেলার ঘনিষ্ঠতা ছিল, যিনি অসম্ভব ভালবাসতেন বোতনকে। বোতন দিনের অনেকটা সময় কাটাত 'বেণুমাসি'র সঙ্গে। ২৮ তারিখ ভোরে উঠেই পরের ধাপগুলো ছকে নিলেন বীরেন। কীরকম?

—ভোরে উঠে বেণুদিকে ডাকলাম। বললাম, গভীর রাতে বেলাকে ভরতি করাতে হয়েছে শিশুমঙ্গল হাসপাতালে। ডেলিভারি হবে যে-কোনও সময়। বোতনকে এ ক'দিন যদি বেণুদি নিজের কাছে রাখেন, ভাল হয়। বেণুদি সানন্দে রাজি হলেন। বোতন সকালে উঠে জানতে চাইল, মা কোথায়? বললাম, মা হাসপাতালে গিয়েছে, তোমার একটা ভাই বা বোন নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।

অচিন্তনীয়! বেলার লাশকে আলমারিবন্দি রেখে দিব্যি সকালে দোকানে বেরলেন বীরেন। ভাবতে থাকলেন সারাদিন, লাশ হাপিস করা যায় কীভাবে? লাশই যদি না পায় পুলিশ, কাকেই বা ধরবে, কীভাবেই বা ধরবে? রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ কর্মচারীরা বেরিয়ে গেল, দোকানে জমিয়ে রাখা 'যুগান্তর'-এর স্তূপ থেকে কয়েকটা বার করে নিলেন বীরেন। রওনা দিলেন টার্ফ রোড। পরের অংশ বীরেনের বয়ানেই পড়ুন, নিস্পৃহ বিবরণ দুঃসাধ্য।

—বেলার বডি বার করলাম আলমারি থেকে। প্রথমে দা দিয়ে মাথাটা কাটলাম। তারপর এক এক করে কান-নাক-চুল-হাত-পা-বুক-পেট, সব। মুখের চামড়া চেঁছে দিলাম। যুগান্তরের পাতা দিয়ে মুড়ে নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দিলাম আলমারিতে। তালাও লাগিয়ে দিলাম। পুরো ঘরটা দু'-তিনবার ধুলাম ফিনাইল দিয়ে। রক্তে থইথই করছিল তো, গন্ধও বেরচ্ছিল খুব।

যে ঘরে বেলারানীকে হত্যা করা হয়েছিল

সে-রাতেও নিশ্চিন্ত নিদ্রা ওই ঘরেই!

২৯ তারিখ যথারীতি দিনভর ফার্মাসিতে। রাত্রে ফিরে বীরেন আলমারি খুলে বার করলেন নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা মোড়কগুলো। রেশন আনার জন্য ব্যবহৃত দুটো বড় ব্যাগে বেলার খণ্ডিত দেহাংশ পুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশা ডাকলেন। কালীঘাট পার্কের কাছে গিয়ে ছেড়ে দিলেন রিকশা। কিছু মোড়ক ফেললেন

পার্কে, কিছু হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে কেওড়াতলা শ্মশানের কাছের শৌচালয়ের পাশে। টার্ফ রোডে ফিরে ফের একপ্রস্থ ধোয়ামোছা ফিনাইল দিয়ে, আলমারিতে বালতি বালতি জল ঢেলে মুছে ফেলা রক্তের দাগ।

৩০ জানুয়ারির সকাল। দোকানে বেরনোর সময় বীরেনের দেখা বেণুর সঙ্গে।

—বেলার কী খবর বীরেন? ভাবছিলাম, দেখতে যাব একবার।

—না না বেণুদি, এখন যেয়ো না। আজ রাতে ডেলিভারি হবে হয়তো। প্রেশারটা ওঠানামা করছে। ডাক্তাররা আলাদা কেবিনে রেখেছে। বাড়ি আসবে কয়েকদিনের মধ্যে, তখন তো দেখা হবেই।

উৎসুক প্রতিবেশীদেরও একই কথা বললেন। এবং পরের কয়েকদিন বেলার সমস্ত গয়নাগাটি সরিয়ে ফেললেন হরিশ মুখার্জি রোডে। মীরা জানতে চাওয়ায় বললেন, এক বন্ধু গয়না বন্ধক রেখেছেন। বেলার ব্যবহৃত কাপড়চোপড়—প্রসাধনী ফেলে দিলেন টালি নালায়। বোতনকে দিন দুয়েক পরে নিয়ে গেলেন হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে। অনাথ বন্ধুপুত্রের গল্প তো মীরাকে বলা ছিল আগেই। মীরা, অনুমান করা যায়, নির্ঘাত সন্দেহ করেছিলেন কিছু। বোতন নিশ্চয়ই মীরার সামনে 'বাবা' বলেই ডাকত বীরেনকে। ছ'বছরে অনাথ হওয়া বালক চট করে অন্য কাউকে 'বাবা' ডাকবে কেন? স্বামীর অপকীর্তি অনুমান করেও মীরা নীরব থেকেছিলেন, সংসাররক্ষার দায়ে?

সাক্ষ্যপ্রমাণ সংহত করা হল নিবিড় যত্নে। পান থেকে চুন খসারও বিলাসিতা ছিল না তদন্তকারী অফিসারের কাছে। হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হল বেলার গয়না| টার্ফ রোডের বাড়ির আলমারি থেকে উদ্ধার হল দা (weapon of offence), যাতে লেগে ছিল চুল। মেঝেতে জমাট বেঁধে থাকা রক্তের দাগ থেকে সংগৃহিত হল নমুনা (sample blood)। উদ্ধার হল ফিনাইলের বোতল, যাতেও আটকে ছিল চুল। রক্তের নমুনা যে মনুষ্যদেহেরই, প্রমাণ হল ফরেনসিক পরীক্ষায়। মৃতা নারীর সংরক্ষিত চুল আর দত্তদের বাড়িতে দা আর ফিনাইলের বোতলে আটকে থাকা চুল যে একই ব্যক্তির, তা-ও নিশ্চিত হল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল আদালতের বিচারে।

মৃতা যে বেলারানীই, প্রমাণের জন্য বেলার সন্তানসম্ভবা থাকার নথি একান্ত প্রয়োজন ছিল। সেটিও জোগাড় হল। টার্ফ রোডের বাড়ি তল্লাশির সময়ই পাওয়া গিয়েছিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের আউটডোরের টিকিট। ১৯৫৩-র ২৪ নভেম্বরের সেই টিকিটে স্পষ্ট লেখা ছিল, স্ত্রীরোগবিশারদের কাছে গিয়েছিলেন বেলা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়।

নিজের ফার্মাসিতে 'যুগান্তর' পত্রিকা রাখতেন বীরেন। বিক্রি করতেন না, পুরনো কাগজও জমিয়ে রাখার অভ্যাস ছিল। বাজেয়াপ্ত করা হল সমস্ত কাগজ। এবং ঠিক যেমনটা ভাবা হয়েছিল, সব ছিল কালানুক্রমিক, শুধু কয়েকটি দিন বাদে। সেই দিনগুলি, যে যে দিনের কাগজ দিয়ে মোড়া হয়েছিল বেলারানীর দেহের টুকরো টুকরো অংশ। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসেবে এর তাৎপর্য ছিল অপরিসীম, মাননীয় আদালতও লিপিবদ্ধ রেখেছিলেন রায়ে।

কালীঘাট পার্কে প্রাপ্ত পা-এর খণ্ডিত অংশ

ময়নাতদন্তের সময় আবিষ্কৃত মৃতার পায়ের পাতার অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের কথা উল্লেখ করেছি আগে। বীরেনের গ্রেফতারির পর খবর দেওয়া হল বেলারানীর আত্মীয়-পরিজনদের। যাঁদের সঙ্গে বীরেন-বেলার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না পারস্পরিক তিক্ততার কারণে। মৃত্যুর খবরে ছুটে এলেন স্বজনরা। এবং দেখা গেল, বেলার বাবা-কাকা-ভাই-বোনের পায়ের পাতাও মৃতার মতোই একটু বেশি বড়।

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার (ডিসি, ডিডি) চিঠি লিখলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রথিতযশা অধ্যাপক ড. এস এস সরকারকে। মৃতার পায়ের পাতার ছবি এবং বাবা-কাকাদের পায়ের পাতার ছবি ট্রেসিং (tracing) করে পাঠালেন, জানতে চাওয়া হল, Anthropology-র

তত্ত্ববিচারে কি বলা সম্ভব, এঁরা একই বংশোদ্ভূত কি না? গভীর পর্যবেক্ষণের পর ড. সরকার লিখিত মতামত পাঠালেন ইতিবাচক। হ্যাঁ, একই বংশের। প্রমাণের বুনিয়াদ দৃঢ়তর হল।

এত কাঠখড় পোড়ানোর প্রয়োজনই হত না আজকের দিন হলে, DNA পরীক্ষার সুবিধা থাকলে। কিন্তু তখনকার দিনে কোথায় সে সুবিধা? অপরাধ-তদন্তে DNA পরীক্ষার ব্যবহার তো শুরুই হয়েছে মাত্র কয়েক দশক আগে। ১৯৮৬ সালে ইংল্যান্ডের Leicester-এ দুটি খুন ও ধর্ষণের মামলায়।

বীরেনের কুকর্মের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হল কমলা ওরফে বেলারানীর মায়ের সাক্ষ্যে। স্মরণ করুন, সংরক্ষিত ছিল মৃতার ঊরুর অংশবিশেষ। বাঁ ঊরুতে ছিল কাটা দাগ। যা এক ঝলক দেখেই আকুল কান্নায় ভাসলেন কমলা ওরফে বেলার গর্ভধারিণী। বললেন, আট বছর বয়সে পড়ে গিয়ে ঊরুতে গুরুতর চোট পেয়েছিল মেয়ে। এ দাগ সেই দাগ। মা তো, সন্তানকে কে আর তাঁর চেয়ে বেশি চিনবেন?

পেশ করা হল, এতটুকু অতিশয়োক্তি না করেই লিখছি, 'সোনায় বাঁধানো' চার্জশিট। যা খুনের মামলার তদন্তকারীদের কাছে আজও শিক্ষণীয় গ্রাহ্য হয়। আলিপুর দায়রা আদালতের বিচারপর্বে অভিযুক্তের আইনজীবী তর্কের তুফান তুললেন। দাবি, মৃতা আদৌ বেলারানী নন। বেলা অজ্ঞাতপরিচয় প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছেন। যে দাবি সর্বৈব মিথ্যায় পর্যবসিত হল ছ' মাস ধরে চলা সওয়াল-জবাবের চাপানউতোরে। পারিপার্শ্বিক প্রমাণের নিশ্ছিদ্র বুনন এবং ফরেনসিক পরীক্ষার তথ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণের পর বীরেনকে ফাঁসির সাজা শোনাল আদালত।

তদন্তকারী অফিসারের চিঠি

রায়ে পরিবর্তন হল না হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টেও। প্রাণদণ্ড বহাল থাকল। ১৯৫৬-র ২৮ জানুয়ারির ভোরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসিকাঠ দেখা দিল নারকীয় অপরাধের কর্মফল রূপে। কালো কাপড়ে ঢাকল মুখ, গলায় আঁট হয়ে বসল দড়ি, পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে বীরেন দত্তের পায়ের তলা থেকে সরে গেল পাটাতন।

Criminology বা অপরাধবিজ্ঞানের জনক বলা হয় ইতালীয় সমাজতাত্ত্বিক Cesare Lombroso (১৮৩৫-১৯০৯)-কে। যিনি বিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্বকে এক যোগসূত্রে বেঁধে তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণে অপরাধীর মনের গহনতম অন্দরে ঢোকার প্রয়াস শুরু করেছিলেন। মূলত সেই আধারেই ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে এই বর্তমান সময় পর্যন্ত নিরন্তর জারি রয়েছে অপরাধ-গবেষণা। নিত্যনতুন বিশ্লেষণে অজানা দিগন্তের সন্ধান মিলছে প্রতিনিয়ত।

বেলারানী হত্যা মামলার তত্ত্বতালাশে কেস ডায়েরির হলুদ হয়ে আসা পাতা উলটোতে বসে তবু মনে হয়, কিছু ঘটনা থাকেই, যা গবেষণালব্ধ তথ্যের আজ্ঞাবহ নয়, যা জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যার অতীত। পড়লেন তো। ভাবুন, কোন তত্ত্বের ব্যাখ্যায় ধরা যায় বীরেন দত্ত রচিত নিধননাট্য, সে-যুগে যা পাশবিকতায় কল্পনাতীত এবং নৃশংসতায় নজিরবিহীন?

ত্রিনিদাদের বিশ্ববন্দিত ইতিহাসবিদ C .L. R. James (১৯০১- ৮৯) তাঁর বহুপঠিত বই 'Beyond a boundary' (১৯৬৩)-তে লিখেছিলেন, "What do they know of cricket who only cricket know?" যাঁরা শুধু ক্রিকেটই জানেন, তাঁরা আর কতটুকুই বা ক্রিকেট জানেন?

অপরাধীর মনের অন্দরমহলও তা-ই। যতটুকু দেখা যায়, জানা যায়, অদেখা-অজানা থেকে যায় ঢের বেশি। এ এক অন্য পৃথিবী। অন্য ছায়াপথ। যেখানে মনোজগতের আলো-আঁধারি ধোঁয়াশা-কুয়াশা এক বিছানায় শুয়ে থাকে পাশাপাশি।

যেভাবে রচিত হয়েছিল চিন্তাতীত হত্যালীলা, মনে পড়ে যায় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সেই অমর লাইনদুটি। ব্যঞ্জনা বিস্তৃত বহুদূর, তা ছুঁতে চাওয়ার ধৃষ্টতা নেই। তবু, এ মামলার দলিল-দস্তাবেজ নাড়াচাড়ার

সময় কী অমোঘ মনে হয় কবির ওই উচ্চারণ—

“পথের হদিশ পথই জানে, মনের কথা মত্ত
মানুষ বড় শস্তা, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো।”

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

—রাগের মাথায় করে ফেলেছি স্যার, মাথার ঠিক ছিল না।

—ওটা ধরা পড়ার পর সবাই বলে।

—না স্যার, বিশ্বাস করুন...

—বিশ্বাস-অবিশ্বাস পরে। আগে বল, বডি কোথায়? তাড়াতাড়ি, বেশি সময় নেই হাতে।

—পুঁতে দিয়েছি স্যার।

—কোথায়?

—ঝিলে, কাদার তলায়।

—কোন ঝিল, কোথাকার? পুরোটা বল, না হলে বলানোর হাজারটা উপায় জানা আছে আমাদের।

—বলছি স্যার। তারাতলার কাছে।

—গাড়িতে ওঠ।

আদেশ নির্বিবাদে পালন করেন মধ্যতিরিশের বিহারি যুবক। বন্দর অঞ্চল থেকে গাড়ি যাত্রা শুরু করে গন্তব্যে, তারাতলা।

—ঝিলটা কোথায়?

—বাঁ দিকের রাস্তাটায় ঢুকতে হবে স্যার ...

গাড়ি থামল তারাতলা রোড থেকে একটু ভিতরে একটি ঝিলের সংলগ্ন এলাকায়। মধ্যরাত অতিক্রান্ত তখন। রাস্তাঘাট জনমানবহীন, যথেষ্ট আলোকিত নয়। পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন জেরায় বিধ্বস্ত যুবক, টর্চ হাতে অনুসরণে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররা। অসময়ের বর্ষণে কর্দমাক্ত পথঘাট। উর্দিধারীদের পায়ে গামবুট, আবশ্যিক সাবধানতাস্বরূপ।

বডি ওইখানে স্যার, পোঁতা আছে। ভেবেছিলাম, কেউ খুঁজে পাবে না কখনও।

বডি? বডি আর কই? পচেগলে কঙ্কাল, কী-ই বা অবশিষ্ট আর?

একে একে পণ্যবাহী জাহাজ এসে নোঙর ফেলছে খিদিরপুর ডকে। হুগলি নদীর বুকে ভাসমান সার দিয়ে, নিত্যদিনের নিয়মে। পণ্যসামগ্রী যে কত, কত বিচিত্র আকার-আয়তনের যে বাক্স শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে, দেখে তাক লেগে যায় পঞ্চমের। পরিচিত দৃশ্যপট, তবু রোজই ভাবে, এত মালপত্র কোথা থেকে আসে, কারা পাঠায়? ডিউটির পর নদীর ধারে চুপচাপ কিছুটা সময় কাটানো প্রাত্যহিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে তার। বন্ধুরা ঠাট্টা করে, একই জিনিস, জাহাজ আসছে, মাল খালাস হচ্ছে। রোজ কী এত দেখিস?

পঞ্চম নিরুত্তর থাকে। উত্তরটা তার নিজেরও অজানা। কলকাতা বন্দরে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষীর চাকরিটা যখন পেয়েছিল বেশ কয়েকবছর আগে, সুদূর উত্তর ভারত থেকে পাড়ি দিয়েছিল অজানা-অচেনা বঙ্গদেশে, কখনও ভাবেনি জায়গাটা এত ভাল লেগে যাবে। সব ভাল লাগা ব্যাখ্যা করা যায়?

আজ অবশ্য মনটা ভারী হয়ে আছে। একটু আগে ঝগড়া হয়ে গেল বন্ধুর সঙ্গে।

—আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না পঞ্চম। খুব বেশি হলে আর এক সপ্তাহ সময় দিতে পারি। তার বেশি কিছুতেই নয়।

—তুই তো জানিস, আমি চেষ্টা করছি টাকাটা জোগাড়ের। আর একটু সময় চাই।

—এই কথাটা তো গত দু'মাস ধরে শুনছি। পাঁচ-দশ টাকার ব্যাপার হলে বলতাম না। পাঁচশো টাকা! বাবার থেকে ধার করে দিয়েছিলাম তোকে। শোধ করতে পারবি না জানলে দিতাম না।

—এইভাবে রোজ তাগাদা দিবি জানলে চাইতামও না। চুরি-ডাকাতি না করলে এক ধাক্কায় পাওয়া যায় পাঁচশো টাকা?

—তা হলে চুরি-ডাকাতিই কর! নদীর ধারে বসে জাহাজ গুনলে তো আর টাকা আসবে না!

মাথা গরম হয়ে যায় পঞ্চমের।

—দেব না যা! এক পয়সাও ফেরত দেব না। লেখাপড়া করে তো আর টাকা নিইনি, কোনও প্রমাণ নেই। যা পারিস কর।

—হ্যাঁ, সেটাই করব। টাকা কীভাবে আদায় করতে হয়, আমার জানা আছে। আমার টাকা মেরে দিয়ে কীভাবে চাকরি করিস, দেখব।

—আরে যা যা, মুরোদ থাকলে দেখে নিস যা দেখার!

পঞ্চমের মনে হয়, এতটা মেজাজ গরম না করলেই হত। সত্যিই তো, পাঁচশো টাকা তো কম নয় নেহাত। তবে সে যে চেষ্টা করছে না, এমনও তো নয়। সেটা বুঝবে না? মা-বাবা একসঙ্গে অসুস্থ না হয়ে পড়লে প্রয়োজনও হত না একসঙ্গে অত টাকার। কী করবে এখন? গ্রামের বাড়ির জমিটা বেচে দেবে? বাবা-কাকারা রাজি হবেন?

নদীর ধার থেকে উঠে পড়ে পঞ্চম। হাঁটতে শুরু করে কোয়ার্টারের দিকে। স্ত্রী এবং দুই শিশুপুত্রের জন্য মন কেমন করে ফিরতে ফিরতে। কত দিন দেশের বাড়ি যাওয়া হয়নি। পরের সপ্তাহে সুপারভাইজার সাহেবের কাছে ছুটির দরখাস্ত পেশ করবে স্থির করে ফেলে। কাজে ফাঁকি দেয় না বলে সাহেব পছন্দই করেন তাকে। দেশে গিয়ে জমিজমা বেচার কথাটাও এবার পাড়তে হবে। এভাবে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে আর কত দিন?

নামেই ঝিল, জলের থেকে কাদারই প্রাধান্য। গভীর রাতে কিঞ্চিৎ শ্রমসাধ্যই ছিল ঝিলের মাঝামাঝি পুঁতে রাখা দেহ উদ্ধার। 'দেহ' লিখলাম বটে, বাস্তবে কঙ্কাল। আক্ষরিক অর্থেই। মাংস নেই কণামাত্র। একটি ধুতি এবং ছেঁড়া শার্ট আলগা লেগে রয়েছে। চোয়ালের নীচের অংশ আর বুকের বাঁ দিকের কিছু হাড় নেই। নেই ডান পায়ের মালাইচাকি (Patella), নেই hyoid bone (ঘাড় থেকে চিবুক পর্যন্ত বিস্তৃত অনেকটা 'U' আকারের হাড়, যা জিভের নড়াচড়া ও খাবার গলাধঃকরণে সাহায্য করে)। বেশ বোঝা যায়, জায়গাটি কর্দমাক্ত ছিল বলে পচনপ্রক্রিয়াও (decomposition) ঘটেছে দ্রুততর। শেয়াল-শকুনেও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে অভাবিত খাদ্যবস্তুর।

মাটি খুঁড়ে পাওয়া পঞ্চম শুক্লার কঙ্কাল

ছেঁড়া শার্টটিতে চারটি বোতাম, পকেটে একটি ছোট লাল পতাকা, সাদা বর্ডারসহ। বন্দরের সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মীদের পোশাকে থাকত যে চিহ্ন। পইতেও রয়েছে অক্ষত। রাত ভোর হলে ঝিলটির সর্বত্র তল্লাশি চালিয়ে কাদার মধ্য থেকে মিলল চোয়ালের হাড়। চুন রাখার একটি ছোট কৌটো, যার উপরে হিন্দিতে খোদাই করা, "ওম জয় হিন্দ"। প্রায় ফুটখানেক লম্বা একটি ছুরিও পোঁতা ছিল কাদাতে, উদ্ধার হল। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র?

পঞ্চম শুক্লা হত্যা মামলা। সাউথ পোর্ট পুলিশ স্টেশনে নথিভুক্ত। তারিখ ২১ মার্চ, ১৯৬০। সে প্রায় ছয় দশক আগের কথা। অভিযোগ খুনের উদ্দেশ্যে অপহরণ এবং হত্যার। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪ এবং ৩০২

ধারা।

এ মামলায়, শুরুতেই লিপিবদ্ধ থাক, রহস্য উদঘাটনের রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ নেই, যা পাঠক সন্ধান করেন গোয়েন্দাকাহিনিতে, সে কাল্পনিক ঘটনাই হোক বা সত্য। নেই একাধিক সন্দেহভাজনের মধ্যে অপরাধীকে চিহ্নিত করার উত্তেজনা।

সমাধানে মেধার ব্যতিক্রমী প্রয়োগ ছিল, এমন দাবি অন্যায্য। অন্যান্য খুনের মামলার তুলনায় কিনারা ছিল সহজসাধ্যই। তবু, কলকাতা পুলিশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই মামলা এক চিরকালীন মাইলফলক। শুধু কলকাতাই বা লিখি কেন, সারা দেশেই দিকচিহ্ন তদন্ত-গবেষণায়। কারণ?

কারণ নিহিত, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার পার্থক্যে | তদন্তপথের দুটি স্পষ্ট বিভাজন থাকে। একটি অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা পর্যন্ত, তার গ্রেফতারি পর্যন্ত। যে বিন্দুতে সমাপন কাল্পনিক রহস্যকাহিনির। সত্যজিতের ফেলুদাই হন বা শরদিন্দুর ব্যোমকেশ, নীহাররঞ্জনের কিরীটিই হন বা হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত-মানিক, অপরাধটা কে করল এবং কীভাবে করল, তাতেই মূলত সীমাবদ্ধ থাকে রহস্যপিপাসুর কৌতূহল। না লেখকের, না পাঠকের, দায় থাকে না বিচারপর্বের সাতকাহনের। বাস্তবের গোয়েন্দাদের কাছে, লালবাজারের ফেলু-ব্যোমকেশদের কাছে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

কিনারা-পরবর্তী কর্মকাণ্ড শাস্তিবিধান নিশ্চিত করতে পারে অভিযুক্তের। আপাতনীরস এবং রোমাঞ্চবর্জিত এক পথ। অতিক্রম করতে ব্যর্থ হলে নিরর্থক যাবতীয় প্রাক্-কিনারা পরিশ্রম। এই পর্বে উত্তেজনার উপাদান যেহেতু সচরাচর থাকে না তেমন, তদন্তের এই অংশটি সম্পর্কে কাল্পনিক গোয়েন্দাগল্পের নিরাসক্তি সহজবোধ্য। আলোচ্য মামলার বিবরণীতে কিনারা-উত্তর অংশটিই প্রধান উপজীব্য।

রোজ কোয়ার্টারে ফিরে আসেন সন্ধে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে। ১০ মার্চ অন্যথা হল। রাত গড়িয়ে ভোর হল, ভোর গড়িয়ে সকাল, পঞ্চম ফিরলেন না। পঞ্চমের শ্যালকও বন্দরকর্মী ছিলেন। থাকতেন সংলগ্ন কোয়ার্টারেই। খোঁজাখুঁজি এবং উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষার পর সাউথ পোর্ট থানায় মিসিং ডায়েরি নথিভুক্ত হল সে-রাতেই।

কারও নিখোঁজ হওয়ার খবর পেলে যা যা করণীয় প্রথামাফিক, করা হল। ওয়ারলেস বার্তা শহরের থানাগুলিতে, কোথাও কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে কি না তার তথ্যতালাশ, নিখোঁজ ব্যক্তির ছবি সংগ্রহ এবং যথাসাধ্য প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। ফল হল না, বছর পঁয়ত্রিশের পঞ্চম নিখোঁজই।

পঞ্চম শুক্লা

যত সহকর্মী ছিলেন পঞ্চমের, বন্ধুবৃত্তে ছিলেন যাঁরা, প্রস্তুত হল তালিকা। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীনই তাঁদের একজনের থেকে জানা গেল, রামলোচন নামের এক বন্ধুর সঙ্গে কাপড়ের ব্যবসা করার কথা ইদানীং ভাবছিলেন পঞ্চম। বন্দরে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী, হঠাৎ কাপড়ের ব্যবসা কেন? খোঁজ শুরু হল রামলোচনের। ঠিকানা পাওয়া গেল অচিরেই। তারাতলায় একতলা ফ্ল্যাট তিন কামরার, থাকতেন একাই।

প্রতিবেশীরা জানালেন, ১১ মার্চ ভোরবেলা থেকে রামলোচনকে আর দেখেননি। ঘর তালাবন্ধ। সাদা পোশাকের পুলিশকে লাগানো হল চব্বিশ ঘণ্টার নজরদারিতে।

কিছুদিনের নিষ্ফলা প্রহরার পর ২১ মার্চ ভোররাতে নিজের বাড়িতে চাদরমুড়ি দিয়ে ঢোকার সময় আটকানো হল রামলোচনকে। পুরো নাম রামলোচন আহির। বয়স ত্রিশের কোঠায়, থানায় এনে ঘণ্টাদুয়েকের জেরাতেই প্রকাশ্যে এল পঞ্চম-হত্যার ইতিবৃত্ত।

রামলোচন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। অবাঙালি, কিন্তু বংশপরম্পরায় বাস কলকাতায়। বাবা-ঠাকুরদার পারিবারিক ব্যাবসা ছিল কাপড়ের। রামলোচন ছিলেন ঝুঁকিপ্রবণ প্রকৃতির, শুধুই কাপড়ের ব্যবসায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখায় আগ্রহী ছিলেন না। নানাবিধ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে প্রবল উৎসাহ ছিল। বিদেশে পণ্যরফতানির

কথাও ভাবতে শুরু করেছিলেন সম্প্রতি। সেই সূত্রে যাতায়াত বেড়েছিল ডক এলাকায়, আলাপ হয়েছিল পঞ্চমের সঙ্গে। যা দ্রুত পরিণত হয়েছিল সখ্যে।

বাবা-মা দেশের বাড়িতে প্রায় একইসঙ্গে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় কিছুকাল আগে জরুরি ভিত্তিতে অর্থের প্রয়োজন হয় পঞ্চমের। চিকিৎসা ছিল প্রভূত খরচসাপেক্ষ। শরণাপন্ন হলেন অর্থবান বন্ধুর। বিপদে সাহায্যের হাত বাড়ালেন রামলোচন। পাঁচশো টাকা ধার দিলেন। সে-সময়ে, ছয়ের দশকে, পাঁচশো মানে অনেক টাকা।

গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির ব্যবসার কথা বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলেন রামলোচন, বিনিয়োগও করে ফেলেছিলেন বহুলাংশে। কিন্তু ব্যবসাকে একটা ভদ্রস্থ জায়গায় দাঁড় করাতে আরও অর্থের জোগান একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। পঞ্চমের কাছে ধার দেওয়া টাকা ফেরত চাইলেন। পঞ্চম জানালেন, চেষ্টা করবেন শোধ করতে, কিন্তু আপাতত অপারগ।

নিয়মিত তাগাদা শুরু করলেন রামলোচন, তাঁরও আশু প্রয়োজন অর্থের। এই নিয়েই ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে একদিন তীব্র বচসা।

—আমার টাকা চাই তিনদিনের মধ্যে। না হলে পুলিশে যাব।

—যা না, কোনও প্রমাণ আছে? লেখাজোকা তো কিছু হয়নি, আমি পুলিশকে বলব, টাকা নিইনি।

—ঠিক আছে, আমিও দেখাব, আমার টাকা মেরে দিয়ে তুই পার পাবি ভেবেছিস?

—বললাম তো, যা করার করে নিস।

ক্রোধান্ধ রামলোচন সেদিনই স্থির করলেন, পঞ্চম বাঁচার অধিকার হারিয়েছেন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দেখা করলেন পঞ্চমের সঙ্গে।

—পঞ্চম, তোর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর থেকেই মনটা খারাপ। তুই কিছু মনে করিস না ভাই।

—সে তো আমারও মেজাজটা তেতো হয়ে আছে সেদিনের ঘটনার পর থেকে। আমি কি বলেছি টাকা দেব না?

—আরে ছাড়, যা হওয়ার হয়েছে। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।

—কী?

—গাড়ির পার্টসের ব্যবসাটা ঠিক জমছে না। কাপড়ের ব্যবসার ঘাঁতঘোঁত আমার হাতের তালুর মতো জানা। ওটাই ভাল করে করব ভাবছি। একজন রাজি হয়েছে টাকা ঢালতে, পরশু বাড়িতে আসবে। তুইও আয়।

—কিন্তু আমি গিয়ে কী করব?

—আরে তুই চাকরির পর ফ্রি-টাইমে লেবার দিবি। হুট করে তো আর টাকার জোগাড় করতে পারবি না। এভাবে শোধ দিবি আস্তে আস্তে। ঝগড়া করে কী লাভ?

পঞ্চম সম্মত হয়ে গেলেন রামলোচনের প্রস্তাবে। নির্ধারিত দিনে রাত আটটায় পৌঁছলেন বন্ধুর বাড়ি। পানাহার হল। দশটা নাগাদ সামান্য অধৈর্য হয়ে পড়লেন পঞ্চম।

—ঘুম পাচ্ছে রে এবার। কখন আসবে তোর ব্যবসায়ী বন্ধু?

—এসে যাওয়ার তো কথা। কেন যে দেরি করছে? মনে হয় আটকে গেছে কোথাও। এক কাজ করি চল, হেঁটে আসি একটু ঝিলের পাশ থেকে, যা গুমোট গরম। পাশেই তো, মিনিট পনেরো হাওয়া খেয়ে চলে আসব। তারপর তুই বাড়ি চলে যাস। আমিও চলে আসব।

—হুঁ ... চল।

ঝিলের পাড়ে কিছু সময় কাটল গল্পগুজবে। ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার। রাত সোয়া এগারোটা নাগাদ পঞ্চম বললেন, চল, এবার বাড়ি যাই।

উঠতে যাবেন, সহসা জামার ভিতরে গোঁজা ধারালো ছুরি বার করলেন রামলোচন। চালিয়ে দিলেন পিছন থেকে, পঞ্চমের ঘাড়ে। আকস্মিক আঘাতের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না শক্তসমর্থ চেহারার পঞ্চম, বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই একের পর কোপ বসিয়ে দিয়েছেন রামলোচন। রক্তাক্ত এবং ভূপতিত পঞ্চমের উপর নির্বিচার ছুরিকাঘাত এর পর, বুকে-পেটে-গলায়। মৃত্যু এল অনিবার্য।

—তারপর?

—ভেবেই রেখেছিলাম আগে। বডিটাকে পুঁতে দিলাম ঝিলের কাদাজলের মধ্যে। জলেই ফেলে দিলাম ছুরিটা, যেটা বাবা শখ করে কিনেছিলেন বেশ কয়েক বছর আগে দিল্লি থেকে। জামার ভিতর গুঁজে নিয়ে গিয়েছিলাম ঝিলে। আমার টাকা দিচ্ছিল না পঞ্চম, আবার রোয়াবও দেখিয়েছিল, মাথার ঠিক ছিল না তাই। ভুল করে ফেলেছি স্যার, স্রেফ রাগের মাথায়।

কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইনস্পেকটর শ্রীঅনিল ব্যানার্জির উপর পড়ল তদন্তভার। কিনারা সম্পূর্ণ হয়েছে নিঃসংশয়, অপরাধ স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। কিন্তু প্রমাণ? ভারতীয় সাক্ষ্য আইন (Indian Evidence Act)-এর ২৭নং ধারায় অভিযুক্তের বয়ান অনুসরণে উদ্ধার হয়েছে কঙ্কাল। মিলেছে ছুরি (weapon of offence)। মৃতের আত্মীয়স্বজন চিহ্নিত করেছেন ধুতি-শার্ট, চুনের কৌটো। কী বাকি থাকে আর?

বাকি যে মূল কাজটাই, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছিলেন অনিলবাবু। কঙ্কালটি যে পঞ্চমেরই, তা তর্কাতীত প্রমাণ করা। পরামর্শ করলেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের সঙ্গে। যাঁরা জানালেন দ্ব্যর্থহীন, অভিযুক্ত যা-ই কবুল করুক পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে, অপরাধের সঙ্গে সংস্রব অস্বীকার করবেই আদালতে, যেমন করে নিরানব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে। এবং বেকসুর খালাস পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, যদি না সন্দেহাতীত প্রমাণ পেশ করা যায় যে কঙ্কালটি পঞ্চমেরই দেহের। এখনও পর্যন্ত প্রমাণস্বরূপ যা রয়েছে হাতে, তা নিশ্চিত চিহ্নিতকরণের পক্ষে অপর্যাপ্ত। সন্দেহের আনুকূল্য অভিযুক্ত পাবেনই, ধরে নিয়ে অগ্রসর হওয়াই সমীচীন।

অনিলবাবু প্রয়াত হয়েছেন বেশ কিছুকাল হল। তাঁর তৎকালীন অধীনস্থ অফিসারদের মধ্যে যাঁরা এখনও জীবিত, তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতায় কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় আদ্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষটির চরিত্রবৈশিষ্ট্যের। স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডসের নিস্পৃহ নিধন করায়ত্ত ছিল না হয়তো, কিন্তু মনোভঙ্গি ছিল গাভাসকরের। হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও স্থিতধী সংকল্পে। পরিকাঠামোর সহায়তায় সাফল্যে বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং তার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শৃঙ্গস্পর্শে ছিলেন একমুখী। নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস ছিল, দেশবিদেশের অপরাধ-তদন্তের বহমান ধারাটি সম্পর্কে সদাসচেতন থাকতেন পেশাগত উৎকর্ষের তাগিদে।

চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন, কীভাবে হবে কঙ্কালের শনাক্তকরণ? বকেয়া টাকা ফেরত না পাওয়ার আক্রোশে একটা জলজ্যান্ত লোককে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করল, খালাস পেয়ে যাবে? অবসরে অনেকটা সময় কাটাতেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে, তৎকালীন ইন্টারনেটহীন সময়কালে জ্ঞানবৃদ্ধিতে গ্রন্থাগারই ছিল মুখ্য ভরসাস্থল। বিদেশে কোথায় একটা এমন মামলা হয়েছিল না? কোথায় যেন পড়েছিলেন? অনিল ছুটলেন আলিপুরে। জাতীয় গ্রন্থাগার যদি দেখাতে পারে কাঙ্ক্ষিত আলোর দিশা।

দিশা মিলল বিস্তর বইপত্র নেড়েচেড়ে। এই তো! এই কেসটাই তো খুঁজছিলেন, "The Buck Ruxton 'Jigsaw murders' case"।

মামলার সংক্ষিপ্তসার এই। বাক রাক্সটনের জন্ম ভারতে। নাম ছিল বখতিয়ার রুস্তমজি রতনজি হাকিম। ডাক্তারি পাশ করে চলে যান ইংল্যান্ডে। ওকালতনামা করে নাম পরিবর্তন করেছিলেন। চিকিৎসক হিসেবে রোগীমহলে যথেষ্ট সমাদৃতই ছিলেন। স্ত্রী ইসাবেলা এবং মহিলা গৃহকর্মী মেরি রজারসনকে নিজের ল্যাঙ্কাশায়ারের বাড়িতে কুপিয়ে খুন করেছিলেন। ১৯৩৫-এর সেপ্টেম্বরে।

রাক্সটন নিজে চিকিৎসক ছিলেন, প্রয়োগ করেছিলেন অধীত বিদ্যা। দুটি দেহেরই অগুনতি খণ্ড

করেছিলেন। শনাক্ত করার যাবতীয় শরীরচিহ্ন মুছে দিতে চেষ্টা করেছিলেন এক এক করে। খণ্ডগুলি পার্সেলে মুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন স্কটল্যান্ডের একটি ব্রিজের নীচে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, দেহাংশ যদি পরে আবিষ্কৃতও হয়, শনাক্তকরণ যেন হয় অসম্ভব। মোটিভ? যৌন-ঈর্ষা জনিত সন্দেহপ্রবণতা। রাক্সটনের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, ইসাবেলা জড়িয়ে পড়েছেন গভীর পরকীয়ায়। তীব্র অশান্তি হত স্বামী-স্ত্রীর। একাধিকবার সন্তানদের নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলেও গিয়েছিলেন ইসাবেলা। প্রতিবারই ফিরিয়ে এনেছিলেন রাক্সটন। অবিশ্বাস-সন্দেহ-বাদানুবাদ অবশ্য অব্যাহতই থেকে গিয়েছিল। যার চূড়ান্ত পরিণতি ইসাবেলার হত্যায়। এবং ঘটনার সাক্ষী থাকায় গৃহকর্মী মেরিকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ায়।

ঘটনার পক্ষকাল পরে পার্সেলে মোড়া দেহাংশ আবিষ্কার করেন কয়েকজন পথচারী। ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছবি তদন্তকারীদের মনে করিয়ে দিয়েছিল ‘Jigsaw Puzzle’-এর কথা। নানা টুকরো জুড়ে একটি পূর্ণ ছবি তৈরি করার খেলা। মামলাটির নামই হয়ে গিয়েছিল ‘Jigsaw Murders’।

একঝাঁক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অসাধ্যসাধন করেছিলেন। দুটি দেহের অসংখ্য খণ্ডাংশ জুড়ে পূর্ণাবয়বে ফিরিয়ে এনেছিলেন, ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট অধ্যাপক জন গ্লেইস্টার এবং অ্যানাটমি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জেমস কুপার ব্র্যাশের নেতৃত্বে। ফরেনসিক প্রমাণের এহেন অভিনব এবং সফল প্রয়োগ হয়নি অতীতে। বিশ্বে সেই প্রথম ‘Photographic Superimposition’ ব্যবহৃত হয়েছিল তদন্তে। যা নিশ্চিত চিহ্নিত করেছিল মৃতা দুই মহিলাকে, অকাট্য প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন ডা. রাক্সটন। ফাঁসি হয়েছিল।

কী প্রবল চর্চিত হয়েছিল এ মামলা, কী তীব্র প্রভাব ফেলেছিল জনমানসে, উদাহরণ দিই। ‘Red sails in the sunset’ গানটি তখন তুমুল জনপ্রিয় বিশ্বজুড়ে। বিখ্যাত গীতিকার জিমি কেনেডি লিখেছিলেন। আয়ারল্যান্ডের উত্তর উপকূলে পোর্টস্টুয়ার্ট (Portstewart) শহরে বাড়ি ছিল কেনেডির, সমুদ্র থেকে অদূরে। প্রায়ই দেখতে পেতেন একটি বিলাসবহুল প্রমোদতরী। সেই দৃশ্যই গানটির অনুপ্রেরণা। রাক্সটন মামলা নিয়ে গান পর্যন্ত বেঁধে ফেলা হয়েছিল ‘Red sails...’-এর ছায়ায়।

“Red stains on the carpet/ red stains on the knife Oh Dr Buck Ruxton/ You murdered your wife Then Mary she saw you/ You thought she would tell So Dr Buck Ruxton/ You killed her as well.”

অনিল ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে ছুটলেন ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে (FSL)। মুষ্টিমেয় মামলাতেই তখনও প্রয়োগ হয়েছে ‘Photographic Superimposition’-এর। কিন্তু হয়েছে তো! পঞ্চম শুক্লার ক্ষেত্রে কেন করা যাবে না?

FSL-এর তৎকালীন ডিরেক্টর ছিলেন অধ্যাপক ড. নির্মলকুমার সেন। অনিল সবিস্তার জানালেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কঙ্কাল থেকে লিঙ্গনির্ধারণ হয়ে গিয়েছে। উচ্চতা এবং বয়স-নিরূপণও সম্পূর্ণ। পঁয়ত্রিশ বছরের পুরুষদেহ, পাঁচ ফিট ছয়। যা মিলে যাচ্ছে পঞ্চমের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে। প্রশ্নাতীত শনাক্তকরণের জন্য, সেই প্রাক-DNA যুগে, রাক্সটন মামলার পদ্ধতির শরণ নেওয়া ছাড়া উপায় কী আর? দেখবেন একবার চেষ্টা করে?

ড. সেন অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন। ভারতে সেই প্রথম কোনও মামলার তদন্তে ব্যবহৃত হল ‘সুপারইম্পোজিশন’ পদ্ধতি। প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসকদের হাতযশে যে কত অভিযুক্ত পর্যবসিত হয়েছে অপরাধীতে, হিসাবের অতীত। আলোচ্য মামলায় যেমন।

সুপারইম্পোজিশন কী? সহজ ভাষায়, কোনও এক অবয়বের কোনও একটি জায়গায় একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অন্য একটি অবয়বের ওই জায়গার ওই নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলে যাওয়া, মিশে যাওয়া নিখুঁতভাবে। মানবদেহের ক্ষেত্রে এই বিন্দুগুলিকে বলা হয় nodal point। যা শারীরগত, এবং ব্যক্তিবিশেষে এক এক জনের ক্ষেত্রে ভিন্ন অবস্থান প্রকৃতিগত পার্থক্যে। বিন্দুর সঙ্গে যদি মেলাতে হয় বিন্দুকে, দুটি অবয়বকে একই মাপের, একই আকৃতির করে নেওয়া জরুরি। যে কারণে পঞ্চম শুক্লার পাসপোর্ট সাইজের ছবিটিকে নেগেটিভের সাহায্যে

পরিবর্তিত করা হল quarter size-এ। উদ্দেশ্য, খুলির পরিমাপের সঙ্গে ছবির সাযুজ্য স্থাপন।

এখানে দু'-একটি কথা প্রাসঙ্গিক। আমাদের মুখ, নাক, কপাল, চিবুক ও কান আলাদা প্রত্যেকের, হাড়ের গঠন অনুযায়ী। কারও কপাল চওড়া, কারও মাথা বড়। কারও চিবুক ছোট, কারও গলা স্বাভাবিকের তুলনায় মাপে বড়। কাজ করা হচ্ছে দুটি অবয়ব নিয়ে। কপালের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু বা nodal point-কে যদি চিবুকের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে বা এক গালের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে যদি অন্য গালের একটি বিন্দুর সঙ্গে এক সরলরেখায় যোগ করা যায় এবং দুটি অবয়বের ক্ষেত্রেই যদি দৈর্ঘ্য এক হয়, তবে বলা যায় যে দুটি অবয়ব একই ব্যক্তির।

পঞ্চম শুক্লার করোটি

পঞ্চমের ক্ষেত্রে কোয়ার্টার সাইজের ছবিটিকে স্থাপন করা হল ক্যামেরার ঘষা কাচের (Ground Glass) নীচে। চিহ্নিত করা হল nodal point সমূহ। রেখাঙ্কিত করে নেওয়া হল অবয়বকে। ছবিটির উপর অতঃপর বসানো হল একটি স্ট্যান্ড। খুলিটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনা হল একই অক্ষে। এবং দেখা গেল, খুলির নোডাল পয়েন্টগুলির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে অবয়বের নোডাল পয়েন্ট। মুখাবয়বের গড়ন, নাক-কান-গলা-চিবুক, সব। প্রাপ্ত খুলি এবং ছবিটি যে একই ব্যক্তির, প্রমাণিত হল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। তর্কের অবকাশ ছিল না বিন্দুমাত্র।

মৃত্যুর এগারো দিন পরে উদ্ধার হওয়া কঙ্কাল থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেহের শনাক্তকরণ। তা-ও প্রথম বিশ্বের তুলনায় অনগ্রসর দেশে, প্রযুক্তির নিরিখে তুলনায় অনুন্নত পরিসরে, সাড়া পড়ে গিয়েছিল ভারতের পুলিশ মহলে।

বর্তমান সময়ে তদন্তে 'সুপারইম্পোজিশন পদ্ধতির' কম্পিউটার-নির্দেশিত প্রয়োগ নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ছয় দশক আগে, এদেশে অচিন্তনীয় ছিল বিজ্ঞানভাবনার এই অভিনব প্রয়োগশৈলী। যাঁর দূরদৃষ্টি চালিকাশক্তি ছিল সাফল্যের নেপথ্যে, সেই অনিল ব্যানার্জি প্রয়াত হয়েছেন দীর্ঘদিন আগে। কিন্তু জীবদ্দশাতেই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক তদন্তের।

ভারতের পুলিশ মহলে তদন্তপ্রক্রিয়ার উৎকর্ষের সিলমোহর পড়ত 'Indian Police Journal'-এ বিবরণী স্থান পেলে। ডাকসাইটে আইপিএস অফিসার, স্বনামধন্য আইনবিদ বা যশস্বী চিকিৎসক ছাড়া লেখকতালিকায় স্থান পাবেন কেউ, ঘটত কদাচিৎ।

ইনস্পেকটর অনিল ব্যানার্জিকে পঞ্চম শুক্লা হত্যা মামলার নির্যাস পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করার সসম্মান আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সম্পাদকমণ্ডলী। অনিলবাবু লিখেছিলেন তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ। শীর্ষক, 'Camera identifies human skull'। যাতে ধরা ছিল অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর আখ্যান, যা আজও অবশ্যপাঠ্য তদন্তশিক্ষার্থীর।

বিচারপর্বে প্রশ্ন উঠেছিল ব্যবহৃত পদ্ধতির আইনি বৈধতা এবং প্রমাণমূল্য নিয়ে, ধোপে টেকেনি। নিম্ন আদালত প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন রামলোচনকে। হাইকোর্ট সাজা হ্রাস করেছিলেন যাবজ্জীবন কারাবাসে। যে রায় অপরিবর্তিত থেকেছিল সুপ্রিম কোর্টে।

কলকাতা পুলিশকে যে তুলনা করা হত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে, সর্বজনবিদিত। এই অভিধাপ্রাপ্তিতে অবদান আছে তদন্তে বিরল সাফল্যের নজিরসৃষ্টিকারী অসংখ্য মামলার, যার মধ্যে প্রথম সারিতে থাকবে এই পঞ্চম শুক্লা হত্যা। ঘটনাচক্রে যার কিনারা হয়েছিল স্কটল্যান্ডেরই একটি ব্রিজের নীচে পড়ে থাকা দেহাংশের রহস্যভেদ প্রক্রিয়ার অনুসরণে।

অন্য কোথাও নয়, স্কটল্যান্ডে! কী আশ্চর্য সমাপতন!

বণিকবাড়ির অন্তরমহলে

—থানা থেকে আসছি। দরজাটা খুলুন প্লিজ়!

রাত সোয়া দশটা তখন। কোলাপসিবল গেট পাঁচতলার ফ্ল্যাটের বাইরে। তালা দেওয়া। গেটের পিছনে কাঠের দরজা। যা খোলাই ছিল প্রায় অর্ধেক, পুলিশের ডাকাডাকিতে বন্ধ হয়ে গেল দড়াম।

লোক আছে ভিতরে, একাধিক, বোঝার জন্য বুদ্ধি খাটানোর দরকার হয় না কোনও। নারীকণ্ঠ-পুরুষকণ্ঠ, ফিসফিসানি দিব্যি শোনা যাচ্ছে বাইরে থেকেও। ফের ডাক দেওয়া হল, 'গড়িয়াহাট থানার ওসি হীরেন্দ্রলাল মজুমদার বলছি, দরজাটা খুলুন একবার।'

ভিতরে যাঁরা ছিলেন, নিরুত্তর। ফিসফিস কথাও শোনা যাচ্ছে না আর। উলটে ওসি-র আওয়াজে নিভে গেল ভিতরের আলো, যেটা জ্বলছিল এতক্ষণ। ডাকাডাকি, দরজায় ধাক্কাধাক্কি আরও বেশ কিছুক্ষণ। ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ওসি চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিলেন, 'শেষ বারের মতো বলছি। যে বা যাঁরা ভিতরে আছেন, দরজা খুলুন। না হলে ভেঙে ঢুকতে বাধ্য হব, খুলুন!'

তবু কোনও সাড়াশব্দ নেই। ওসি খবর দিলেন দমকলে। অনুরোধ করলেন গেট এবং দরজা ভাঙার জন্য যা যা দরকার, সব নিয়ে দ্রুত চলে আসতে। ২৬, গড়িয়াহাট রোডের পাঁচতলায়। খুব বেশি হলে মিনিটদশেক। যন্ত্রপাতি নিয়ে পৌঁছলেন দমকলকর্মীরা।

লোহার মজবুত কোলাপসিবল গেট। কাঠের দরজাটিও নেহাত পলকা নয়। ভাঙতে সময় লাগল কিছু। ঢুকলেন ওসি-সহ থানার অফিসাররা, দমকলের আধিকারিকরা এবং সাক্ষী হিসাবে চার স্থানীয় বাসিন্দা। যাঁরা জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে।

এমনিতেই গড়িয়াহাট চত্বর রাতভর আলোঝলমল। ফুটপাথ এখানে বদল হয় না মধ্যরাতে। দোকানপাটের অধিকাংশ সাড়ে ন'টা—দশটার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেলেও অন্তত মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা থাকেই টুকটাক পান-সিগারেটের ঠেক। দক্ষিণে গোলপার্ক-ঢাকুরিয়া, উত্তরে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি-পার্ক সার্কাস। পুবে বিজন সেতু-বালিগঞ্জ স্টেশন, পশ্চিমে রাসবিহারী-চেতলা। মানুষজনের যাতায়াত চলতেই থাকে বেশি রাত পর্যন্ত। গাড়িঘোড়ার স্রোতও তলানিতে ঠেকতে ঠেকতে গড়িয়ে যায় মাঝরাত্তির।

এহেন গড়িয়াহাট মোড় থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বের বহুতলের সামনে পুলিশের গাড়ি, দমকলের সাইরেন সাড়ে দশটা নাগাদ। মাত্রাছাড়া নয়, কিন্তু কৌতূহলী ভিড়-জটলা একটা তৈরি হলই। বাড়তি ফোর্স পাঠানো হল লালবাজার কন্ট্রোল রুম থেকে।

ফ্ল্যাটের ভিতরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বিশাল হলঘরে টর্চ ফেলতেই দেখা গেল তিন মহিলাকে, দাঁড়িয়ে আছেন জড়সড়। চোখেমুখে টেনশন আর আতঙ্কের জ্যামিতি। ওসি-র পুলিশি ধমকে আরও কুঁকড়ে গেলেন ওঁরা, 'কী ব্যাপারটা কী? দরজা খুলছিলেন না কেন? রাতদুপুরে কি আমরা গল্পগুজব করতে এসেছি এখানে?'

গড়িয়াহাট থানা, কেস নম্বর ৪৯, তারিখ ৩০/০১/৮৩। ধারা ১২০বি/৩০২/২০১/৩৪ আইপিসি। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, খুন, প্রমাণ লোপাট এবং একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের যৌথ পরিকল্পনা।

সেই তুমুল চাঞ্চল্যকর মামলার বিবরণ। সবে কুড়ির কোঠায় পা দেওয়া এক গৃহবধূর নৃশংস খুন শ্বশুরবাড়িতে। দেবযানী বণিক হত্যা মামলা।

আমাদের কন্ট্রোল রুমে ফোনটা এসেছিল দশটা নাগাদ। আজও অজানা, কে করেছিলেন। বর্তমান সময় হলে বোঝা যেত সহজেই। কন্ট্রোল রুমের সব ফোনেই এখন সিএলআই লাগানো রয়েছে। তখনকার সময়ে

ছিল না। ফোনে পুরুষকণ্ঠ জানিয়েছিল, গড়িয়াহাটের বণিকবাড়িতে লোক পাঠান তাড়াতাড়ি। ওদের বড়বউকে সবাই মিলে খুন করেছে। দেরি করলে বডি সরিয়ে দেবে।

থানা থেকে হেঁটে গেলে খুব বেশি হলে তিন মিনিটের পথ, গাড়িতে তার অর্ধেক। কন্ট্রোল রুম জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই ছুটেছিল পুলিশ।

নামেই ফ্ল্যাট, আয়তনের বিচারে প্রায় ফুটবল মাঠ। ঢুকেই প্রশস্ত করিডর, দৈর্ঘ্যে প্রায় একশো মিটার। প্রস্থেও নেহাত কম নয়। করিডরের দু'ধারে সার দিয়ে অনেকগুলি ঘর। যার অধিকাংশেই লাগোয়া বারান্দা। এক কোণে একটি মন্দিরও রয়েছে কাচ দিয়ে ঘেরা। পাঁচতলা থেকে ছ'তলায় সরাসরি যাওয়ার দরজা রয়েছে। আর ছ'তলা থেকে সাততলায় পৌঁছনোরও। চালু হল ঘরগুলির তল্লাশি। ছ'তলা-সাততলা তালাবন্ধ। পাঁচতলার ফ্ল্যাটের একটি ঘরে তিনটি বাচ্চা ঘুমোচ্ছে অঘোরে। অন্য একটিতে এক বৃদ্ধা মহিলা, তিনিও ঘুমন্ত। একটিতে পঞ্চাশোর্ধ্ব এক মহিলা, দৃশ্যতই অসুস্থ। শুয়ে আছেন চোখ বুজে। আর একটি ঘরে বারো বছরের এক ঘুমন্ত কিশোর। রান্নাঘরে তালাচাবি।

করিডরে থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে থাকা তিন মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'বাইরে থেকে তো আওয়াজ পাচ্ছিলাম পুরুষকণ্ঠের, ওঁরা কোথায় গেলেন?' তিনজনই নিরুত্তর, ঠোঁটে যেন কেউ সাইলেন্সার লাগিয়ে রেখেছে। পরের প্রশ্ন, এ বাড়ির বড়বউয়ের নাম কি দেবযানী বণিক? কোথায় উনি? ডাকুন। মুখে এখনও কুলুপ মহিলাত্রয়ীর। ততক্ষণে দুর্গন্ধ পেতে শুরু করেছেন অফিসাররা। পেশার প্রয়োজনে যে গন্ধ ডাক্তার বা পুলিশের অতি পরিচিত। পচতে থাকা মৃতদেহের।

উত্তর-পূর্ব কোণের ঘরটিতে ঢুকতেই গন্ধ তীব্রতর ঠেকল, নাকে রুমাল উঠে এল সবার। শূন্য ঘর, পরিপাটি বিছানা। লাগোয়া বারান্দা। যেখানে ঢোকার মুখেই বাচ্চাদের একটি বড় লোহার দোলনা আড়াআড়ি ভাবে ফেলা রয়েছে। বেশ ভারী, সরানো হল ধরাধরি করে। বারান্দায় একটি ফোল্ডিং খাট। তার উপর স্তূপাকার

লেপ-কম্বল-তোশক ডাঁই করা। সরানো হল।

খাটের নীচেও প্রচুর জামাকাপড়ের জঙ্গল। একদম ঠাসাঠাসি। যা টেনে বার করা হল একে একে এবং ভিতর থেকে বেরোল এক তরুণীর মৃতদেহ। শাড়ি-ব্লাউজ শরীরে। ফুলে উঠেছে দেহ, শুরু হয়েছে পচন। 'Rigor Mortis' (মৃত্যুর কিছু ঘণ্টা পর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্ত হয়ে যাওয়া) বাসা বেঁধেছে দেহে। নাকমুখ থেকে রক্তের স্রোত বয়ে শুকনো দাগের চেহারা নিয়েছে শাড়িতে। গলায় ফাঁসের দাগ।

হলঘরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা তিন মহিলাকে ডাকা হল। চেনেন এঁকে? সমস্বরে উত্তর, না! ঘুম থেকে তোলা হল বছর বারোর কিশোরকে, চেনো এঁকে? ছেলেটি কেঁদে ফেলল নিমেষে, অস্ফুটে বেরোল একটাই শব্দ— বউদি!

—কী নাম বউদির?

—দেবযানী। দেবযানী বণিক।

খবর পেয়ে গভীর রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন পুলিশকর্তারা। ডিসি হেডকোয়ার্টার, ডিসি ডিডি, ডিসি সাউথ, হোমিসাইড শাখার প্রায় সবাই। তদন্তের চাকা ঘুরতে শুরু করল। তদন্তভার নিলেন হোমিসাইড তৎকালীন শাখার সাব-ইনস্পেকটর সুজিত সান্যাল।

গৃহবধূ-হত্যার খবর জানাজানি হতেই প্রবল প্রতিক্রিয়া শুধু কলকাতায় নয়, রাজ্যজুড়ে। এমন চর্চিত মামলা কমই হয়েছে কলকাতা পুলিশের শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাসে। তখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আনন্দবাজার-যুগান্তরের প্রথম পাতায় আলোচিত হয়েছে দেবযানী-নিধনের রোজনামচা। যা অব্যাহত থেকেছে তীব্র টানাপোড়েনের বিচারপর্বেও। ঘৃণ্য অপরাধের দিকচিহ্ন হিসেবে আজও রয়ে গিয়েছে ওই অভিশপ্ত বহুতল, যাকে স্থানীয় মানুষ চিনতেন 'বণিকবাড়ি' নামে।

গোলপার্ক থেকে গড়িয়াহাটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে, এলাকার ভূগোল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন, এমন কাউকে এখনও পরিচিতজন দেখিয়ে দেন ওই এগারোতলার মাল্টিস্টোরিড, 'এটাই সেই বণিকবাড়ি!'

খবরের কাগজের সংবাদ

ওই তিন মহিলার পরিচয় কী, গ্রেফতার হওয়ার পর কী বললেন, বাড়ির পুরুষরাই বা কীভাবে পালালেন, আর ধরা পড়লেন কোথায় কখন, সে বিবরণে পরে আসছি।

তা ছাড়া, এটি তো 'whodunnit' নয় যে খুনি কে, জানার কৌতূহল থাকবে। সকলেরই মনে থাকবে, স্বামী-শ্বশুর-দেবর-ননদরা যুক্ত ছিলেন খুনে। চন্দ্রনাথ-চন্দন, এই দুটি নাম অনেকের মনেও আছে নিশ্চিত। তবে ঠিক কোন পরিস্থিতিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল ঘরসংসারে আদ্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ এক নেহাতই সহজসরল গৃহবধূকে, কতটা নির্মমতার সাক্ষী ছিল মৃত্যুর আগের ও পরের ঘটনাপ্রবাহ, সে কাহিনিও কম নাটকীয় নয়। বস্তুত, নারীনির্যাতনের এক কলঙ্কময় দলিল। সবিস্তার লিখতে গেলে অণু-উপন্যাসের আকার নেবে, যথাসাধ্য সংক্ষেপে পেশ করলাম দেবযানী-হত্যার ইতিবৃত্ত।

বণিকবাড়ি

শুধু বিত্তবান বললে কম বলা হয়, প্রভূত সম্পদশালী ছিল গড়িয়াহাটের বণিক-পরিবার। ব্যবসা মূলত চা-বাগানের। এ ছাড়াও বহুমুখী ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ক্রমশ ফুলেফেঁপে ওঠা। গড়িয়াহাটের এগারোতলা 'বণিকবাড়ি' তৈরি করেছিলেন চন্দ্রনাথ বণিক।

একতলা থেকে চারতলার ফ্ল্যাটগুলি ভাড়া দিয়েছিলেন বা বিক্রি করেছিলেন। কোনওটা আবাসিকদের, কোনওটা সরকারি—বেসরকারি সংস্থাকে। নিজে থাকতেন সপরিবারে পাঁচতলায়, প্রায় দশ হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে। ছ'তলা এবং সাততলার ফ্ল্যাট নিজের অধিকারে রেখেছিলেন। আট থেকে এগারো, উপরের চারটি তলা ছিল নির্মীয়মান অবস্থায়।

বণিক পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। চন্দ্রনাথ মধ্যপঞ্চাশ পেরিয়ে ষাট-ছুঁইছুঁই। স্ত্রী কিছুকাল হল অসুস্থ। মা বেঁচে আছেন। তিনিও শয্যাশায়ীই বলা চলে, ওষুধবিষুধ-পরিবৃত জীবন। নয় সন্তানের জনক চন্দ্রনাথ। পাঁচ কন্যা, চার পুত্র। বড়মেয়ে কল্যাণী বিবাহিতা, কসবায় শ্বশুরবাড়ি। তার পরের দু'জন, জয়ন্তী আর চিত্রার বিয়ে হয়েছে যথাক্রমে শিলিগুড়ি আর শ্রীরামপুরে। সুমিত্রা এবং বিত্রা অবিবাহিতা এখনও, থাকেন বাবা-মায়ের সঙ্গে। বড়ছেলে চন্দন বণিক, ১৯৭৫—এর অগস্টে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছে বর্ধমানের নতুনগঞ্জ নিবাসী ব্যবসায়ী ধনপতি দত্তের একমাত্র মেয়ে দেবযানীর সঙ্গে। তিন সন্তান চন্দন-দেবযানীর। দুই ছেলে বাবু আর টাবু, মেয়ে মামণি। খুবই ছোট এখনও, শৈশবের চৌকাঠ পেরতে ঢের দেরি। মেজোছেলে আশীষ বিবাহিত, স্ত্রীর নাম রূপা। একটি মেয়ে আছে ওঁদের, সে-ও দুধের শিশুই প্রায়। সেজো অসীম অবিবাহিত। সবচেয়ে ছোট বারো বছরের নন্দন, ক্লাস সেভেন।

বাড়িতে কাজের লোক বলতে জনাপাঁচেক। মাঝবয়সি চৈতন্য, দীর্ঘদিন রান্নাবান্না করেন বণিকবাড়িতে। চারতলার ল্যান্ডিং-এর পাশে একটি ছোট ঘরে থাকেন। যদু নামের যুবক, থাকেন তিনতলায় সিঁড়ির পাশের ঘরে। কাজ বলতে চন্দ্রনাথের সঙ্গে সকালে বাজার যাওয়া, বাসনপত্র ধোওয়া, টুকটাক হাজারো ফাইফরমাশ খাটা। ঊর্মিলা, সকাল-বিকেল ঠিকের কাজ করেন। ঘর মোছা, কাপড় কাচা, রান্নায় সাহায্য ইত্যাদি। পুষ্পা, বয়স কুড়ির এদিক-ওদিক, দেখাশোনা করেন চন্দন-দেবযানীর বাচ্চাদের। আর শান্তি, বারো বছরের কিশোরী। দেখভাল করার দায়িত্ব আশীষ-রূপার একমাত্র মেয়ের।

বর্ধমানের দত্ত পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও প্রয়োজন এখানে। খুবই বর্ধিষ্ণু এঁরা। ধনপতি দত্তের রাইস মিল আছে, আছে পেট্রল পাম্পও। অনেকগুলি বসতবাড়ি আছে বর্ধমানে, জমিজমাও যথেষ্ট। আছে মাছের

ভেড়িও। স্ত্রী সুধারানী বর্তমান। তিন ছেলে, দেবদাস, বিপ্রদাস এবং রামদাস। এক মেয়ে, দেবযানী। সবার ছোট, বাড়ির সকলে চোখে হারায়। দাদারা ডাকে 'বোনু' বলে, মা-বাবার আদরের ডাক 'বুড়ি'।

আগে লিখেছি, তবু মনে করিয়ে দিই, বণিক আর দত্ত পরিবারের পারস্পরিক আলাপ-দেখাশোনার পর দেবযানীর বিয়ে হয়েছিল চন্দনের সঙ্গে। ৭৫-এর অগস্টে। বাল্যবিবাহই বলা চলে, দেবযানী তখন সবে চোদ্দো। চন্দন সবে কুড়ি পেরিয়েছে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে, যৌতুকে কার্পণ্য করেননি ধনপতি। বণিক পরিবারের এ নিয়ে অভিযোগের রাস্তা ছিল না কোনও।

দেবযানী বণিক

বিয়ের প্রথম তিন বছর কোনও সমস্যা ছিল না। সুখী দম্পতির জীবন কাটালেন চন্দন—দেবযানী। 'বড়বউদি'-র সঙ্গে দেবর-ননদদের সম্পর্কে টাল খায়নি কোথাও। 'বড়বউমা'-ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হননি শ্বশুর—শাশুড়ির।

তাল কাটতে শুরু করল '৭৮-এর জুলাইয়ের শেষাশেষি। ধনপতি এসেছেন মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। চন্দ্রনাথ ও তার স্ত্রী প্রস্তাব দিলেন, 'আমাদের সেজো মেয়ে চিত্রার বিয়ে দেব এবার। আপনার বড়ছেলে দেবদাসের সঙ্গেই বিয়েটা হোক, আমাদের একান্ত ইচ্ছে।' ধনপতি সবিনয়ে জানালেন, 'এই প্রস্তাব আর কিছু দিন আগে দিলে সম্মত হওয়া যেত। কিন্তু এখন তো আর সম্ভব নয়। আপনারা তো জানেন দেবদাসের বিয়ের পাকা কথা হয়ে গিয়েছে গত মাসে আসানসোলের হরিসাধন ঘাঁটির কন্যা কুমকুমের সঙ্গে। অগস্টে বিয়ে। কথার খেলাপ এখন আর করা চলে না।' বণিক দম্পতি শুনলেন, গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং আর বাক্যব্যয় না করে ভিতরে চলে গেলেন। ধনপতি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, মেয়ের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে ফিরে এলেন বর্ধমানে।

টানাপোড়েনের পরের ধাপও দেবদাসের বিয়ের সূত্রেই। ধনপতি সপরিবারে এসেছেন ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। ততদিনে দুই পরিবারেরই একে অন্যের আত্মীয়পরিজনের ব্যাপারে সম্যক ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে। হঠাৎই, কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই চন্দ্রনাথ বললেন 'আচ্ছা, ড. মৃণালকান্তি বিষ্ণু আপনাদের আত্মীয় না?' ধনপতি বললেন, 'হ্যাঁ, আমার ভাইয়ের স্ত্রীর একটিই বোন আছে। ড. বিষ্ণু তাঁর স্বামী। খুবই ঘনিষ্ঠ আমাদের।' চন্দ্রনাথ শর্ত দিলেন, ড. বিষ্ণুকে বিয়েতে ডাকলে বণিকরা যাবেন না বিয়েতে। ধনপতি জানতে চাইলেন, কেন? জানা গেল, দেবযানীর সঙ্গে বিয়ের আগে, চন্দনের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল ড. বিষ্ণুর ভাগনির সঙ্গে। যেদিন মেয়েকে দেখতে আসার কথা, নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ছ'-সাত ঘণ্টা পর চন্দ্রনাথ গিয়ে জানিয়ে দেন, এ সম্বন্ধ এগোতে আর ইচ্ছুক নন। মেয়েকে না দেখেই। ড. বিষ্ণু বলেন, বিয়ে দেওয়া না-দেওয়া চন্দ্রনাথের ইচ্ছে। কিন্তু এই হেনস্থাটা না করলেই পারতেন। তর্কবিতর্ক-বাদানুবাদ হয়। সেই থেকেই ড. বিষ্ণুর উপর রাগ। ধনপতি শুনলেন সব, কিছু বললেন না।

বিয়ের দিন চন্দ্রনাথ সপরিবারে গিয়ে দেখলেন, ড. বিষ্ণুও আমন্ত্রিত। রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ধনপতিকে বললেন, ইচ্ছে করে অপমান করলেন বাড়িতে ডেকে। আর কখনও আপনার মেয়ে বাপের বাড়ি আসবে না। ধনপতি বোঝানোর চেষ্টা করলেন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে না ডাকলে খুবই খারাপ দেখাত। চন্দ্রনাথ কর্ণপাত করলেন না। চলে এলেন বিয়েবাড়ি থেকে।

সংঘাতের তৃতীয় পর্ব বর্ধমানে একটি পুকুর কেনা নিয়ে। ধনপতি পুকুরটি কিনেছিলেন বড় অঙ্কের টাকায়। জানতে পেরে হঠাৎই চন্দ্রনাথ জানান, ওই পুকুরটির জন্য তিনিও বায়না করেছিলেন। তাঁকে দিয়ে দিতে হবে ওই জলাশয়। ধনপতি বললেন, বেশ তো, বায়নানামা দেখান। চন্দ্রনাথ দেখাতে পারলেন না, হালকা বাদানুবাদ হল। দুই পরিবারের মনকষাকষি বাড়ল। যার প্রভাব উত্তরোত্তর পড়তে লাগল দেবযানীর উপর।

দ্রুত পালটে যেতে থাকল শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদদের ব্যবহার। স্বামী চন্দনেরও। শুরু হল কথায়

কথায় কটাক্ষ, দুর্ব্যবহার। মাঝেমাঝেই স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে শুরু করলেন চন্দন। দেবযানী বাপের বাড়ি যেতেন প্রতি দু'মাস অন্তর, সেটা কমে দাঁড়াল ন'মাসে- ছ'মাসে একবার। তা-ও বহু কাকুতি-মিনতির পর। মা-বাবাকে চিঠি লেখা বন্ধ হয়ে গেল বণিকবাড়ির বড়বউয়ের। দেবযানী সহ্য করছিলেন, যেমন করে থাকেন আর পাঁচজন নেহাতই সাদাসিধে, অল্পশিক্ষিতা এবং আর্থিকভাবে স্বামীনির্ভর গৃহবধূ।

পরিস্থিতি জটিলতর হল '৮২ -র মাঝামাঝি থেকে। বর্ধমানে একটি বিশাল কোল্ড স্টোরেজ কিনলেন চন্দ্রনাথ, ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক কোটি টাকা ধার করে। অন্যান্য ব্যবসায় তখন তুলনামূলক মন্দা চলছে বণিকদের। কোল্ড স্টোরেজটি ঠিকমতো চালু হতেও সময় লাগছিল কিছু। জমছিল না তেমন। এদিকে ব্যাঙ্ক থেকে নিয়মিত তাগাদা আসতে শুরু করল ধারের কিস্তি শোধের, বণিকবাড়িতে পৌঁছল 'ডিমান্ড নোটিস'। চন্দ্রনাথ চাপ দিতে শুরু করলেন ধনপতির উপর, বকেয়া ধারের ২৫ শতাংশ বহন করতে। ওই পঁচিশ শতাংশ মানে সেই তখনকার দিনেও প্রায় পৌনে এক কোটি। ধনপতি জানালেন, তিনি অপারগ। খুব বেশি হলে দশ লাখ। কোটি খানেক মতো দিয়ে ওঠা তাঁর সাধ্যাতীত। উত্তরে চন্দ্রনাথ ফের মুখ খারাপ করলেন যথেচ্ছ। দুই পরিবারের সম্পর্কের কফিনে শেষ পেরেকটি প্রায় পোঁতাই হয়ে গেল।

দেবযানীর জীবন ক্রমে আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠল। বাড়ল চন্দনের মারধরের মাত্রা। শাশুড়ি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তখন। স্বামী-শ্বশুর-দেবর-ননদরা 'অলক্ষ্মী' বলে প্রকাশ্যেই ডাকা শুরু করলেন বাড়ির বড়বউকে। ঘুম থেকে উঠলেই রোজ শুনতে হত, এই অলক্ষ্মীটার মুখ দেখতে হল আবার, সারা দিনটা খারাপ যাবে। এর জন্যই কোল্ড স্টোরেজ চালু হল না। বিস্তর কটাক্ষ, গালিগালাজ। বাড়ির পুরনো রাঁধুনি চৈতন্য খুব স্নেহ করতেন দেবযানীকে। তাঁর হাত দিয়ে গোপনে পাঠানো কয়েকটি চিঠিতে ধরা আছে দেবযানীর নিত্যদিনের যন্ত্রণার কাহিনি।

একটি চিঠির অংশবিশেষ—

শ্রীচরণকমলেষু মা, আমি পাঁচ বছর ধরে সহ্য করছি এদের অত্যাচার। আর পারছি না। আমি এখানে থাকব না আর। তুমি বাবাকে বলো আমাকে নিয়ে যেতে। ওখানে একমাস থাকলে মনটা ভাল হবে। এই চিঠি খুব সাবধানে লিখছি। চৈতন্যদা নিয়ে যাবে। বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বললেও এরা পাশে দাঁড়িয়ে শোনে সব। আমার খুব কান্না পায়। তোমার জামাইও ভাল লোক নয়। খারাপ কথা বলে সব সময়, গায়ে হাত তোলে সবার সামনেই। এভাবে থাকা যায় না। বাবাকে আবার বলো, আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

প্রণাম নিয়ো।
তোমাদের বুড়ি।

দেবযানীর সঙ্গে যখন দেখা করতে আসতেন ধনপতি, বসার ঘরে অপেক্ষা করতে হত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মিনিটখানেকের দেখা হত পিতা-পুত্রীর, সাক্ষাতের এবং কথোপকথনের সাক্ষী থাকতেন ননদরা।

লিখতে লিখতে রবীন্দ্রনাথের 'দেনা পাওনা' মনে পড়ে অবধারিত— "রামসুন্দর যখন বেহাইবাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাৎলাভ করিতেন তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইতো।"

বাহ্যিক বিচারে দেবযানীর সঙ্গে 'দেনা পাওনা'-র নিরুপমার মিলের থেকে অমিলই বেশি। নিরুপমার জন্ম অর্থবান পরিবারে নয়। বাবা প্রাণপাত করেছিলেন বকেয়া তিন হাজার জোগাড়ে। নিরুপমার ক্ষয়িষ্ণু মৃত্যু এসেছিল নিজের প্রতি অযত্নে, নিয়ত মানসিক আঘাতে দীর্ণ হতে হতে। দেবযানী বিত্তশালী পরিবারের। খুন হয়েছিলেন। ধনবান পিতাও পারেননি কন্যার শ্বশুরবাড়ির চাহিদা পূরণ করতে।

আপাতভিন্ন প্রেক্ষিত। তবু সার্বিক বিচারে মনে হয়, একটি জায়গায় অক্লেশে মিলেমিশে যান ছাপোষা রামসুন্দর এবং সম্পন্ন ধনপতি। পিতৃহৃদয়ের স্নেহের দোলাচলে। একমাত্র কন্যার মানসিক বা শারীরিক যন্ত্রণালাঘবের ব্যর্থ অসহায়তায়। আর্থিক সামর্থ্য যেখানে তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

গল্পের নিরুপমার মৃত্যুর পর "এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়"-এর উপায় ছিল রায়বাহাদুরের। বাস্তবের দেবযানীকে হত্যার পর চন্দ্রনাথদের সে-রাস্তা ছিল না। ঘানি টানতে হয়েছিল জেলের। সান্ত্বনা এটুকুই।

ঘটনায় ফিরি। বিরাশির দুর্গাপুজো শুরু হওয়ার দিন কুড়ি আগের কথা। মেজোছেলে বিপ্রদাসের বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে শিয়ালদার এক আত্মীয়ার বাড়িতে এসে উঠেছেন দত্ত-পরিবারের অনেকে। ধনপতি ব্যবসার কাজে রয়েছেন বর্ধমানেই। বিকেলের দিকে রাইস মিলের ল্যান্ড লাইনে ফোন পেলেন দেবযানীর, 'বাবা, তোমার জামাই আজ প্রচণ্ড মেরেছে আমায়।' বলেই কান্না অনর্গল।

ধনপতি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন শিয়ালদায় আত্মীয়ার বাড়ি। স্ত্রীকে বললেন, এক্ষুনি যাও বুড়ির বাড়ি। ছুটলেন দত্ত পরিবারের সদস্যরা। বণিকবাড়ির বসার ঘরে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষার পর দেবযানী এলেন। সঙ্গে ননদরা। একান্তে কথা প্রায় বলতেই দেওয়া হল না বাড়ির লোকের সঙ্গে। সুধারানী লক্ষ করলেন মেয়ের ডানহাতের কনুই ফুলে গিয়েছে। কালশিটের দাগ স্পষ্ট। অনুরোধ করলেন চন্দ্রনাথকে, বুড়িকে কয়েক দিনের জন্য বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

প্রথমে প্রত্যাখ্যাত হল আর্জি, শেষে বহু অনুনয়-বিনয়ের পর চন্দ্রনাথ বললেন, 'কয়েকদিন পর ব্যবসার কাজে ত্রিপুরা যাবে চন্দন। তখন নিয়ে যাবেন।'

দেবযানীকে কয়েকদিন পর বর্ধমানে নিয়ে গেলেন ভাই রামদাস। মা-বাবাকে মেয়ে জানাল অত্যাচারিত হওয়ার বিস্তারিত কাহিনি। তখনকার দিনে তো বটেই, আজকের দিনেও এদেশের অধিকাংশ মা-বাবারা যা করে থাকেন এই পরিস্থিতিতে, তা-ই করলেন ধনপতি-সুধারানী। বোঝালেন, আমরা কথা বলব চন্দনের সঙ্গে। সব ঠিক হয়ে যাবে, তুই একটু মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কর বুড়ি।

দেবযানী মা-বাবাকে জানালেন, চন্দ্রনাথ-চন্দন বলেই দিয়েছেন আসার আগে, ধনপতি ওই বকেয়া ধারের ২৫ শতাংশ না দিলে আর কোনও দিন বর্ধমানে আসতেই দেবেন না। ধনপতি বোঝালেন, একসঙ্গে অত টাকা দেওয়া অসম্ভব। দশ লাখ দেবেন বলেছেন তো। পরে আরও চেষ্টা করবেন।

চন্দন এলেন বর্ধমানে দেবযানীকে নিয়ে যেতে। ধনপতি—সুধারানী আপ্রাণ বোঝালেন চন্দনকে, মেয়েকে অত্যাচার না করতে এভাবে। চন্দন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন অভিযোগ শুনে। গালিগালাজ করলেন দেবযানীকে, বললেন আর কখনও বর্ধমানে আসতে দেবেন না। ধনপতি-সুধারানী ভাবলেন, রাগের কথা। সত্যিই যে এটাই এ-বাড়িতে তাঁদের আদরের 'বুড়ি'র শেষ আসা হতে যাচ্ছে, ভাবেননি দুঃস্বপ্নেও। বেরনোর আগে যখন প্রণাম করছেন দেবযানী, মাথায় আশীর্বাদের হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ধনপতি, তখনও দূরতম কল্পনাতেও ভাবেননি, মেয়ের সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাৎ হবে মাসকয়েক পরে, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে।

মহালয়ার দিনকয়েক আগে দত্তবাড়ি থেকে পুজোর জামাকাপড় নিয়ে বণিকবাড়ি এলেন দেবদাস। যা তাচ্ছিল্যে ফিরিয়ে দিলেন চন্দ্রনাথ। ফিরে এলেন অপমানিত দেবদাস। ধনপতি বুঝলেন, পুজোটা ভাল কাটবে না বুড়ির।

কাটলও না। অত্যাচার আরও বাড়ল, দেবযানী সম্পূর্ণ একঘরে হয়ে পড়লেন শ্বশুরবাড়িতে। মাঝ-ডিসেম্বরে কোল্ড স্টোরেজের ব্যবসার কিছু কাগজপত্র বর্ধমানের কোর্টে জমা দিতে গিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ-চন্দন। আদালতেই দেখা ধনপতিবাবুর বিশ্বস্ত কর্মচারী হৃষিকেশ ঘোষের সঙ্গে। হৃষিকেশকে ডাকলেন চন্দন। নিয়ে গেলেন গাড়ির কাছে, যার মধ্যে বসে আছেন চন্দ্রনাথ। বাকিটা পড়ুন হৃষিকেশের বয়ানে: 'চন্দ্রনাথবাবু বললেন, তোমার বাবুকে বলবে, আমি প্রতিশোধ নেব। এমন শোধ নেব যে সারা জীবন জ্বলবে। আমি বললাম, আমাকে বলছেন কেন? যা বলার, বাবুকে সরাসরি বলবেন।'

প্রতিশোধ নেওয়াও হল জানুয়ারির শেষাশেষি। ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮৩। বণিকবাড়িতে সেদিন আয়োজন হয়েছে সত্যনারায়ণ পুজোর। বাড়িতে প্রচুর আত্মীয়স্বজন। মেজোছেলে আশীষ দিন কয়েক হল সস্ত্রীক

শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে। এ ছাড়া সবাই উপস্থিত। দেবযানীর দেবর-ননদ, তাঁদের ছেলেপুলে, সব। কাজের লোকের মধ্যে সকালে উপস্থিত যদু, ঊর্মিলা আর শান্তি। চৈতন্য বাড়ি গিয়েছে দিনতিনেক আগে, পুষ্পাও কয়েক দিনের ছুটিতে সুন্দরবনের বাড়িতে।

সকাল ৮-০৫। চন্দনের সঙ্গে হলঘরে কথা-কাটাকাটি হল দেবযানীর। সবার সামনেই চন্দন হিড়হিড় করে টানতে টানতে দেবযানীকে নিয়ে গেলেন বেডরুমে। বেধড়ক মারলেন। কান্না আর আর্তনাদ ছিটকে এল বাইরে। শুনলেন বাড়ির বাকিরা। কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না কেউ, কানে তালা দিয়ে পুজোর সিন্নি নিয়ে আলোচনায় ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সকাল ৮-৩০। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে একরকম জোর করেই হলঘরে বেরিয়ে এলেন দেবযানী। ফোন করলেন বর্ধমানের বাড়িতে। তুললেন দেবদাস, বড়ভাই। সেদিন দত্তবাড়ির পুরুষরা সকাল থেকে খুবই ব্যস্ত একটি জমিজমাসংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে; একটু পরেই কোর্ট-কাছারিতে ছোটাছুটি আছে। দূরভাষে দেবযানী বললেন, 'এরা আমাকে মেরে ফেলবে! দাদা, তোরা আজই এসে আমাকে নিয়ে যা।'

দেবদাসের মুখচোখ দেখে ফোন নিলেন ধনপতি। ততক্ষণে দেবযানীর থেকে ফোন কেড়ে নিয়েছেন চন্দ্রনাথ, গালিগালাজ করছেন অকথ্য। ফোন বাবার থেকে আবার নিলেন দেবদাস, বললেন, 'বোনুকে কিছু করবেন না। আমরা বিকেলের মধ্যে রওনা দিচ্ছি। নিয়ে আসব ওকে। কাকাবাবু, দোহাই আপনার, মারবেন না আর।' কোনও উত্তর না দিয়ে সপাটে ফোন রেখে দিলেন চন্দ্রনাথ। ঠিক হল, দ্রুত কাজ সেরে সন্ধের আগেই কলকাতায় যাবেন ধনপতি আর দেবদাস। দেবযানীকে নিয়ে আসবেন বাড়িতে। কে জানত, তখনই না বেরিয়ে পড়ে বিকেলে যাওয়ার সিদ্ধান্তের পরিণতি কী ভীষণ মর্মান্তিক হতে যাচ্ছে!

পুজো শেষ হল। সবাই প্রসাদ খেলেন পাত পেড়ে। দেবযানী অভুক্ত থাকলেন, খেতে দেওয়া হল না। পুজোর জায়গার কাছাকাছি আসতেই দেওয়া হল না 'অলক্ষ্মী' অপবাদে। অতিথিরা চলে গেলেন দুপুর দুপুর। কল্যাণী আর চিত্রা, বণিকদের বড় আর সেজো মেয়ে, ফিরে গেলেন।

দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল, বণিকবাড়িতে উপস্থিত চন্দ্রনাথ, ছেলেদের মধ্যে চন্দন-অসীম-নন্দন। মেয়েদের মধ্যে জয়ন্তী, সুমিত্রা আর বিত্রা। দেবযানী নিজের ঘরে। চন্দ্রনাথের স্ত্রী আর মা নিজেদের ঘরে বিশ্রামে। বাচ্চারা আছে নিজেদের ঘরে, নিজেদের মতো। কাজের লোকদের মধ্যে রয়েছে যদু আর শান্তি। ঊর্মিলা দুপুরের কাজ সেরে নীচে গিয়েছেন। আবার আসার কথা সন্ধেবেলায়।

বিকেল ৪-০৫। দেবযানীর ঘরে ঢুকলেন চন্দ্রনাথ-চন্দন। কিছু পরেই দেবযানীর পরিত্রাহি চিৎকার ভেসে এল ঘর থেকে। যদু এবং শান্তি, দু'জনেরই খুব প্রিয় ছিল বড়বউদি। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ছুটল দেবযানীর ঘরের দিকে। হলঘরে আটকে দিলেন সুমিত্রা, 'তোদের কী দরকার এখানে? যা, কাজে যা!'

দেবযানীর আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে এল একটু পরে। সাড়ে চারটে নাগাদ রান্নাঘর থেকে উঁকি দিয়ে যদু দেখল, ওই ঘরে ঢুকছেন অসীম-জয়ন্তী-সুমিত্রা-বিত্রা। কৌতূহল সামলাতে না পেরে ফের যদু আর শান্তি চলে এল ঘরের কাছাকাছি। আবার ধমক সুমিত্রার, 'তোদের বললাম না নিজের কাজ করতে! যা এখান থেকে।' যদু আর শান্তি ফিরল রান্নাঘরে। তার আগে অবশ্য দেখা হয়ে গিয়েছে, বড়বউদি ঝুলছে ঘরের সিলিং ফ্যানে। গলায় ফাঁস শাড়ির।

তখন পৌনে পাঁচটা। ধনপতি-দেবদাস কলকাতা রওনা হওয়ার তোড়জোড় করছেন। ফোন বাজল নতুনগঞ্জের বাড়িতে। দেবদাস তুললেন। অন্যপ্রান্তে চন্দ্রনাথ, সকালের রুদ্রমূর্তি বদলে গিয়ে অস্বাভাবিক অমায়িক এখন।

—তোমরা কি রওনা হয়ে গিয়েছ?

—না কাকাবাবু, এই বেরব।

—শোনো, তোমরা আজ এসো না। আমি কাল বর্ধমান যাচ্ছি কাজে। তোমাদের দুর্গাপুরের পেট্রল পাম্পে দেখা করে নেব।

—বোনুকে একবার দেবেন, একটু কথা বলতাম।

—বউমা তো বেরিয়ে গেল একটু আগে চন্দনের সঙ্গে, সিনেমা দেখতে। তোমরা চিন্তা কোরো না, ও ভাল আছে।

ফোন রেখে দেওয়ার পরও খচখচানি একটা থেকেই গেল ধনপতি আর দেবদাসের। ব্যবহারে হঠাৎ এমন ভোলবদল? তারপর ভাবলেন, হতে পারে সকালের মারধরের পর অনুতাপ হয়েছে ওঁদের। মিটমাট হয়েছে সাময়িক। তা ছাড়া কাল তো চন্দ্রনাথ আসছেনই, মুখোমুখি কথা বলে নেওয়া যাবে। অনেক হয়েছে, ঘরের মেয়েকে ফিরিয়ে আনবেন ঘরে।

সন্ধে নেমেছে। বণিকবাড়িতে তখন প্রমাণ লোপাটের ব্যস্ততা। কিন্তু মাথা কাজ করছে না কারও। শান্তি তো রোজ রাত্রে এ বাড়িতে থাকেই, যদুও কখনও কখনও থেকে যায়। শুয়ে পড়ে রান্নাঘরে। দু'জনকেই বলা হল রাত্রে বাইরে শুতে। শান্তি গেল ঊর্মিলার ঘরে, যদু তিনতলায় সিঁড়ির পাশে নিজের রোজকার আস্তানায়। জয়ন্তী ভয় দেখালেন যাওয়ার আগে, 'কাউকে কিছু বললে কাজ ছাড়িয়ে দেব চুরির বদনাম দিয়ে। না খেতে পেয়ে মরবি।' ঊর্মিলা সন্ধেবেলা কাজে এসে দেখলেন, কোলাপসিবল গেট বন্ধ। বেল বাজালেন। ভিতর থেকে চন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসে বললেন, 'কাল আসবি। আজ আর দরকার নেই।'

কিল-চড়-লাথি-ঘুসি তো ছিলই যেমন খুশি, লাঠি দিয়েও সজোরে দেবযানীর মাথায় মেরেছিলেন চন্দন। সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন দেবযানী। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে মৃত্যু তৎক্ষণাৎ। খুনকে আত্মহত্যার চেহারা দিতে এর পর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল সিলিং ফ্যানে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল দেবযানীর ঘর। বাচ্চাদের বলা হয়েছিল, মায়ের শরীর খারাপ, ঘুমোচ্ছে। তোমরা অন্য ঘরে থাকো। কতই বা বড় ওরা তখন, বাবার কথা মেনে নিয়েছিল নিষ্পাপ বিশ্বাসে।

রাত গভীর হলে চন্দ্রনাথরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, আত্মহত্যার গল্পটা না-ও দাঁড়াতে পারে। আপাতত দেহ লুকিয়ে ফেলা যাক। ঘরের লাগোয়া বারান্দায় ফোল্ডিং খাটের ভেতর দেবযানীর দেহ পুরে দেওয়া হল। কীভাবে, শুরুতে লিখেছি বিস্তারিত।

পরদিন সকাল। ২৯/১/৮৩। একটি সুটকেস নিয়ে দশটা নাগাদ চন্দ্রনাথ-চন্দন বেরলেন। গোলপার্কের ইন্ডিয়ান ওভারসিজ় ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা তুললেন। এবং সোজা পৌঁছলেন পারিবারিক চিকিৎসক অজিতকুমার ব্যানার্জির চেম্বারে। বললেন, 'এক মহিলা গৃহকর্মী মারা গিয়েছেন। একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিতে হবে।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'মৃতদেহ না দেখে সেটা কী করে সম্ভব?' চন্দ্রনাথ সুটকেস খুললেন, যাতে সদ্য ব্যাংক থেকে তোলা এক লাখ। বললেন, 'কত লাগবে আপনার?'

টাকার গরমের এই এক মুশকিল, সব কিছুই ক্রয়যোগ্য ভাবায় কখনও কখনও। ডাক্তারবাবু শুনে হাসলেন। সুটকেস বন্ধ করে দিয়ে বললেন, যতই দিন, এ জিনিস আমার দ্বারা হবে না। আসুন আপনারা।

বেরনোর আগে শেষ প্রশ্ন করলেন চন্দ্রনাথ, 'ময়নাতদন্তে কি বোঝা যায়, খুন, না আত্মহত্যা?' ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, 'সে তো যায়ই। খুব সহজ। কিন্তু এ প্রশ্ন করছেন হঠাৎ?' চন্দ্রনাথ-চন্দন আর দাঁড়ালেন না, ফিরলেন বাড়ির পথে। কন্ট্রোল রুমে সে রাতের ফোনটা কি ডাক্তারবাবুই করেছিলেন? কে জানে!

এদিকে নিয়মমতো ২৯ তারিখ সকালে কাজে এলেন ঊর্মিলা আর যদু। শান্তিও এল, পুষ্পাও ফিরে এসেছে বাড়ি থেকে। ভয় দেখিয়ে কি আর মুখ বন্ধ করা যায় সব সময়? যদু আর শান্তি খুলে বলল ঊর্মিলাকে, আগের দিন বিকেলে যা যা ঘটেছিল, যা যা দেখেছিল, সব। ঊর্মিলা সাহস করে জানতে চাইলেন চন্দনের কাছে, বড়বউদিকে দেখছি না। কোথায়? উত্তর এল, বাপের বাড়ি গিয়েছে গত রাতে। ভাইরা এসে নিয়ে গিয়েছে। বাচ্চারা দেখল, মায়ের ঘর এখনও বন্ধ। চন্দন বোঝালেন, মা বর্ধমান গিয়েছে, কয়েকদিন পরই ফিরবে।

রাত বাড়ল। প্রায় দশটা। ঊর্মিলা কাজ সেরে ফিরে গিয়েছেন। যদুও বেরনোর তোড়জোড় করছে। পুষ্পা আর শান্তি রয়েছে। বেল বাজল ফ্ল্যাটের, থানা থেকে আসছি, দরজা খুলুন প্লিজ়। আলো নিভিয়ে দেওয়া হল।

পাঁচতলা থেকে ছ'তলায় ওঠার দরজা দিয়ে উপরে উঠে গেলেন চন্দ্রনাথ-চন্দন-অসীম। সাফাইকর্মীদের ব্যবহারের জন্য ছিল ঘোরানো সিঁড়ি। নেমে গেলেন নীচে, পালালেন নিঃশব্দে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দিকের গেট দিয়ে। যদু-শান্তি-পুষ্পাকে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে দিলেন সুমিত্রারা। শাসালেন, 'কিচ্ছু বলবি না পুলিশকে। মারলেও মুখ খুলবি না কেউ।'

পুলিশ ঢুকল দরজা ভেঙে। যা হল এর পর, লিখেছি। কথায় বলে, পাপ বাপকেও ছাড়ে না। সেখানে কে চন্দ্রনাথ, কে-ই বা চন্দন-অসীম? আর কে-ই বা সুমিত্রা-জয়ন্তী-বিত্রা?

চন্দ্রনাথরা পালালেন কোথায়? প্রথমে মহাত্মা গাঁধী রোডের 'Hoteliers Associates'-এ আগরতলার রমেশ দত্ত পরিচয়ে ঘর নিলেন চন্দ্রনাথ। হোটেলের রেজিস্টারে ছেলেদের নাম লিখলেন সুশীল দত্ত আর অশোক দত্ত। একদিন পরে সেখান থেকে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের শিয়ালদা লজ। এবার গৌর সাহা নামে রেজিস্টারের ফর্ম ভরতি করলেন চন্দ্রনাথ।

দেবযানী বণিক-এর শ্বশুর চন্দ্রনাথ বণিক

হইচই পড়ে গিয়েছে শহরে ততক্ষণে দেবযানী-হত্যা নিয়ে। পুলিশ সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে পলাতকদের ধরতে। চন্দ্রনাথ-চন্দন-অসীমদের ছবি নিয়ে শহর চষে ফেলছে একাধিক সোর্স। চন্দ্রনাথরা বুঝলেন, বেশিদিন এভাবে পালিয়ে থাকা অসম্ভব। হোটেল থেকে ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখ দুই ছেলেকে নিয়ে বেরলেন হাজরার উদ্দেশে, পরিচিত উকিলের বাড়ি। পুলিশ খবর পেল সোর্স মারফত, রাসবিহারী মোড়ের কাছে ৪ ফেব্রুয়ারির দুপুরে আটকানো হল একটি ট্যাক্সি। ভিতরে চন্দ্রনাথ-চন্দন-অসীম। সোজা নিয়ে যাওয়া হল বণিকবাড়ি। যে লাঠি দিয়ে মারা হয়েছিল দেবযানীর মাথায়, উদ্ধার হল ছ'তলার অফিসঘর থেকে। ফাঁস দিতে ব্যবহৃত শাড়ি বেরোল সাততলা থেকে।

পুলিশের কাজই তো অপরাধ-দমন, কিনারা করা ঘটে যাওয়া অপরাধের। তারপর চার্জশিট, বিচারপর্বে সাক্ষ্যদান এবং আরও 'তারিখ পে তারিখ।' এবং অনন্ত অপেক্ষা আদালতের আদেশের। রায় পক্ষে গেলে অভিযুক্তের আবেদন উচ্চ থেকে উচ্চতর আদালতে, পুলিশি তদন্তের কাটাছেঁড়া নিয়মমাফিক। এটা করেননি কেন, ওঁর জবানবন্দি নেওয়া হয়নি কেন, সিজ়ার লিস্টে অমুকের নাম নেই কেন, তমুক তখন কোথায় ছিলেন, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সামনে পড়তে হয় কেস ডায়েরিকে। সামান্যতম খুঁত পেলেই তিরস্কার বরাদ্দ।

সংগতই, তদন্ত তো নিশ্ছিদ্রই হওয়া উচিত। ভুলত্রুটি তো নিষিদ্ধই, মামলা যখন খুনের মতো গুরুতর অপরাধের, প্রশ্ন যখন ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাবাসের। মাননীয় আদালত অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পরই রায় দেন। যা মেনে নিতে হয় নতমস্তকে।

কিছু মামলা আসে কদাচিৎ, যখন স্রেফ রোজকার পেশাগত দায়বদ্ধতার সীমানার বাইরেও তৈরি হয় দোষীকে শাস্তিদানের বাড়তি মানবিক তাগিদ। দেবযানী মামলাও ছিল এমনই ব্যতিক্রমী। মিডিয়ার ঢক্কানিনাদের জন্য শুধু নয়। ঊর্ধ্বতনের চাপে শুধু নয়। এক নির্দোষ গৃহবধূর নির্মম হত্যাকাণ্ডে যাতে সাজা হয় দোষীদের, নিশ্চিত করতে পেশাগত প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠে দলগতভাবে ঝাঁপিয়েছিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতর। তদন্তকারী অফিসার সুজিত সান্যালের সুযোগ্য নেতৃত্বে। কোনও কোনও বিরল মামলায় অভিযুক্তের অপরাধ সম্পর্কে যখন নিশ্চিত হই আমরা সাক্ষ্যপ্রমাণ-তথ্যতালাশের পর, তখন মনে হয় আমাদের, যা হওয়ার হোক। শেষ পর্যন্ত যাব। শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলে। চলতেই থাকে।

দুরন্ত লড়েছিলেন তদন্তকারী অফিসার সুজিত সান্যাল। সুজিতের বৈশিষ্ট্য ছিল, এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যেতেন ঘটনার সঙ্গে, নাওয়াখাওয়াও ত্যাগ করতেন কখনও কখনও। তদন্ত শুধু পেশা ছিল না, নেশাও। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে তাঁর অধীনে যাঁরা কাজ করেছেন কোনও না কোনও সময়, তাঁরা আজও শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ান সুজিতবাবুর প্রসঙ্গ উঠলে। গোয়েন্দা বিভাগের বিভিন্ন পদে সুনামের সঙ্গে কাজ করার পর অবসর নিয়েছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হিসেবে।

বিচার শুরু হল। বিত্রার বিচার শুধু জুভেনাইল কোর্টে, যেহেতু তখনও নাবালিকা। বণিক পরিবার জলের মতো টাকা খরচ করলেন উকিলদের পিছনে। দাবি করা হল, চন্দ্রনাথ-চন্দন-অসীম ঘটনার সময় ছিলেনই না বাড়িতে। ধৃত মহিলারাও নির্দোষ, আর কীসের খুন? দেবযানী তো আত্মহত্যা করেছেন। দীর্ঘ সওয়াল-জবাবে ধোপে টেকার কথা ছিল না এই মিথ্যাচারের। টেকেওনি। যদু-শান্তির সাক্ষ্য তো ছিলই। যে লাঠি দিয়ে মারা হয়েছিল দেবযানীর মাথায়, তাতে হাতের ছাপ ছিল চন্দনের। যে হোটেল দুটিতে ঘটনার পর ঠাঁই নিয়েছিলেন চন্দ্রনাথরা, তার রেজিস্টারের লেখার সঙ্গে চন্দ্রনাথের হাতের লেখা মিলে গিয়েছিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। সর্বোপরি দেবযানীর লেখা চিঠিগুলি তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করেছিল ধারাবাহিক নির্যাতন।

আদালতে চত্বরে চন্দ্রনাথ বণিক

আর আত্মহত্যার তত্ত্ব? খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিল মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের প্রধান ড. রবীন বসুর ময়নাতদন্তের রিপোর্টে। দেহে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন ছিল, প্রতিটির খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিল সেই রিপোর্ট। পরিষ্কার বলা হয়েছিল, মাথার আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল, চিড় ধরে গিয়েছিল দেবযানীর খুলিতে। এলোপাথাড়ি যত্রতত্র আঘাতের তীব্রতাতেই মৃত্যু, "fissured fracture on the vault of her scull and several other injuries, all ante-mortem and homicidal in nature." আর গলায় ফাঁসের দাগ, পুলিশি পরিভাষায় 'ligature mark'? রিপোর্টে স্পষ্ট লেখা ছিল, "post-mortem hanging"। অর্থাৎ, মৃত্যুর পর দেহ ঝোলানো হয়েছিল।

'৮৫-র এপ্রিলে রায় দিলেন আলিপুর কোর্ট। জয়ন্তী, সুমিত্রা আর অসীমের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। চন্দ্রনাথ-চন্দনের ফাঁসির আদেশ। জজসাহেব লিখলেন, "But the part played by accused Chandranath irrespective of his age and that of accused Chandan deserve the severest punishment enjoined by the law and no leniency need be shown to them having regard to the facts and circumstances of the case."

হাইকোর্টে গেলেন বণিকরা। রায় আংশিক বদলাল। চন্দ্রনাথ-চন্দনের ফাঁসির আদেশ বহাল থাকল। সুমিত্রার যাবজ্জীবনেরও। অসীম আর জয়ন্তীর শাস্তি কমে দাঁড়াল দু'বছরের সশ্রম কারাবাসে।

বল যথারীতি গড়াল সুপ্রিম কোর্টে। যেখানে চন্দ্রনাথ-চন্দনের ফাঁসির আদেশ রদ করে রায় দেওয়া হল যাবজ্জীবন কারাবাসের। ১৪ বছর পর মুক্তি পেলেন চন্দ্রনাথ-চন্দন-সুমিত্রা। চন্দ্রনাথ গত হয়েছেন। বাকিরা বর্তমান। জুভেনাইল কোর্টে বিচারপর্বে দোষী সাব্যস্ত বিত্রাও। সুপ্রিম কোর্টের আদেশে মামলা থেকে মুক্তি পান ঘটনার বছরতিনেক পর।

পড়লেন তো। কী-ই বা বলার আর? বাংলা শব্দকোষকে বড় নিঃস্ব দেখায় বিশেষণ খুঁজতে বসলে। করুণ? হৃদয়বিদারক? না কি মর্মান্তিক? বৃথা চেষ্টা, সব অনুভূতিকে কি আর শব্দের পোশাক পরানো যায়?

ঘটনা যতটা বেদনার, স্থাপনাও ততটাই বেদনাদায়ক ছিল, পরিশেষে স্বীকার করি নির্দ্বিধায়।

লাশই নেই, খুন কীসের?

—আবার বলছি মিস্টার আগরওয়াল, পুলিশকে কিছু জানাবেন না। জানালে পস্তাতে হবে। নাতিকে আর দেখতে পাবেন না কখনও।

—জানাব না। ওকে কিছু করবেন না মিস্টার গুপ্ত, প্লিজ়! বলছি তো, টাকা দেব। যা বলবেন, করব।

—বসুশ্রী সিনেমা চেনেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, হাজরা মোড়...

—রাইট। সন্ধে ৭টা ২০ নাগাদ গাড়ি নিয়ে আসবেন। বসুশ্রীর কাছে দাঁড় করাবেন। টাকা ব্রাউন পেপারে মুড়ে একটা চওড়া লাল রিবন দিয়ে বাঁধবেন। দেখে যাতে চেনা যায়।

—আচ্ছা... আমার এক কলিগ যাবে...দীনদয়াল উপাধ্যায়।

—ওঁকে বলবেন, গাড়ি থেকে নেমে টাকার প্যাকেটটা হাতে নিয়ে মিনিটখানেক দাঁড়াতে। তারপর আবার গাড়িতে গিয়ে বসতে বলবেন। আমার লোক যাবে গাড়ির কাছে। তাঁকে প্যাকেটটা দিয়ে দিতে বলবেন।

—কিন্তু আমার নাতি...মালতু..

—টাকা পাই, নাতি কাল আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। পুরো আশিই আনছেন তো?

—হ্যাঁ, কিন্তু... একবার যদি ওর সঙ্গে কথা বলা যায়...

—ওকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। ঘুমোচ্ছে।

—কিন্তু...

—কোনও কিন্তু নেই। আপনার সন্দেহ হচ্ছে তো, নাতি সত্যিই আমাদের কাছে কি না। টাকা নেওয়ার সময় আমার লোক আপনার নাতির রিস্টওয়াচটা দিয়ে দেবে আপনার লোকের হাতে।

—আচ্ছা আচ্ছা...

—তা হলে ওই কথাই রইল। পুলিশকে জানালে কিন্তু জেনে যাব, মনে থাকে যেন। সাতটা কুড়ি, বসুশ্রী। ঠিক আছে?

গুলমোহন ম্যানসন, ৬০ মিডলটন স্ট্রিট। ফ্ল্যাট নম্বর ৪৩, পাঁচতলায়। এখানেই দীর্ঘদিনের বাস আগরওয়াল পরিবারের। তেষট্টি বছর বয়সি দেবীলাল পরিবারের মাথা, French Motors-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে কর্মরত। আগরওয়ালদের আদি বাড়ি উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে। দুই ছেলে দেবীলালের। শৈলেন্দ্র আর মুরারিলাল। যাঁরা গোরখপুরেই থাকেন, ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির পারিবারিক ব্যাবসা দেখাশোনা করেন।

শৈলেন্দ্রর দুই মেয়ে, এক ছেলে। মেয়েরা থাকে গোরখপুরেই, বাবা-মায়ের সঙ্গে। ছেলে অনুরাগ সবচেয়ে ছোট, ডাকনাম মালতু | কলকাতায় দাদু-ঠাকুমার কাছে থেকে পড়াশোনা করে। বয়স চোদ্দো, এলগিন রোডের জুলিয়ান ডে স্কুলে ক্লাস সিক্স, সেকশন ই। দেবীলালের ছেলেরা সপরিবারে মাঝে মাঝে আসেন কলকাতায়, সময় কাটিয়ে যান মা-বাবার সঙ্গে।

দাদু-ঠাকুমার নয়নের মণি অনুরাগ, বিশেষ করে দাদুর। চোখে হারান নাতিকে। মালতুও অসম্ভব ন্যাওটা দাদুর। যত রাগ-অভিমান-বায়না-আবদার ওই দাদুর কাছেই। বাবা-মা অনেকবার চেয়েছেন গোরখপুরে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে, ওখানের স্কুলে ভরতি করে দিতে। অনুরাগ রাজি হয়নি | দেবীলাল মুখে কিছু

বলেননি, কিন্তু নাতির ইচ্ছায় মনে মনে আহ্লাদিত হয়েছেন খুব।

সালটা ১৯৮৮। সেপ্টেম্বরের শেষদিকে তীর্থযাত্রায় বেরলেন দেবীলাল। স্ত্রী অসুস্থ, একাই গেলেন। গোরখপুর থেকে সস্ত্রীক শৈলেন্দ্র চলে এলেন কলকাতায়, বড়মেয়ে সংগীতাকে সঙ্গে নিয়ে। বাবা যে ক'দিন বাইরে, মায়ের দেখাশোনার প্রয়োজন। তার উপর অনুরাগ রয়েছে।

অনুরাগের তখন পুজোর ছুটি চলছে। দুপুর-বিকেলে কাছেপিঠে প্রায় রোজই বন্ধুদের সঙ্গে এদিক-সেদিক ঘুরতে যেত। কখনও চিড়িয়াখানা, কখনও ভিক্টোরিয়া, কখনও জাদুঘর। ফিরে আসত সন্ধে নামার আগেই।

১২ অক্টোবর দুপুরে দিদি সংগীতা হঠাৎ খেয়াল করলেন, ভাই নিজের ঘরে নেই। কোথায় গেল? মা-কে জানালেন| খোঁজ খোঁজ। বহুতলের দারোয়ানের থেকে জানা গেল, অনুরাগকে দেখেছেন দুপুর একটা নাগাদ কাঁধে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে বেরতে| মা আর দিদি ভাবলেন, বন্ধুদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করতে গিয়েছে কোথাও। না জানিয়ে বেরনোর জন্য বাড়ি ফিরলে বকাবকি করবেন, ভেবে রাখলেন দু'জনেই।

কিন্তু ফিরলে তো? বিকেল পেরিয়ে সন্ধে, সন্ধে গড়িয়ে রাত। ফিরল না অনুরাগ। স্কুলের বন্ধুদের বাড়িতে ফোন করা হল, শৈলেন্দ্র প্রতিবেশীদের নিয়ে চষে ফেললেন পার্ক স্ট্রিট-ভিক্টোরিয়া-চিড়িয়াখানা চত্বর-প্রিন্সেপ ঘাট-ইডেন গার্ডেন। নেই, কোথাও নেই। বিনিদ্র রাত কাটল আগরওয়াল পরিবারের।

পরের দিন সকালে দেবীলাল ফোন করলেন কলকাতার বাড়িতে, বাইরে গেলে রোজ যেমন করে থাকেন। শুনলেন দুঃসংবাদ, ছেলেকে বললেন অবিলম্বে পুলিশে মিসিং ডায়েরি করতে। এবং পত্রপাঠ রওনা দিলেন কলকাতায়। পার্ক স্ট্রিট থানায় ১৩ অক্টোবর জমা পড়ল অনুরাগের ছবি, ডায়েরির পর প্রাথমিক খোঁজখবর শুরু করল পুলিশ। আজ থানায় ছবি পাঠানো, কোথাও কোনও দুর্ঘটনা হয়েছে কি না ইত্যাদি।

১৪ অক্টোবর, সকাল ১০টা। দেবীলাল ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছেন গোরখপুরে। কলকাতার ট্রেন ধরবেন | হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ঢুকতে ঢুকতে রাত সাড়ে এগারোটা হবে। গোরখপুর স্টেশন থেকেই ফোন করলেন বাড়িতে। এবং খবর শুনে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। গলা কাঁপছে শৈলেন্দ্রর, জানালেন, এক ঘণ্টা আগে 'মিস্টার গুপ্ত' নামে একজন ফোন করে জানিয়েছেন, অনুরাগকে তাঁরা কিডন্যাপ করেছেন। মুক্তির বিনিময়ে দাবি এক লাখ টাকা। পুলিশকে কিছু জানালে মালতুকে প্রাণে মেরে ফেলবে বলে হুমকিও দিয়েছেন |

ফের ফোন এলে একদিন সময় চেয়ে নিতে বললেন দেবীলাল| পরামর্শ দিলেন পুলিশকে এখনই কিছু না জানাতে| আরও বললেন, ব্যাংক থেকে তিরিশ হাজার টাকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলে নিতে। বন্ধুবান্ধবদের থেকে বাকিটাও জোগাড় করে রাখতে।

১৪ তারিখই ফোন এল আরও কয়েকবার। হুমকি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে টাকা না পেলে মেরে ফেলা হবে অনুরাগকে। সঙ্গে রুটিন সতর্কবার্তা, পুলিশকে জানালে পরিণতি মারাত্মক হবে। শৈলেন্দ্র বললেন, বাবা বাইরে আছেন। একটু সময় চাই।

দেবীলাল বাড়িতে ঢুকলেন মাঝরাতে। অফিসের সহকর্মী আর আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ভরতি। আশঙ্কা আর আতঙ্কে পুরো পরিবার প্রায় আচ্ছন্ন তখন। French Motors-এর সহকর্মীরা যে যত পেরেছেন, টাকা নিয়ে এসেছেন, শৈলেন্দ্র টাকা তুলেছেন ব্যাংক থেকে। দেখা গেল, আশি হাজার জোগাড় হয়ে গিয়েছে।

পরের দিনের সকাল, ১৫ অক্টোবর। ঠিক ন'টায় ফোন বাজল। অন্যদিকে মিস্টার গুপ্ত |

—কী ঠিক করলেন? বেশি সময় নেই আমাদের হাতে।

—আপাতত আশি হাজার দিচ্ছি। বাকিটা দু'-একদিনের মধ্যে দিয়ে দেব।

—হুঁ, টাকা রেডি রাখুন, কখন কীভাবে কোথায় দেবেন, সন্ধেবেলা জানিয়ে দেব।

—কিন্তু মালতুর সঙ্গে একবার...

—বলছি তো, টাকা পেলে পরশু দিন বিকেলে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

কেউ কেউ বললেন, পুলিশে জানিয়ে রাখা যাক। রাতভর আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল, টাকা

দেওয়া হোক। মালতু আগে বাড়ি ফিরুক, তারপর পুলিশে জানানোর কথা ভাবা হবে। ঘরের ছেলের প্রাণ আগে, না অপরাধীর ধরা পড়া আগে? না কি টাকা আগে? আগে মালতু ফিরুক।

অপহরণের মামলায় এই এক মুশকিল। একবার নয়, বারবার দেখেছি আমরা। জানাজানি হয়ে গেলে, মিডিয়ায় প্রচারিত হয়ে গেলে অন্য কথা। কিন্তু যদি সেটা না হয়, জানতে না পারে কেউ পরিবার-পরিজন ছাড়া? মুক্তিপণ চেয়ে ফোন এলে, পুলিশকে জানালে অপহৃতকে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখালে, স্বাভাবিক দোলাচলে ভুগতে থাকে পরিবার। পুলিশকে জানাব কি জানাব না?

সত্যি বলতে, দোষও দেওয়া যায় না ভুক্তভোগী পরিবারকে| এ তো চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-শ্লীলতাহানি নয় যে অভিযোগ করে দিলাম, এবার পুলিশ যা করার করুক। প্রিয়জন জীবিত অবস্থায় অন্যের হেফাজতে বন্দি| এবং যে বা যাদের হাতে বন্দি, জানা নেই তারা কতটা বিপজ্জনক, কতটা মরিয়া। এমন অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক স্তরে পুলিশে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকতেই পছন্দ করে অপহৃতের পরিবার, অভিজ্ঞতা আমাদের। অনেকে মুক্তিপণ দিয়ে প্রিয়জন বাড়ি ফেরার পরই পুলিশকে জানান, কেউ কেউ আদৌ জানানই না।

এক্ষেত্রেও ভয় পেয়েছিলেন আগরওয়াল পরিবার। পুলিশে জানালে পাছে ক্ষতি হয়ে যায় অনুরাগের, সেই আশঙ্কায় মুক্তিপণের টাকা দিয়েছিলেন। যখন জানালেন, তখন চূড়ান্ত ক্ষতি হয়ে গিয়েছে, যা পূরণ হওয়ার নয়।

পুলিশের দিকটাও বলা দরকার। অভিযোগ যদি সাহস করে কেউ করেও ফেলেন অপহরণের, সাবধানে, খুব সাবধানে পা ফেলতে হয় পুলিশকে। মাথায় রাখতে হয়, অপরাধী তো ধরতে হবেই, কিন্তু নিরপরাধ প্রাণের মূল্যে নয়। অপহৃত ফিরে আসুক নিরাপদে, তারপর ঝাঁপানো যাবে, এই ভাবনা কাজ করেই। রক্ষণ মজবুত করে তবেই আক্রমণে যাওয়া। গ্রেফতার, মুক্তিপণের টাকা উদ্ধার, এসব পরেও হতে পারে, বিলক্ষণ সম্ভব। কিন্তু অপহৃতের প্রাণহানির ন্যূনতম ঝুঁকি থাকতে পারে, এমন কিছু করার আগে হাজারবার ভাবি আমরা|

ঠিক হল,বাড়ির বিশ্বস্ত ড্রাইভার ভবন শর্মাকে নিয়ে দেবীলালের দীর্ঘদিনের সহকর্মী দীনদয়াল উপাধ্যায় টাকা নিয়ে যাবেন। ফোন এল সাড়ে ছ'টায়| যা কথোপকথন হল, কাহিনির শুরুতে পড়েছেন। হাজরা মোড়ে রওনা হলেন দীনদয়াল উপাধ্যায়। যেমনটা নির্দেশ এসেছিল, অক্ষরে অক্ষরে মেনে। কতটুকুই বা দূরত্ব মিডলটন স্ট্রিট থেকে হাজরার? দীনদয়াল যখন পৌঁছলেন বসুশ্রীর সামনে, ঘড়িতে সাতটা দশ। মানে এখনও হাতে মিনিট দশেক। নেমে দাঁড়ালেন, হাতে প্যাকেট। ব্রাউন পেপারের, লাল রিবন দিয়ে বাঁধা। ভিতরে আশি হাজার নগদ| গাড়িতে গিয়ে বসলেন কয়েক মিনিট পর। ঘড়ির কাঁটা সোয়া সাতটা ছুঁয়ে ফেলেছে তখন।

দোকানবাজারের হইহল্লা, গাড়িঘোড়ার ভিড়ভাট্টা, অফিসফিরতি জনতা পিলপিল। ভরসন্ধের হাজরা মোড় গমগম করছে তখন, যেমন করে আজ-কাল-পরশু। কাঁটায় কাঁটায় সাতটা কুড়িতে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল বছর দশেকের একটি ছেলে। খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন দীনদয়াল। নাহ্, চেহারায় বিশেষত্ব বলতে কিছু নেই। নোংরা শার্ট, ঢিলেঢালা হাফপ্যান্ট, পায়ে চটিও নেই। নেহাতই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, বুঝতে বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন নেই।

হাফপ্যান্টের পকেট থেকে একটা রিস্টওয়াচ বার করল ছেলেটি। দীনদয়াল হাতে নিয়ে দেখালেন ড্রাইভার ভবনকে| দেখেই ঘাড় নাড়ল ভবন, মালতু ভাইয়া কি হি হ্যায়। শুনে আর একটা কথাও খরচ করলেন না দীনদয়াল। হাতবদল হয়ে গেল ব্রাউন পেপারের প্যাকেট। যেটা নিয়েই দৌড় দিল ছেলেটি, মিশে গেল থিকথিকে ভিড়ে।

পৌনে আটটা নাগাদ মিডলটন স্ট্রিটে ফিরলেন দীনদয়াল। রিস্টওয়াচ দেখে আর এক প্রস্থ কান্নাকাটি শুরু হল। Citizen Quartz white dial, এ ঘড়ি মালতুরই। নিউ মার্কেট থেকে নাতিকে কিনে দিয়েছিলেন দাদুই| মা-দিদি-ঠাকুমার অঝোর কান্না থামালেন শৈলেন্দ্র, টাকা দেওয়া হয়েছে। মালতু কালই ফিরে আসবে।

জানতেন না, ওই আশ্বাসবাণী কত ঠুনকো শোনাবে মাত্র এক ঘণ্টা পরে!

আগরওয়ালদের বাড়িতে ফোন বাজল রাত ন'টায়। তুললেন দেবীলাল, অন্যপ্রান্তে পরিচিত গলা। মিস্টার গুপ্ত।

—কী হল মিস্টার আগরওয়াল! টাকা তো পেলাম না।

—মানে? পেলেন না মানে? উপাধ্যায় প্যাকেট দিয়েছে একটা বাচ্চা ছেলের হাতে। ছেলেটা মালতুর ঘড়িও দিয়েছে।

—ছেলেটাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না | চালাকি করবেন না আমাদের সঙ্গে।

—কী বলছেন আপনি? দিস ইজ় অ্যাবসোলুটলি ফলস। আপনি কথা দিয়েছিলেন, মালতুকে ছেড়ে দেবেন টাকা পেলে।

—টাকা পেলে দেব বলেছিলাম। টাকাই তো পাইনি!

ফোন কেটে দেওয়ার শব্দ পান দেবীলাল, বসে পড়েন মাথায় হাত দিয়ে|

এবার? কী করণীয়? ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিল পরিবার। পুলিশকে জানাতেই হবে, রাস্তা নেই এ ছাড়া| মামলা দায়ের হল পার্ক স্ট্রিট থানায়। তদন্তের দায়িত্ব পড়ল গোয়েন্দা দফতরের তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর দুলাল চক্রবর্তীর উপর। যিনি সফল কর্মজীবনের শেষে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হিসেবে অবসর নিয়েছিলেন।

অনুরাগ আগরওয়াল অপহরণ ও হত্যা মামলা। পার্ক স্ট্রিট থানা, কেস নম্বর ৬৩১, তারিখ ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৮। ১২০ বি/৩৬৮/৩৮৪/৩০২/২০১ আইপিসি। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, খুনের উদ্দেশ্যে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, খুন এবং প্রমাণ লোপাট। এই মামলা, বহুব্যবহারে মরচে পড়ে যাওয়া তুলনাতেই বলি, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের টুপিতে উজ্জ্বল পালক। যে মামলা প্রসঙ্গে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট মন্তব্য করেছিলেন, "The prosecution case as aptly observed by the learned Trial Judge reminds us of a story taken from a thriller."

অনুরাগ আগরওয়াল

ঘটনা আটের দশকের শেষাশেষির। যাঁরা এখন চল্লিশের কোঠায়, তাঁরা নিশ্চয় ফিরে দেখতে পাবেন সময়টা, অনায়াসে। আজকের মতো হাজার খানেক টিভি চ্যানেল ছিল না তখন। ছিল না ২৪ x ৭ শুধু সিরিয়াল-সিনেমার জন্যই নির্দিষ্ট গোটা পঞ্চাশ বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি চ্যানেল। খেলা বা খবরের জন্যও বরাদ্দ থাকত হাতে গোনা গুটিকয়েক। সপ্তাহে একদিন হাপিত্যেশ করে বসে থাকা 'চিত্রহার'-এর অপেক্ষায়। হিন্দি সিনেমার জনপ্রিয় গানের অনুষ্ঠান। শেষ হয়ে গেলে আক্ষেপ, মাত্র চার-পাঁচটা গান দেয়, এত বিজ্ঞাপনের কী দরকার? স্কুল-কলেজ-পাড়ায় আলোচনা অবধারিত পরের দিন, এ বারেরটা জমল না তেমন, বা শেষ গানটায় পয়সা উসুল!

তখন সিরিয়াল বলতে '৮৪-র 'হামলোগ', ভারতীয় টেলিভিশনের ইতিহাসে প্রথম সোপ অপেরা। যা আবির্ভাবেই তুমুল জনপ্রিয়। প্রতি এপিসোডের শেষে অশোককুমারের কয়েক মিনিটের ভাষ্য আর অননুকরণীয় 'হামলোগ' দিয়ে শেষ করা। বছর দুয়েক পরে বোকাবাক্সের পরদা দখল করবে 'বুনিয়াদ', দেশ ভাগের পটভূমিতে তৈরি সিরিয়াল | অলোকনাথ আর অনিতা কানওয়ারের হাত ধরে 'মাস্টারজি' আর 'লাজোজি' ঢুকে পড়বেন আম ভারতীয় পরিবারের হেঁসেলে। সোপ অপেরার সৌজন্যে হাট করে খুলে যাবে বহুদিনের বন্ধ থাকা একটা দরজা। যার জেরে পরের কয়েক দশকে ভারতীয় টেলিভিশনে আছড়ে পড়বে সিরিয়াল-সুনামি।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, উপরের দুটো অনুচ্ছেদ বাড়তি মনে হতে পারে। কিন্তু প্রেক্ষিতের স্বার্থে প্রয়োজন

ছিল। অনুরাগের কথায় ফিরি। জন্ম ’৭৪-এ। বেঁচে থাকলে বয়স হত মাঝচল্লিশ। সিরিয়াল-সিনেমার আকর্ষণ কৈশোরে অনেকেরই থাকে। অনুরাগেরও ছিল, কিন্তু অস্বাভাবিক বেশি মাত্রায়। টিভির পোকা বললে প্রায় কিছুই বলা হয় না। সিরিয়াল-সিনেমা দেখা অনুরাগের কাছে ছিল সাধনার মতো। ডায়লগ মুখস্থ করত, ঘরে অভিনয় করত আয়নার সামনে, পড়াশোনা—খেলাধুলোর মতো নেহাতই ‘তুচ্ছ’ জাগতিক বিষয়ে মাথা ঘামাতে তীব্র অনীহা ছিল বছর চোদ্দোর কিশোরের। আশা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-আহ্লাদ বলতে একটাই, রুপোলি পরদায় মুখ দেখানো। সেটাই কাল হবে, কে ভেবেছিল?

কারা করেছিল অপহরণ? কীভাবে? কাহিনি পিছিয়ে যাক কয়েক মাস আগে, কিডন্যাপ-কাণ্ডের পান্ডাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

দেবাশিস ব্যানার্জি, বয়স তখন তিরিশ ছাড়িয়েছে| বাড়ি তিলজলার সি এন রায় রোডে। জীবিকা বলতে ছোটখাটো অর্ডার সাপ্লাই। বাবা মারা গিয়েছেন, মা কিছু টাকা পেনশন পান ‘পলিটিক্যাল সাফারার’ হিসেবে। মধ্যবিত্ত পরিবার, সচ্ছল নয় একেবারেই। যাদবপুরে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাজকর্মে যুক্ত ছিলেন দেবাশিস। সেখানেই ’৮৬ -তে আলাপ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কাবেরীর সঙ্গে। আলাপ গড়াল প্রেমে, ’৮৮—র জানুয়ারিতে দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল বিয়ের।

বিয়ের খরচাপাতির ব্যবস্থা করতে গিয়ে টাকাপয়সার সমস্যা দেখা দিল। কিন্তু সব পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে, দিন আর পিছনো যায় না। বিয়েতে ধারদেনা হল কিছু। যা ক্রমে বাড়তে থাকল বিয়ের পর, লোকলৌকিকতা ইত্যাদিতে। ব্যবসাতেও মন্দা চলছে তখন। সংসার চালাতে দেবাশিসের নাভিশ্বাস উঠল মাসছয়েকের মধ্যেই। মেজোশ্যালক রেলে কনট্র্যাক্টর ছিলেন, চেষ্টা করলেন দেবাশিসকে কিছু অর্ডার পাইয়ে দেওয়ার। সুবিধে হল না তেমন। শ্যালকের থেকে দেবাশিস ধারও নিলেন হাজার বিশেক, শোধ করতে পারলেন না। কাবেরী প্রায়ই দুঃখ করতেন, দাদার টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও, বাপের বাড়িতে লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার।

কসবার মসজিদবাড়ি লেনে থাকতেন দেবাশিসের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিজন বড়ুয়া, বিজ্ঞানের স্নাতক। প্রাইভেট টিউশন এবং একটি ওষুধের দোকানে টুকটাক কাজ করেই যাঁর দিনগুজরান। অবিবাহিত, একাই থাকেন। আর্থিক অবস্থা করুণ বিজনেরও। ধারদেনা তাঁরও বিস্তর।

দুই বন্ধু সান্ধ্য আড্ডায় প্রায়ই ভাবতেন, এভাবে তো আর চলে না, দেনার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কতদিন আর টানা যাবে এভাবে? টাকার দরকার, কিন্তু কে দেবে? রাতারাতি লটারি লেগে যাবে, এমন সম্ভাবনা নেই। চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই পোষাবে না। তা হলে? কথায় কথায় একদিন মাথায় এল, কিডন্যাপিং করলে কেমন হয়? চটজলদি বড়লোক হওয়ার আর তো কোনও উপায় দেখা যাচ্ছে না।

ছক কষা শুরু করলেন দুই বন্ধু। কয়েকটা ব্যাপার ঠিক করে নিলেন প্রথমেই। এক, বিশাল ধনী কোনও পরিবারের ছেলেকে টার্গেট করা ঝুঁকির হয়ে যাবে। কাগজে বেরবে, জানাজানি হবে, পুলিশ ঝাঁপাবে। তার চেয়ে ভাল, মোটামুটি সম্পন্ন পরিবারের কাউকে কিডন্যাপ করা। টাটা—বিড়লা জাতীয় নয়, কিন্তু মুক্তিপণ দেওয়ার মতো টাকা আছে, এমন। দুই, যা করতে হবে, ভুলিয়েভালিয়ে। জোরজার করে নয়। তিন, অপহৃতকে রাখার জায়গা চাই। দেবাশিস বললেন বিজনের বাড়িতে রাখার কথা। বিজন শুরুতে গররাজি হলেও মেনে নিলেন শেষ পর্যন্ত| চার, কিছু সরঞ্জাম চাই। মুখ বাঁধার জন্য লিউকোপ্লাস্ট কিনলেন দেবাশিস, বাগরি মার্কেট থেকে air purifier mask। ভাবনা, কিডন্যাপ করার পর এই ঢাকনা মুখে পরিয়ে দিয়ে উপরে ফোঁটা ফোঁটা ক্লোরোফর্ম ঢালবেন, যা অপহৃতের নাকে ঢুকবে। তাতে ব্যাপারটা নিরাপদ থাকবে। কতটা দিতে হবে জানা নেই, ডোজ় বেশি হয়ে গেলে যদি ঘুমই না ভাঙে? বিজন জোগাড় করলেন pethidine ইঞ্জেকশন আর ক্লোরোফর্ম। পাঁচ, সম্ভাব্য শিকার খুঁজবে কে? টিউশনির ফাঁকে সময় বের করা মুশকিল বিজনের, খোঁজার ভার নিলেন দেবাশিস।

শিকারের সন্ধানে পরের সপ্তাহদুয়েক এসপ্ল্যানেড, নিউমার্কেট, পার্ক স্ট্রিট, বালিগঞ্জ, আলিপুরে দিনভর

ঘুরে বেড়াতেন দেবাশিস। বড়লোকরা তো এসব জায়গাতেই থাকে অধিকাংশ। কিন্তু ওভাবে কি হয়? অনেক ঘুরেফিরেও সুবিধে হচ্ছিল না। টার্গেট চিহ্নিত করছেন হয়তো, কিন্তু আলাপ জমাতে পারছেন না। প্রায় হাল ছেড়ে দেওয়ার মুখে যখন, এক সন্ধ্যায় আচমকাই সন্ধান পেলেন সম্ভাব্য শিকারের।

২ অক্টোবর। বিকেল-সন্ধের মাঝামাঝি তখন। এসপ্ল্যানেড থেকে যতীন দাস পার্কের টিকিট কেটে দেবাশিস প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছেন। দেখলেন, একটু দূরেই দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে | দু'জনেরই বয়স তেরো-চোদ্দো হবে। ধোপদুরস্ত জামাকাপড়। দেবাশিস কান পাতলেন। দু'জনেই সিনেমা আর সিরিয়ালের গল্পে মগ্ন। ট্রেন এল। দুই কিশোরের পিছুপিছুই ট্রেনে উঠলেন। বসলেন ওদের পাশেই। গল্প তখনও লাগাতার চলছে সিনেমার।

"পরবর্তী স্টেশন পার্ক স্ট্রিট, আগলা স্টেশন পার্ক স্ট্রিট, দ্য নেক্সট স্টেশন ইজ় পার্ক স্ট্রিট।" ঘোষণা হতেই উঠে দাঁড়াল দু'জন। উঠে পড়লেন দেবাশিসও, ওদের সঙ্গেই নামলেন পার্ক স্ট্রিটে। প্ল্যাটফর্মেই আলাপ জমালেন দেবাশিস।

—এক্সকিউজ় মি, তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

—বলুন।

—আমি এইচ কে গুপ্ত। টিভি সিরিয়াল বানাই। একটু কথা বলতাম। তার আগে তোমাদের নামটা জানা দরকার।

—আমি অনুরাগ, অনুরাগ আগরওয়াল। আর ও সমীর প্যাটেল। সিরিয়ালের ব্যাপারে কী বলছিলেন...

—আসলে আমি একটা সিরিয়াল বানাচ্ছি। 'সফেদ ধাগে'। একজন টিন-এজারের গল্প। অ্যাক্টর খুঁজছি, পাচ্ছি না। তোমাকে দেখে মনে হল, রোলটায় ভাল মানাবে। অবশ্য তুমি যদি রাজি থাকো, তবেই...

—কী বলছেন? আমরা রাজি, আর কে কে আছে সিরিয়ালে?

দেবাশিস বুঝতে পারেন, শিকার টোপ গিলেছে, এখন শুধু প্ল্যানমাফিক বঁড়শিতে গাঁথার অপেক্ষা।

—সব বলব, কিন্তু দু'জনকে তো নিতে পারব না। অনুরাগ এই ছবিটার জন্য পারফেক্ট। সমীর, তোমারটা পরের ছবিতে ভাবব। কিন্তু তোমার বাড়ির লোকজন রাজি হবেন তো অনুরাগ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে। শুরুতে বলব না, সিরিয়াল টেলিকাস্টের আগে সারপ্রাইজ় দেব।

—আসলে শুটিংয়ে কী হয় জানো, টাইমের ঠিক থাকে না কোনও। যখন-তখন 'কল টাইম' থাকে। তোমার বাড়িতে অ্যালাও করবে কি?

—ও আমি ম্যানেজ করে নেব আঙ্কল। সিরিয়াল কবে থেকে দেখাবে টিভিতে?

দেবাশিস হাসেন, পিঠে হাত রাখেন অনুরাগের।

—হবে হবে। তোমার পুজোর ছুটির মধ্যেই শুটিং সেরে ফেলব। এখন বাড়ির কাউকে কিছু না বলাই ভাল।

—বলব না আঙ্কল, নিশ্চিন্তে থাকুন।

অনুরাগের বাড়ি কোথায়, কে কে আছেন, কে কী করেন, টেলিফোন নম্বর কী, সব কথার মাঝে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন দেবাশিস। বললেন, ফোনে যোগাযোগ করবেন। সঙ্গে যোগ করলেন, বাড়ির অন্য কেউ ফোন ধরলে কিন্তু কেটে দেবেন। অনুরাগের গলা পেলে তবেই কথা বলবেন। না হলে বাড়ির লোক জেনে যাবে, আর জেনে গেলে অভিনয়ের অনুমতি না-ও দিতে পারেন। সকাল দশটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটার মধ্যে করবেন আঙ্কল, আমিই ধরব, আশ্বস্ত করল অনুরাগ|

সন্ধেবেলা বিজনের বাড়িতে বসে প্ল্যান হল, কাজটা পরের দিনই সেরে ফেলতে হবে। ৩ অক্টোবর বেলা এগারোটা নাগাদ রাসেল স্ট্রিটের পোস্ট অফিস থেকে ফোন গেল অনুরাগের বাড়ি। দুটো নাগাদ ময়দান স্টেশনে আসতে বলা হল অনুরাগকে, তড়িঘড়ি চলেও এল অভিনয়ের স্বপ্নে বিভোর কিশোর।

দেবাশিস বললেন, 'তোমার 'লুক টেস্ট' হবে আজ, ক্যামেরাম্যানের বাড়ি যাই চল।' নিয়ে গেলেন

বিজনের বাড়ি, এদিক—ওদিক চক্কর কেটে ঘুরপথে, যাতে চট করে আবার কখনও চিনে আসতে না পারে। বিজনের পরিচয় দিলেন ক্যামেরাম্যান হিসাবে, নাম মিস্টার রায়।

'সফেদ ধাগে' সিরিয়ালের বানানো গল্প শোনানো হল অনুরাগকে। বিজন ক্যামেরা নিয়ে নানা পোজে ছবি তুললেন কিশোরের। আসল 'কাজ'টা কিন্তু দেবাশিস-বিজন করে উঠতে পারলেন না সেদিন। সাহসে কুলোল না। পৌনে পাঁচটা নাগাদ অনুরাগ বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে, মা-বাবা চিন্তা করবে এবার। দেবাশিস কালীঘাট স্টেশনে নিয়ে গিয়ে ময়দান স্টেশনের টিকিট কেটে দিলেন।

পরের সাক্ষাতের দিন ঠিক হল ফোনমারফত। ৪ অক্টোবর, কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে। দুপুর একটায়। ফের বিজনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল অনুরাগকে। ঘটনাচক্রে সেদিন কোনও প্রতিবেশীর বাড়িতে সামাজিক অনুষ্ঠান, দিনভর আনাগোনা লোকজনের, হইচই | সেদিনও হল না, ফিরে গেল অনুরাগ, কিছু কাল্পনিক দৃশ্য অভিনয় করে দেখানোর পর।

সে-রাতে বিজন বললেন দেবাশিসকে, এভাবে ছেলেটাকে বারবার বাড়িতে আনা ঝুঁকির হয়ে যাচ্ছে। পাড়ার কিছু লোকজনের চোখে তো পড়ছেই। যা করার, খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। আর দেরি করাটা মারাত্মক ঝুঁকি হয়ে যাবে।

ঠিক হল, ৬ তারিখ দুপুরে ফের ডাকা হবে অনুরাগকে। আর সেদিনই এসপার-ওসপার।

৬ অক্টোবর, দুপুর দেড়টা। কথা হয়েছিল ফোনে আগেই। অনুরাগকে নিয়ে দেবাশিস কসবায় পৌঁছতেই বিজন বললেন, 'শুটিং শুরু পরের সপ্তাহে, আজকে তো ফাইনাল 'লুক টেস্ট'। কিন্তু তোমার মুখটা তো একদম রোদে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। এতে তো চলবে না ভাই।'

অনুরাগ শুনেই ভীষণ মুষড়ে পড়ল। সাজানো চিত্রনাট্যে দেবাশিস-বিজনের পরের সংলাপ হল এরকম।

—মিস্টার রায়, চেহারায় 'গ্লেজ়' ফিরিয়ে আনার ওই ইঞ্জেকশনটা দিলে হয় না?

—মন্দ বলেননি, কিন্তু ঘুম পাবে তো একটু। অবশ্য ঘণ্টাখানেক মাত্র। তারপর উঠে পড়বে, মুখে 'গ্লেজ়' ফিরে আসবে। ফ্রেশ লাগবে অনেক।

অনুরাগ লাফিয়ে উঠল।

—দিন আঙ্কল, দিন। ইঞ্জেকশনটা দিন প্লিজ়।

Pethidine ইঞ্জেকশন দেওয়া হল। ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ দেবাশিস কিনে রেখেছিলেন। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ কাটল | কিন্তু যাকে বলে 'Deep Sleep', তাতে তলিয়ে গেল না অনুরাগ। ঘুমঘুম আচ্ছন্ন ভাব, কিন্তু জেগে। ঘণ্টাখানেক পর উঠেই বসল অনুরাগ।

—আঙ্কল, ছবি তুলে নিন এবার।

ছবি তোলা হল। ততক্ষণে সন্ধে নেমেছে প্রায়। পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়াদের একজন পাড়ার কালীপুজোর ব্যাপারে কথাও বলতে এসেছেন। কাজ হাসিল সেদিনও হল না। অনুরাগকে মেট্রোতে ছেড়ে দিতে গেলেন দেবাশিস। রাসবিহারী মোড়ের PCO থেকে বাড়িতে মা-কে ফোন করল অনুরাগ, 'একটু দেরি হচ্ছে। চিড়িয়াখানা গিয়েছিলাম। সমীরদের গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে গিয়েছিল। চিন্তা কোরো না। আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

'অপারেশন কিডন্যাপ' বারবার তিনবার ফেল। সেই রাতে বিজন পরিষ্কার জানালেন দেবাশিসকে, তাঁর বাড়িতে আর সম্ভব নয়। ছেলেটাকে অনেকে দেখেছে, চিনে ফেলেছে। কৌতূহল বাড়ছে পাড়াপ্রতিবেশীর। কিডন্যাপের পর রাখার অন্য জায়গা খোঁজা দরকার।

হাওড়ার বালিতে দেবাশিসের এক পরিচিত ছিল। নাম পল্লব মুখার্জি ওরফে পলু। কাজকর্ম বলতে টুকটাক জমির দালালি, বাকি সময় এলাকায় দাদাগিরি। পরের দিনই বালি গিয়ে প্ল্যান খুলে বলা হল পলুকে। সব শুনেটুনে পলু বলল, 'জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে পারে ঘাসবাগানের অশোক রাই ওরফে ভোদা |

তোমরা ১১ তারিখ এসো একবার, তার মধ্যে আমি কথা বলে রাখছি। হাওড়া স্টেশনের কফি কর্নারে বেলা এগারোটা নাগাদ দেখা হবে।'

১১ অক্টোবর। পলুর সঙ্গে কফি কর্নারে অপেক্ষা করছিল আর একটি ছেলে। এর নাম গোপাল, গোপাল সরকার | একে সঙ্গে রাখলে কাজের সুবিধে হবে— আলাপ করিয়ে দিল পলু | চারজনে মিলে ঘাসবাগানে যাওয়া হল ভোদার সঙ্গে দেখা করতে। বহু গলিঘুঁজি পেরিয়ে ভোদার বাড়ি। কথা হল। দেবাশিস-বিজন অল্পক্ষণেই বুঝলেন, ভোদা অপরাধের দুনিয়ায় জলের মাছের মতোই স্বচ্ছন্দ। হাওড়ার নটরাজ হোটেলের কাছে গম বিক্রি করে। এহ বাহ্য | আসলে এলাকার নামকরা মস্তান, দুর্দান্ত দাপট আছে |

টাকাপয়সার ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে কথা হল। কিডন্যাপের পর অপহৃতকে রাখার জায়গা দেখাতে নিয়ে চলল ভোদা। কাছেই একটি নুনের গোলা, বিশাল এলাকা জুড়ে | পরিত্যক্ত, নির্জন। অনেক ঘর, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার জন্য আঁকাবাঁকা গলিপথ | ভুলভুলাইয়ার সঙ্গে টক্করে জিততে না পারলেও লড়াই দেবে | ভোদা বিড়ি ধরিয়ে বলল, 'এটাই ফিট জায়গা। কেউ টের পাবে না। রাতে কোনও পাহারা থাকে না। এখানে রাখতে গেলে তোমাদের দু'জনকেই পালা করে পাহারা দিতে হবে। আমার লোক পাহারা দেবে না।'

বিজন-দেবাশিস শত হলেও দাগি আসামি তো নন, একটু ঘাবড়ে গেলেন। বিজন বললেন, এই হানাবাড়িতে রাতভর একা পাহারা? অসম্ভব! দেবাশিস সায় দিলেন, অন্য জায়গা হলে ভাল হয়।

ভোদা ফ্রন্টফুটের প্লেয়ার। ব্যাকফুটের কোনও অস্তিত্বই নেই চিন্তাভাবনায় | হেসে আরেকটা বিড়ি ধরাল। বোঝা গেল, জায়গার অভাবটা কোনও সমস্যাই নয়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সদলবলে পৌঁছল কাছেই Dikshit Transport Company-র গোডাউনে। কোম্পানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে মাসছয়েক আগে। একজন দারোয়ান আছে, নাম ভগবতী| ভরদুপুরেই যার মুখ থেকে মদের গন্ধ ছিটকে বেরচ্ছে ভকভক| পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি চোলাই মদ বেচা শুরু করেছে ইদানীং।

ভগবতী চাবি দিয়ে দিল এক কথায়। গুদামঘরটা বেশ বড়। নানা মাপের কাঠের প্যাকিং বক্স রাখা। বেশ পছন্দ হয়ে গেল দেবাশিস-বিজনের। হ্যাঁ, এটা চলবে।

এই সেই গুদামঘর

দু'জনে রওনা হয়ে গেলেন কলকাতায়। পরের দিন সকাল দশটায় অনুরাগের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে বলা হল দুপুর দেড়টা নাগাদ কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে আসতে। দিনটা ১২ অক্টোবর। নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি থেকে কাউকে না জানিয়ে বেরল অনুরাগ| 'হিরো' হওয়ার স্বপ্নে মাতোয়ারা কিশোর, দূরতম কল্পনাতেও ভাবেনি, আর ফেরা হবে না।

অনুরাগকে নিয়ে দু'জনে প্রথমে গেলেন চাঁদপাল ঘাট, তারপর লঞ্চে গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়ায়। অনুরাগকে বললেন, হাওড়ায় একটা গোডাউনে শুটিং-এর লোকেশন। গোপাল ওপারের ঘাটে অপেক্ষা করছিল। দূর থেকে দেখেই রওনা হয়ে গেল পলু আর ভোদাকে খবর দিতে। বেলা তখন সাড়ে তিনটের কাছাকাছি।

দেবাশিস-বিজন যখন অনুরাগকে নিয়ে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির গুদামের রাস্তায়, গোপাল পথ আটকাল। দেবাশিসদের আলাদা ডেকে বলল, সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। দিনের আলোয় গোডাউনে ঢোকা যাবে না। লঞ্চঘাটে ফিরে অপেক্ষা করতে লাগলেন দেবাশিস-বিজন-গোপাল। এবং অনুরাগ। যে এতক্ষণে একটু অস্থির হয়ে পড়েছে, বলছে, বাড়িতে সন্ধের মধ্যে ফিরব বলে এসেছি। মা-বাবা খুব চিন্তা করবে। দেবাশিস আশ্বস্ত করলেন, টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য দেরি হচ্ছে। কোনও চিন্তা নেই, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব আমরা। মা-বাবাকে বুঝিয়ে বলব।

দিন তো গেল, সন্ধে হল | অনুরাগকে নিয়ে তিনজন ফের রওনা দিল গোডাউনে। পলু ও ভোদা ভিতরে অপেক্ষা করছিল। ঢুকেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল অনুরাগ। এ কোথায় এলাম? এখানে শুটিং হবে? ক্যামেরা

কই, আলো কই, টেকনিশিয়ানরা কই? আর ওই দু'জন কারা? লুঙ্গি পরে বসে আছে, সামনে গ্লাস, বিশ্রী গন্ধ বেরচ্ছে মুখ থেকে? একটা প্যাকিং বক্স উঁচু করে রাখা একধারে। উপরে চট ও চাদর পাতা। একটা ছোট ল্যাম্প জ্বলছে টিমটিম। বিজনরা ঢুকতেই ভোদা দরজা বন্ধ করে দিল গোডাউনের, চাবি দিয়ে দিল ভিতর থেকে। দারোয়ান ভগবতী তখন বাইরে, চোলাইয়ের খদ্দেররা আসতে শুরু করেছে।

এই গুদামঘরে অনুরাগকে মারা হয়েছিল

ব্যাপারস্যাপার দেখে ভয় পেয়ে গেল অনুরাগ। কেঁদেই ফেলল দেবাশিসের হাত জড়িয়ে ধরে, 'আঙ্কল, বাড়ি যাব | আমাকে প্লিজ় নিয়ে চলুন এখান থেকে। আমি অভিনয় করতে চাই না।'

দেবাশিস-বিজন তখন কিছুটা বিভ্রান্ত। ঠিক কীভাবে এগোবেন, বুঝতে পারছেন না। ভোদা ব্যাপারটা বুঝে দায়িত্ব নিয়ে নিল, এরপর চিল্লামিল্লি করবে, বেঁধে ফেল।

পাঁচজনে ঘিরে ধরে মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে দেওয়া হল অনুরাগের, বেঁধে ফেলা হল হাত-পা। প্যাকিং বক্সের উপর শুইয়ে দিয়ে air purifier mask-এর মধ্যে কয়েক ফোঁটা ক্লোরোফর্ম দিয়ে নাকের কাছে ধরা হল। একটা ঝিমুনি ভাব এল ঠিকই, কিন্তু অচৈতন্য নয়।

সে-রাতে পাহারায় থাকল বিজন। ঠিক হল, ভোদা আর পলু রাতে মাঝেমাঝে এসে দেখে যাবে, কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না। দেবাশিস কলকাতায় চলে এলেন সে-রাতে। পরের দিন, ১৩ অক্টোবর, ফিরে এলেন সন্ধেবেলায়। বিজন বললেন, 'কোনও কাজ হয়নি ক্লোরোফর্মে, সারারাত ছটফট করেছে অনুরাগ।' সঙ্গে যোগ করলেন, 'ফোন করেছ আগরওয়ালদের?' দেবাশিস বললেন, 'করব, কাল।'

বিজন এবার ফিরে গেলেন কলকাতায়। সে-রাতে পাহারার পালা দেবাশিসের। সন্ধেবেলা গুদামঘরে তখন গোপাল-পলু-ভোদা-দেবাশিস। ভোদা বখরার টাকার দাবি করল। এখনও জোগাড় হয়নি শুনে খেপে গিয়ে বলল, 'এমন তো কথা ছিল না! আমি আগে টাকা না নিয়ে কোনও কাজে হাত দিই না। পলু বলেছিল বলে করেছিলাম। ২/৩ দিন ওয়েট করব, তার মধ্যে টাকা না পেলে...।' কথা শেষ করল না ভোদা, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে রক্ত হিম হয়ে গেল দেবাশিসের।

রাত বাড়ল। ভোদা একটা দোকানে নিয়ে গেল বাকি তিনজনকে। ডিনারে মশলা ধোসা, শেষ পাতে কুলফি। দেবাশিস পয়সা দিতে গেলেন, ভোদা থামিয়ে দিল, 'আমার কাছে পয়সা চাওয়ার হিম্মত এ তল্লাটে কারও নেই। কেউ কথা বলে না আমার উপর।'

ফেরা হল গুদামে | তখন প্রবল ছটফট করছে অনুরাগ, কাঁদছে। মুখ বাঁধা থাকায় আওয়াজ বেরচ্ছে না, কিন্তু জল পড়েই চলেছে চোখ দিয়ে। পলু বলল, 'ব্যাপারটা কিন্তু খারাপ দিকে যাচ্ছে। কলকাতার ছেলে, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে। টাকা যদি পেয়েও যাই, একে ছেড়ে দিলে সব বলে দেবে। মুখ তো চিনেই ফেলেছে। ধরা পড়লে লাইফ বরবাদ হয়ে যাবে।'

ভোদা সায় দিল, 'সবার আগে দেবাশিস তোমরা ফাঁসবে। আনাড়ি মালের সঙ্গে কাজ করার এই মুশকিল। আমার জেলখাটা অভ্যেস আছে। ও ঠিক বেরিয়ে আসব কয়েক মাসের মধ্যে। তুমি আর বিজন সারা জীবনের মতো ভোগে।'

পলু বলল, 'ভোদা ঠিক বলছে, একে বাঁচিয়ে রাখলে বিপদ।'

দেবাশিস এসব শুনে দিশেহারা তখন। অনুরাগের ছটফটানি, ভোদা-পলুর ভয় দেখানো, সব মিলিয়ে পাগল-পাগল অবস্থা। ঠিক, বাঁচিয়ে রেখে আর লাভ নেই, বলে দেবাশিসই প্রথমে চড়ে বসলেন অনুরাগের বুকের উপর। ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকিরাও। গলায় গামছা দিয়ে ফাঁস দিল ভোদা, পা চেপে ধরল পলু-গোপাল। ছটফটানি থেমে গেল অনুরাগের, অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই।

এবার? অনুরাগ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সাদা স্ট্রাইপড শার্ট আর খয়েরি ট্রাউজ়ার পরে। পায়ে ছিল চটি।

হাতে সোনার আংটি ছিল, গলায় সোনার চেন | সঙ্গে নিয়ে ছিল একটা ব্যাগ। যাতে ক্রিম রংয়ের শার্ট আর ট্রাউজার ছিল, শুটিং-এ ইস্ত্রি করা ভাল জামাকাপড় পরবে, সম্ভবত এই ভেবেই। কালো সানগ্লাস ছিল, ছিল একটা ক্যামেরাও। হলুদ রঙের টুপি ছিল ব্যাগে, একটা খাতা-পেনসিলও নিয়েছিল। যদি ডায়লগ টুকে রাখতে হয়, এমনটাই ভেবে ছিল হয়তো। একটা মানিব্যাগ ছিল পকেটে, ভিতরে একটা কুড়ি টাকার নোট। আর ছিল একপাতা ভিটামিন ক্যাপসুল, যা দাদুর কথায় খেত রুটিন মাফিক।

যা পরে ছিল অনুরাগ, জ্বালিয়ে দেওয়া হল সব। ব্যাগের শার্টপ্যান্ট নিলেন দেবাশিস, পরের দিন রেখে এলেন বিজনের বাড়িতে| ক্যামেরাটাও দেবাশিসই নিয়েছিলেন, বেচে দিয়েছিলেন পরে। বিক্রির টাকা ভাগ করে নিয়েছিলেন পল্লব আর বিজনের সঙ্গে। গোপাল নিল সানগ্লাস। ওষুধের পাতাটা পল্লব রেখে দিল পকেটে।

ভোদাই ব্যবস্থা করল দেহ লোপাটের। বস্তায় অনুরাগের দেহ ভরে বেঁধে ফেলল দড়ি দিয়ে। রাত গভীর হলে সবাই রওনা হল গঙ্গার ঘাটে, গলির গলি তস্য গলি দিয়ে, নুনগোলার পাঁচিল টপকে। ভোদাই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পায়ে চোট লাগল দেবাশিসের।

বস্তাবন্দি দেহ নিয়ে পলু ও গোপাল গঙ্গায় নামল। সাঁতরে কিছু দূর গিয়ে ভাসিয়ে দিল জলে। সেদিন ছিল চতুর্থী। দেবীর বোধনের আগেই পুজোর মরশুমে গঙ্গায় ভাসান হয়ে গেল নিরপরাধ এক কিশোরের, যে অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছিল দেবাশিস-বিজনকে।

পুলিশের কাছে তো বটেই, আদালতেও দেবাশিস—বিজন বারবার বলেছিলেন, অপহরণের পর হত্যার কোনও পরিকল্পনাই ছিল না তাঁদের। অনভিজ্ঞতা এবং ভয়ের যোগফলে ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু অনুরাগ জীবিতই নেই আর, এটা জেনেও এরপর ওঁরা দু'জন যা করেছিলেন, ক্ষমাহীন।

১৪ অক্টোবর, লিখেছি আগে, প্রথম ফোন গিয়েছিল আগরওয়ালদের বাড়িতে। ১৫ অক্টোবর সন্ধে সাতটা কুড়িতে টাকা হাতবদল হল। পাঁচ টাকার বিনিময়ে একটি স্থানীয় বাচ্চা ছেলেকে শিখিয়ে-পড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন দু'জনে, বসুশ্রীর সামনে দাঁড় করানো গাড়ি থেকে টাকা নিতে। টাকা এল, ভাগাভাগি হল। এবং দু'জনে ঠিক করলেন, ভোদা-পলু-গোপালকে বলবেন, টাকা আদৌ পাওয়াই যায়নি। ওদের ভাগ দেওয়ার দরকার নেই। ভোদা-বাহিনী অবশ্য অত সহজে মেনে নেওয়ার পাত্র ছিল না। সরাসরি হুমকি দিল, ওসব গালগল্প শুনিয়ে লাভ নেই। কালীপুজোর মধ্যে টাকা না পেলে দেবাশিস-বিজনের লাশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনুরাগের মতো দশা হবে।

ক্রমাগত হুমকিতে ভয়ই পেয়ে গেলেন দু'জন। ঠিক করলেন, আবার ফোন করবেন আগরওয়ালদের। ১৭ অক্টোবর থেকে ফোন করা শুরু হল। ততক্ষণে তদন্তে নেমে পড়েছে গোয়েন্দা দফতর। আগরওয়াল পরিবারও আঁচ পেয়ে গিয়েছে, বড়সড় গোলমাল আছে কোনও।

মোবাইল ফোন তখনও আসেনি এদেশে। এলে, এবং অভিযুক্তরা ব্যবহার করলে কিনারা করা অনেক সহজ হত। আগরওয়ালদের ল্যান্ডলাইনে আড়ি পাতা হল। 'মিস্টার গুপ্তের' ফোন তিন-চারদিন অন্তর আসতেই থাকল টাকার দাবি জানিয়ে। বক্তব্য, আশি হাজার পাইনি। কিন্তু আর আপনাদের বাড়ির ছেলেকে রাখতে চাই না। হাজার বিশেক দিলেই ছেড়ে দেব। দেবীলাল-শৈলেন্দ্র প্রতিবারই কথা বলতে চাইতেন অনুরাগের সঙ্গে। উলটোদিকের বাঁধাধরা উত্তর ছিল, টাকা পাওয়ার আগে কথা বলানো যাবে না। না পুলিশ, না আগরওয়াল পরিবার, কেউই তখনও জানে না, অনুরাগ আর বেঁচে নেই।

দাবি করা টাকার অঙ্ক কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কুড়ি থেকে নেমে এল পাঁচ হাজারে। পুলিশের পরামর্শ অনুযায়ী ফাঁদ পাতা হল। দেবীলাল জানালেন, তিনি রাজি। ফোনে নির্দেশ এল, ৩ নভেম্বর কালীঘাট মন্দিরের কাছে একটা ডাস্টবিনে কাগজের প্যাকেটে টাকাটা রেখে দিতে। ছেঁড়া কাগজে ভরতি প্যাকেট নিয়ে সকাল দশটায় ডাস্টবিনে প্যাকেট রেখে দিলেন শৈলেন্দ্র। সোয়া দশটায় দেবাশিস ডাস্টবিনের কাছাকাছি এলেন, তাকাচ্ছিলেন এদিক-ওদিক। সাদা পোশাকের পুলিশ কলার চেপে ধরল।

—আপনি মিস্টার গুপ্ত?

—না, মানে...

—অনুরাগ কোথায়?

—কে অনুরাগ?

একটি জোরদার থাপ্পড়ের প্রয়োজন হল, যা গালে পড়লে মিনিটতিনেক কানমাথা ভোঁ ভোঁ করার কথা। ওটুকুই যথেষ্ট ছিল।

—স্যার, আমি দেবাশিস ব্যানার্জি। অনুরাগকে মেরে ফেলেছি আমরা। আমি একা ছিলাম না।

বাকি যারা ছিল, বিজন-পল্লব-ভোদা-গোপাল, ধরা পড়ল কয়েকদিনের মধ্যেই। জেরায় সব স্বীকার করল অভিযুক্তরা। কিন্তু একটাই সমস্যা, অনুরাগের দেহ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। দেহ না পেলে মৃত্যু প্রমাণ করা দুরূহ | অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসা করা হল, একই স্বীকারোক্তি কি আদালতে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত? সবার আগে রাজি হলেন দেবাশিস।

এখানে একটু আইনের ব্যাখ্যা জরুরি। তফাতটা বোঝানো জরুরি, পুলিশের কাছে করা স্বীকারোক্তি আর আদালতে বিচারকের এজলাসে করা স্বীকারোক্তির। গ্রেফতারের পর পুলিশ ধৃতের মৌখিক স্বীকারোক্তির বয়ান লিপিবদ্ধ করতে পারে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬১ ধারায়। কিন্তু এই স্বীকারোক্তি প্রামাণ্য হিসেবে গ্রাহ্য নয় আদালতে, যতক্ষণ না তা অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। পরিভাষায়, corroborative evidence, সহায়ক প্রমাণ মাত্র, স্বতঃসিদ্ধ নয়। হতেই পারে, মেরেধরে ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করেছে পুলিশ। তাই এই আইনি রক্ষাকবচ।

আদালতে বিচারকের কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তির (judicial confession, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারা) প্রমাণমূল্য ঢের বেশি, এ প্রমাণমূল্য অকাট্য (substantive evidence), যদি সেটা হয় সত্যি এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। এবং যদি তার সাধারণ সমর্থন মেলে অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণে, সে সরাসরিই (direct evidence) হোক বা পারিপার্শ্বিক (circumstantial), শাস্তি একরকম অনিবার্যই |

কী করে বোঝা যাবে, আদালতে স্বীকারোক্তি পুলিশের চাপে কি না? সে বিধানও আছে আইনে। প্রাক্-স্বীকারোক্তি পালনীয় নিয়ম রয়েছে। যা মানতে হয় বিচারককে। প্রথামাফিক, পুলিশ পেশ করে আর্জি। জানায়, আদালতে স্বীকারোক্তিতে রাজি হয়েছে অভিযুক্ত। আবেদন গৃহীত হলে দিন স্থির হয় স্বীকারোক্তির। আদালতে অভিযুক্ত হাজির হলে কিছু বাঁধাধরা প্রশ্ন করেন বিচারক। নমুনা দেওয়া যাক।

'আপনি কি অমুক মামলায় দোষ স্বীকার করতে চান? করলে, কেন চান?

আমি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের লোক নই। আপনি কিন্তু আইনত দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নন আসামি হিসেবে। তবু যদি স্বীকার করেন, বিচারপর্বে সেই স্বীকারোক্তি আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে। এটা জানেন তো?

পুলিশ কি আপনাকে বলেছে যে দোষ স্বীকার করলে মামলা থেকে অব্যাহতি পাবেন বা সাজা কম হবে?

আপনি কি পুলিশের নির্দেশে বা চাপে পড়ে দোষ স্বীকার করতে এসেছেন? নির্ভয়ে বলুন।

আপনি এই মামলায় পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন আপনার প্রতি কি কোনও দৈহিক বা মানসিক অত্যাচার হয়েছে? দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন থাকলে দেখাতে পারেন।

আপনি দোষ স্বীকারে বাধ্য নন, আবার বলছি। তবু যদি চান স্বীকার করতে, চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি আবার ভেবে দেখার। তারপরও যদি স্বীকারোক্তি দিতে চান, লিপিবদ্ধ করব।

দেখতেই পাচ্ছেন, এজলাসে পুলিশ নেই। অনুরোধ, যা বলবেন, সত্যি বলবেন এবং স্বেচ্ছায় বলবেন। যদি স্বীকারোক্তির ব্যাপারে মত পরিবর্তন করেন, জানাবেন কাল, চব্বিশ ঘণ্টা ভেবে দেখার পর। আপনার মতই গ্রাহ্য হবে।'

উপরে যা যা পড়লেন, সবই দেবাশিসকে জিজ্ঞাসা করলেন বিচারক। দেবাশিস অনড় থাকলেন স্বীকারোক্তিতে। "কেন দোষ স্বীকার করছেন"— এর উত্তরে যা বললেন, হুবহু তুলে দিচ্ছি।

—পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে যে আমি যা করেছি তাতে বাইরের জগতে সবাই আমাকে ঘৃণা করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সাজা না পাই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছুতেই শান্তি পাব না। যখন আমাকে অ্যারেস্ট করে আমার বাড়ি নিয়ে যায়, তখন আমার মা বলেছিলেন, এর থেকে যদি মরার খবর শুনতাম তা হলে খুশি হতাম। আমি যা অন্যায় করেছি তার সাজা আমি পেতে চাই।

দেবাশিস শুধু নন, গোপাল এবং ভোদাও স্বীকারোক্তি দিল আদালতে।

তদন্তকারী অফিসার দুলালবাবু তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজটা করলেন অসামান্য। ঘটনাপ্রবাহ নিখুঁত উঠে এল চার্জশিটে। বিরল মামলা, শুরুতে লিখেছি। অপহরণ এবং হত্যার কেস অনেক হয়েছে এদেশে। আলোচ্য মামলা বিরল, কারণ দেহই পাওয়া যায়নি খুন হওয়া অপহৃতের। পুলিশি পরিভাষায়, 'corpus delicti', অর্থাৎ 'body of crime'-ই মেলেনি। লাতিন শব্দবন্ধ, সোজা বাংলায়, অপরাধ যে আদৌ ঘটেছে তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ। একজন নিখোঁজ হয়ে গেল এবং আর খুঁজে পাওয়া গেল না। দেহ না পাওয়া পর্যন্ত কী করে প্রমাণ হবে যে নিখোঁজ নিহত হয়েছে?

এই যুক্তিতেই তর্ক সাজালেন অভিযুক্তদের আইনজীবী।

'Corpus Delicti' ছাড়াই খুনের ঘটনা প্রমাণ এবং অপরাধীদের শাস্তিদানের নজির আছে অতীতে। খুব অল্পসংখ্যক মামলায়। তদন্তকারী অফিসারের পক্ষে কাজটা ছিল অসম্ভব কঠিন, অক্সিজেন মাস্ক ছাড়াই দুর্গম পাহাড়ে চড়ার মতোই। আদালতে দেবাশিস-ভোদা-গোপালের দেওয়া জবানবন্দি ছিল, কিন্তু শুধু তার ভিত্তিতে অপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত করতে প্রয়োজন ছিল ওই জবানবন্দির প্রতিটি দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন পারিপার্শ্বিক প্রমাণের (circumstantial evidence) মাধ্যমে নিখুঁত উপস্থাপনার। যাতে ঘটনার শুরু থেকে শেষ, ফাঁক না থাকে কোনও, বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় তর্কাতীত।

অনুরাগের ব্যাগ থেকে যা যা নিয়েছিল যে যে, উদ্ধার হল সব। ঘটনার দিন হাওড়ার লঞ্চঘাটে দেবাশিস ও বিজন যে এক কিশোরকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন বেশ কিছুক্ষণ, তার সমর্থন পাওয়া গেল এক প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে। তিনজনের ছবি জেটির সমস্ত কর্মীদের বারবার দেখানোর পর। বস্তাবন্দি দেহ নিয়ে চারজন যখন গঙ্গার পথে সে-রাতে, মাঝরাস্তায় দেখে ফেলেছিলেন একটি স্থানীয় গ্যারেজের দুই কর্মী। যাঁরা গাড়ি সারাচ্ছিলেন ল্যাম্পপোস্টের আলোয়। যাঁদের কৌতূহলী দৃষ্টি নজরে পড়ায় ভোদা ধমকেছিল, 'মুখ বাড়িয়ে দেখা বার করে দেব হারামজাদা! বেশি চালাক, না?' সেই দুই কর্মী বয়ান দিলেন।

বয়ান দিলেন দারোয়ান ভগবতীও, ধরে আনা হল বিহারের বাড়ি থেকে| যাকে ঘটনার পর ভোদা বলেছিল, 'তুনে বহুত কুছ দেখ লিয়া| ভাগ যা ইহাঁসে, নেহি তো খালাস কর দেঙ্গে।'

গুদামের ভিতর থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল বেশ কিছু পায়ের ছাপ, যার অধিকাংশই 'ডেভেলপ' করা যায়নি| কিছু অবশ্য 'ডেভেলপ' করা গিয়েছিল, যা মিলে গিয়েছিল দেবাশিসের পায়ের ছাপের সঙ্গে।

শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াও চলল বিচারপর্বে, আইনের ভাষার 'Test Identification Parade'। যাতে অংশ নিল অনুরাগের বন্ধু সমীর প্যাটেল, চিনিয়ে দিল মেট্রো স্টেশনে আলাপ হওয়া দেবাশিসকে। যে দোকানগুলি থেকে কেনা হয়েছিল লিউকোপ্লাস্ট, Pethidine এবং air purifier mask, তার কর্মচারীরাও শনাক্ত করলেন দেবাশিস-বিজনকে।

সিটি সেশনস কোর্টের বিচারক ৭৭ জন সাক্ষীর বয়ান নথিবদ্ধ করলেন। দেবাশিস-গোপাল-অশোকের আদালতে স্বীকারোক্তি এবং সমস্ত তথ্যপ্রমাণ বিবেচনা করে '৯১-এর ১৪ ডিসেম্বর রায় দিলেন। পাঁচ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা হল যাবজ্জীবন কারাবাসের। আবেদন দাখিল হল হাইকোর্টে। শুনানি চলাকালীনই, এগারো বছর কারাবাসের পর নিম্ন আদালত থেকে জামিন পেয়েছিল বিজন বড়ুয়া বাদে বাকি চারজন। সে জামিন নাকচ করে দিল হাইকোর্ট। যাবজ্জীবন কারাবাসের রায় বহাল রেখে আদালতে

আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ জারি হল জামিনে মুক্ত চারজনের উপর।

রায়ে বিচারপতিরা লিখলেন, "We are of the considered view that prosecution successfully established a complete chain of circumstances from its oral and documentary evidence which taken as a whole unerringly established the guilt of each and every appellant."

Robert Louis Stevenson তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস 'Kidnapped'-এ লিখছেন, "I have seen wicked men and fools, a great many of both; and I believe they both get paid in the end; but fools first." (দু'ধরনের লোকই দেখেছি আমি। শয়তান আর বোকা, দুই-ই দেখেছি অনেক| উভয়কেই মূল্য চোকাতে হয়। তবে আগে বোকাদের)|

ঠিকই। অপরাধীরা শয়তানের প্রতিরূপ তো ছিলই, না হলে তরতাজা এক কিশোরকে ওভাবে খুন করে ভাসিয়ে দেওয়া যায় গঙ্গাবক্ষে? তবে তার চেয়েও বেশি বোকা ছিলেন দেবাশিস-বিজন| যদি প্রথম বারের মুক্তিপণের টাকায় সন্তুষ্ট থাকতেন, আশি হাজার পাওয়ার পরও বেসামাল লোভে যদি আর ফোন না করতেন আগরওয়াল পরিবারে, ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল শূন্য। কে ধরত, কীভাবে ধরত, সূত্র পেত কোথায়? খুনের চিত্রনাট্য-সংলাপ-পরিচালনা অজানাই থেকে যেত, পুলিশও একটা সময় উৎসাহ হারিয়ে ফেলত কূলকিনারা না পেয়ে, অদৃষ্টকে শাপশাপান্ত করা ছাড়া আর কী-ই বা করার থাকত অনুরাগের আত্মীয়-পরিজনের, আর দিব্যি ঘুরে বেড়াত খুনিরা। নিরাপদে, নিরুপদ্রবে।

এমনই হয়। কখনও অতিচালাকি, কখনও অতিলোভ কাল হয়ে দাঁড়ায় অপরাধীর।

ধর্মের কল। বাতাসে তো নড়বেই।

করুণাধারায় এসো

এমন তো হওয়ার কথা নয়, আগে কখনও হয়নি!

সকাল সাড়ে আটটা হবে তখন। রোজকার মতো প্রতিবেশী দম্পতির ফ্ল্যাটের বেল বাজালেন মিস্টার খেতওয়াত। অন্যদিন একবার বাজালেই হয় মিস্টার নওলাখা দরজা খুলে দেন, নয় মিসেস নওলাখা। সকালের চা-বিস্কুট প্রায় রোজই নওলাখা পরিবারের সঙ্গেই খান যুগলকিশোর খেতওয়াত। বছরভর একই রুটিন। এদিন হঠাৎ অন্যথা, টানা বেল বাজিয়ে গেলেও কোনও সাড়াশব্দ নেই কেন? কী এমন হল? শরীর খারাপ? যদি হয়-ও, একসঙ্গে দু'জনের? নাহ্, গোলমাল লাগছে।

সাধারণত পৌনে ন'টা থেকে ন'টার মধ্যে রোজকার গৃহকর্মীরা চলে আসেন নওলাখা-দম্পতির ফ্ল্যাটে। সবার আগে আসেন প্রতিমা। দীর্ঘদিন কাজ করছেন এ বাড়িতে, খুবই বিশ্বাসী। ফ্ল্যাটের একটি ডুপ্লিকেট চাবিও তাঁর কাছে রাখা থাকে, কখনও যদি মালিক-মালকিনের অনুপস্থিতিতে জরুরি প্রয়োজন হয় ঘর খোলার।

প্রতিমা এলেন, দরজার বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন উদ্বিগ্ন মিস্টার খেতওয়াত। আর এক প্রস্থ বেল বাজানোতেও যখন দরজা খুলল না, ব্যবহার করা হল ডুপ্লিকেট চাবি। ভিতরের দৃশ্য মর্মান্তিক, বীভৎসও বলা চলে। পুলিশে খবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে মিনিটখানেকও লাগল না অন্য আবাসিকদের।

ভবানীপুর থানার ঘটনা, প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে। কেস নম্বর ৫৬৩, তারিখ ২৫/১২ /৯১, ধারা ১২০ বি/ ৩০২/ ৩৯৪ /৩৪ আইপিসি। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, খুন, লুঠ করতে গিয়ে ইচ্ছাকৃত কাউকে আঘাত করা এবং একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা।

শরৎ বোস রোডের উপর এগারো তলার অভিজাত বহুতল 'রামেশ্বর অ্যাপার্টমেন্টস'। সেন্ট জনস ডায়াসেশন স্কুলের লাগোয়াই প্রায়। দশতলায় ফ্ল্যাট নম্বর ১০সি-তে থাকতেন নওলাখা-দম্পতি। যাঁদের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল দরজা খোলার পর। প্রশস্ত ফ্ল্যাট, ঢুকেই একটা বড় হলঘর। দুটো বেডরুম, অ্যাটাচড বাথ সহ। একটা গেস্টরুম। রান্নাঘর যেমন থাকে তেমন। হলঘরের একটা দিক ডাইনিং রুম হিসেবে ব্যবহার হত। আর এক কোণায় ছোট্ট একফালি জায়গায় পার্টিশন করে লাইব্রেরি-কাম-স্টাডিরুম। সম্পন্ন পরিবারে যেমন হয়, ফ্ল্যাট জুড়ে দামি আসবাবপত্র সাজানো-গোছানো পরিপাটি।

গিরিশকুমার নওলাখার (৫৯) নিথর দেহ পড়ে আছে স্টাডিরুমের কার্পেটের উপর। পাজামা-পাঞ্জাবি শরীরে। গলায় একটি দামি শাল দিয়ে ফাঁস দেওয়া। নাকমুখ দিয়ে চুঁইয়ে পড়েছে রক্তবিন্দু। সন্দেহ নেই কোনও, শ্বাসরোধ করে খুন। একজোড়া পুরনো ফুটিফাটা চপ্পল, যা দৃশ্যতই গিরিশবাবুর হতে পারে না, পড়ে আছে মৃতদেহের পাশে। একটু দূরে একটি খালি গ্লাস।

বীণা নওলাখার (৫৫) প্রাণহীন দেহ দুটি বেডরুমের একটিতে, পড়ে আছেন উপুড় হয়ে। প্রায় বিবস্ত্রা, রাতপোশাকটি ছিন্নভিন্ন। চোখেমুখে আঘাতের চিহ্ন, রক্তপাতও হয়েছে একটু। পেটের নীচে একটি বালিশ। গলায় শাড়ি দিয়ে ফাঁস দেওয়ার চেষ্টা করেছে আততায়ী বা আততায়ীরা। শাড়ির একটি প্রান্ত গলায় জড়ানো, অন্যপ্রান্ত বাঁধা সিলিংফ্যানে। মৃতার হাউসকোট ভাসছে লাগোয়া বাথরুমের কমোডে। হলঘরের টেলিফোন এবং ইন্টারকম সংযোগ-বিচ্ছিন্ন, তার কেটে দিয়েছে যে বা যারা ঢুকেছিল।

এক পুত্র এবং এক কন্যা ছিল নওলাখা-দম্পতির। কন্যা থাকেন ইন্দোরের শ্বশুরবাড়িতে। পুত্র নীলেশ আর পুত্রবধূ অনুরাধা ১১ ডিসেম্বর বেড়াতে গিয়েছিলেন উত্তর ভারতে। ফেরার কথা ছিল ২৪ তারিখ। ফোন করে দিনদুয়েক আগে মা-বাবাকে জানিয়েছিলেন, প্লেনের টিকিট না পাওয়ায় ২৬ তারিখ ফিরবেন। সস্ত্রীক নীলেশ যে ঘরটিতে থাকতেন, সেটি অক্ষত, তালাবন্ধ।

বাকি ঘরগুলি অবশ্য অক্ষত ছিল না। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আসবাবপত্র। ভেঙে তছনছ করা হয়েছে গেস্টরুমের কাঠের আলমারিটি। ইতস্তত পড়ে আছে কাঠের টুকরোটাকরা। বেশ কিছু জিনিসপত্র যে লুঠ হয়েছে, অনায়াসে অনুমেয়।

কেসের তারিখটি শুরুতে লিখেছি, খেয়াল করবেন। ২৫/১২/ ৯১। বড়দিনের সকাল। ক্রিসমাস ইভের নিশিযাপন শেষে একটু দেরি করে ঘুম ভাঙছে কলকাতার। রাস্তাঘাটে মানুষজন, গাড়িঘোড়া কম। দেরি আছে ভিক্টোরিয়া-চিড়িয়াখানা-পার্ক স্ট্রিটে-রেস্তোরাঁ-ক্লাবে জনপ্লাবন শুরু হতে।

দম্পতি-হত্যার জেরে শুভদিনের সকাল অশুভ হয়ে দেখা দিল কলকাতা পুলিশের কাছে। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তৎকালীন নগরপাল, খবর পেয়ে দ্রুত এলেন ঘটনাস্থলে। এলেন ডিসি ডিডি (গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান)। ভবানীপুর থানার পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইড শাখার অফিসারেরা ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছেন। লালবাজার কন্ট্রোল রুম খবর পাওয়া মাত্র সংশ্লিষ্ট সবাইকে বার্তা দিয়েছে দ্রুত, “couple found murdered in Sarat Bose Road apartment, reach the spot at the earliest.”

কৌতূহলী জনতার লাগামছাড়া ভিড় তখন অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে, সামাল দিতে গলদঘর্ম পুলিশ। জটিল কেসে যা সচরাচর হয় কলকাতা পুলিশে, প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে স্থানীয় থানার পুলিশ। গুরুত্ব বুঝে কখনও রহস্যভেদের দায়িত্ব দেওয়া হয় গোয়েন্দা বিভাগকে, কখনও থানার অফিসাররাই তদন্ত চালান। নগরপাল অকুস্থলে দাঁড়িয়েই সিদ্ধান্ত নিলেন, এই জোড়া খুনের তদন্ত করবে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। হোমিসাইড শাখার তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর সুজিত মিত্র তদন্তকারী অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হলেন।

গিরিশবাবুর দেহের পাশে পড়ে থাকা চপ্পল আর গ্লাস, বীণাদেবীর হাউসকোট, ভাঙা আলমারির কাঠের টুকরো এবং ঘটনাস্থলের ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পিছনের আদ্যোপান্ত খানাতল্লাশি করে তৈরি হল বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর নথি। পুলিশি পরিভাষায় ‘seizure list’। মোটামুটি ‘ডেভেলপ’ করার যোগ্য হাতের আর পায়ের ছাপ পাওয়া গেল কিছু, বিভিন্ন মাপের। সংগ্রহ করা হল সযত্নে। লুঠ এবং জোড়া খুনে যে একাধিক ব্যক্তি জড়িত, সেই ধারণা বদ্ধমূল হল গোয়েন্দাদের। খুনি কে বা কারা, সে-সূত্র অবশ্য তখন পর্যন্ত অধরাই।

এখানে ‘রামেশ্বর অ্যাপার্টমেন্টস’-এর একটু বিবরণ প্রয়োজন। ১৯এ, শরৎ বোস রোডের বহুতলটি তৈরি করেছিলেন যুগলকিশোর খেতওয়াত সাতের দশকের শেষাশেষি। খেতওয়াত পরিবারের নানাবিধ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ছিল, তবে গৃহনির্মাণ আর পরিবহণ-ব্যবসাই প্রধান। নিজে সপরিবারে থাকতেন ডুপ্লে ফ্ল্যাটে, দশতলার ১০এ আর এগারোতলার ১১এ মিলিয়ে। একতলায় যুগলকিশোর আর তাঁর ভাই প্রহ্লাদের আলাদা দুটি অফিস ছিল। যথাক্রমে রামেশ্বর ট্রান্সপোর্ট লিমিটেড এবং ভারত রোডওয়েজ় লিমিটেড। আর ছিল রিসেপশন সেন্টার, কেয়ারটেকারের অফিস এবং একটি কমিউনিটি হল। দুই থেকে দশ, অন্য প্রতিটি তলায় চারটি করে আবাসিক ফ্ল্যাট।

আবাসিকরা সকলেই অর্থবান ছিলেন, সুরক্ষা-সতর্কতায় কার্পণ্য করেননি একটুও। উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা প্রাঙ্গণ, লোহার সূচিমুখ শলাকা পাঁচিল বরাবর। দুটি গেট বাইরে। একটি ঢোকার, অন্যটি বেরনোর। ভিতরেও মজবুত নিরাপত্তা। দুটি সিঁড়ি, একটি আবাসিকরা ব্যবহার করেন, অন্যটি ফ্ল্যাটগুলির স্থায়ী বা অস্থায়ী কাজের লোক, সাফাইকর্মী, ড্রাইভার, দুধওয়ালা, খবরের কাগজ দেওয়ার লোক ইত্যাদি। দুটি স্বয়ংক্রিয় লিফট, সেখানেও একই নিয়ম। আবাসিকদের জন্য একটি, বাকিদের অন্যটি।

সুরক্ষা নিশ্ছিদ্র করতে বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আবাসিকরা। National Security and Detective Agency-র উর্দিধারী রক্ষীরা তিন শিফটে পাহারায় থাকতেন চব্বিশ ঘণ্টা। ঢোকা-বেরনোর গেটে তো বটেই, বেসমেন্টের পার্কিং স্পেসে এবং একতলার রিসেপশনে সতর্ক প্রহরা ছিল। ইন্টারকমে রিসেপশনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল প্রতিটি ফ্ল্যাটের।

নিয়ম ছিল, পরিচিত আবাসিক বা কর্মী অ্যাপার্টমেন্টের সিঁড়ি বা লিফটে উঠলে নিরাপত্তারক্ষীরা কোনওরকম বাধা দেবেন না। পরিচিতের সঙ্গে অপরিচিত কেউ থাকলেও নয়। সম্পূর্ণ অপরিচিত কেউ ঢুকলে আটকানো হবে রিসেপশনে। নাম কী, কোন ফ্ল্যাটে যেতে চান, কী প্রয়োজন ইত্যাদি জেনে ইন্টারকমে যোগাযোগ করা হবে সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটে। সবুজ সংকেত পেলে তবেই লিফট বা সিঁড়িতে ওঠার অনুমতি মিলবে। প্রতিটি ফ্ল্যাটে ছিল ইয়েল লক, আইহোল আর কলিং বেল।

এত কিছু, তবু খুন হয়ে গেলেন নওলাখা-দম্পতি! আজকের নিরিখে ভাবলে মনে হয়, সবই ছিল, শুধু সিসিটিভি-র ব্যবস্থাটা যদি থাকত! এখন শুধু অভিজাত এলাকায় বা ঝাঁ-চকচকে শপিং মলেই নয়, সিসিটিভি লাগানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ছোট-বড় অসংখ্য আবাসনে ক্যামেরা লাগিয়েছেন নিরাপত্তা-সচেতন শহরবাসী। এতে অপরাধীকে চিহ্নিত করতে সুবিধে হয় আমাদের, ক্যামেরা আছে আন্দাজ করতে পারলে অবচেতনে একটা ভয়ও কাজ করে দুষ্কৃতীদের। এই সুবিধেটা থাকলে আলোচ্য জোড়া খুনের কিনারা নিশ্চিত সহজতর হত, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হত না গোয়েন্দাদের।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলার পর্বে ঢোকার আগে বলে নেওয়া ভাল, দু'তলা থেকে দশতলা, স্থায়ী গৃহকর্মীদের জন্য কোয়ার্টার ছিল প্রতি ফ্লোরেই। দশতলায় চারটি ফ্ল্যাটে ১০সি-র নওলাখা পরিবার ছাড়া থাকতেন ১০এ-তে খেতওয়াতরা, ১০বি আর ১০ডি-তে যথাক্রমে রাজেশ মেহতা আর দীপক মোঘানির পরিবার। নওলাখাদের তিনজন স্থায়ী কাজের লোক ছিলেন। প্রতিমা, যাঁর কথা শুরুতে বলেছি, মনিকা এবং শম্ভু। তিনজনই নির্দিষ্ট কোয়ার্টারে থাকতেন দশতলাতেই।

ময়নাতদন্ত সাঙ্গ হল বড়দিনের বিকেলেই। শ্বাসরোধ করেই খুন। দম্পতির মৃত্যুর আনুমানিক সময় রাত ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে।

জিজ্ঞাসাবাদ দিয়ে শুরু হল তদন্ত। গিরিশবাবু বা বীণাদেবী, যে-ই দরজা খুলে থাকুন, পরিচিত না হলে নিশ্চয়ই খুলতেন না। আইহোলে দেখেছেন চেনা মুখ, অতএব খুলেছেন। সে বাসিন্দাই হন বা কর্মী, আবাসিকের কারও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী অপরাধের নেপথ্যে। পুলিশি পরিভাষায় যাকে বলে 'insider job'। ৩৬টি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা, যাঁরা সে-রাত্রে ছিলেন বা ছিলেন না, সমস্ত স্থায়ী-অস্থায়ী গৃহকর্মী, বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাটির লোকজন, জেরা থেকে বাদ গেলেন না কেউ। চলল বড়দিনের রাতভর, তার পরের দিনও লাগাতার। কিন্তু বিধি বাম, শত চেষ্টাতেও ভরসাযোগ্য সূত্র মিলল না। কেউ স্বীকার করলেন না কিছু, এগোনোর মতো খড়কুটোও এল না হাতে। কেউ না কেউ মিথ্যে বা অর্ধসত্য বলছিলেন, এটা আন্দাজ করা যাচ্ছিল। কিন্তু প্রমাণহীন আন্দাজ খুনের তদন্তে মূল্যহীন।

প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল ঘটনার, অন্ধকারে ঢিল ছোড়াতেই তখনও আটকে আছে তদন্ত। পুলিশি ব্যর্থতা নিয়ে মিডিয়ায় চলতে থাকল কাটাছেঁড়া, যেমনটা হয়ে থাকে। পুলিশ পি সি সরকার নয়, জাদুদণ্ড নেই কোনও রাতারাতি কিনারার, সেটা ভুলে গিয়েই।

বর্তমান সময়ে তদন্তের একটা সুবিধে আছে। প্রযুক্তির সুবিধে, 'electronic surveillance' -এর সুবিধে। মোবাইল ফোনের সূত্রে অনেক অপরাধের কিনারা হয়, সকলেই জানেন। দুর্ভাগ্য, ঘটনা ১৯৯১-এর, এদেশে মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুরু যার চার বছর পর।

'যেটা ছিল না ছিল না, সেটা না পাওয়াই থাক' ধরে নিয়েই সে-সময়ে এগোতে হত গোয়েন্দাদের। কত যে অপরাধের কিনারা হয়েছে স্রেফ নিবিড় 'সোর্সওয়ার্ক' দিয়ে আট আর নয়ের দশকে, তালিকা শেষ করা যাবে না লিখে।

সোর্স বড় বিষম বস্তু পুলিশি দুনিয়ায়। ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারলে নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ অবধারিত, না পারলে লবডঙ্কা। অপরাধ জগতের খবর কোনও সাধু-সন্ন্যাসী দেবেন না, দেবে অপরাধীরাই, যাদের নিত্য বিচরণ অন্ধকার জগতের অভ্যন্তরে। লালমোহনবাবুকে মনে পড়ছে লিখতে গিয়ে। প্রদোষচন্দ্র মিত্রের উদ্দেশে বলেছিলেন, "আপনাকে তো কাল্টিভেট করতে হচ্ছে মশাই।" সোর্স অবশ্য শুধু 'কাল্টিভেট' করলেই হয় না, 'নার্চার'-ও করতে হয়। সোর্স লালন করাটাও এক বিশেষ শৈলী, সবাই পারেন না। যাঁরা পারেন, রহস্যভেদে তাঁরা এগিয়ে থাকেন। কিছু সতর্কতাও নিতে হয় সোর্স ব্যবহারে। সোর্সের মধ্যেই ভূত যাতে তৈরি না হয়ে যায়, সেটা খেয়াল রাখতে হয়। সোর্স আদৌ খাটাখাটনি করছে কি না, অফিসারের মন রাখতে গাঁজাখুরি গল্প শোনাচ্ছে কি না, নজরে রাখতে হয় তা-ও। কখনও কখনও সোর্সের পিছনে লাগানো হয় দ্বিতীয় সোর্স!

সত্যিটা স্বীকার করা যাক, গল্পের ফেলুদা-ব্যোমকেশ-এরকুল পোয়ারো-শার্লক হোমসের রহস্যভেদের রোমাঞ্চ-রোম্যান্স বাস্তবের তদন্তে থাকে কদাচিৎ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনাস্থলে আধপোড়া সিগারেটের টুকরো থাকে না, থাকে না বাগানের ঝোপঝাড়ের কাদায় পায়ের ছাপ, থাকে না হুমকি-চিরকুট বা সমগোত্রীয় কিছু। সূত্র কিছুতেই না মিললে ভরসা করতে হয় সোর্সের উপর। কল্পনার গোয়েন্দা গল্প খুবই উপভোগ্য, গোগ্রাসে গেলার মতো। বাস্তবের তদন্ত কিন্তু ভিন্ন, অন্তত নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে। প্রতি পদে উত্তেজনার আঁচ পোহানো নেই, নির্মোহ পরিশ্রম আছে। রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ নেই, আপ্রাণ অধ্যবসায় আছে। আপন মনের মাধুরী নেই, মরিয়া একাগ্রতা আছে। নির্মাণের জগৎ মূলত, সৃষ্টির নয় ততটা।

তদন্তে ফিরি। সোর্স লাগানো হল একাধিক, প্রত্যেকে পোড়খাওয়া। বলে দেওয়া হল দুটো কথা। এক, জোড়া খুন নিয়ে অপরাধ-জগতে কিছু কানাকানি হচ্ছে কি না, খবর চাই। দুই, খোঁজখবর দরকার। অন্ধকার দুনিয়ার হোক বা না-হোক, আশেপাশের মহল্লায় কেউ কি হঠাৎ বেশি টাকা খরচ করছে? জীবনযাত্রায় চোখে পড়ার মতো বদল এসেছে কারও? মোদ্দা কথা, 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই। পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন'। এবং দ্রুত পাওয়াও গেল বহুপ্রতীক্ষিত সূত্র। সৌজন্য, তদন্তকারী অফিসারের দুর্ধর্ষ সোর্স নেটওয়ার্ক। খবর এল ২৭ তারিখ গভীর রাত্রে।

পদ্মপুকুরের কাছাকাছি এক ঠেকে মদ-জুয়ার আসর চলছে। যেখানে জাঁকিয়ে বসেছে 'সোর্স'। এই ঠেকে তার দীর্ঘদিনের যাতায়াত। এসব আড্ডায় মোটামুটি সবাই সবার পরিচিতই হয় সচরাচর। সে-রাতের মোচ্ছবে মধ্যমণি এক অপরিচিত যুবক, জুয়ার বোর্ডে টাকা ওড়াচ্ছে দেদার। নতুন কেনা দামি ইয়াশিকা ইলেকট্রো-৩৫ ক্যামেরা দেখাচ্ছে বাকিদের। কিনে এনেছে বিলিতি মদের বোতল, ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। নেশা চড়তেই জড়ানো গলায় হিন্দি গান, ঘুরেফিরে একটাই বারবার, "তদবির সে বিগড়ি হুয়ি তকদির বানা লে, তকদির বানা লে/ আপনে পে ভরোসা হ্যায় তো ইয়ে দাঁও লাগা লে, লাগা লে দাঁও লাগা লে..."। ১৯৫১-য় মুক্তিপ্রাপ্ত গুরু দত্ত পরিচালিত সুপারহিট ছবি 'বাজি'-র সেই সুপারহিট গান। শচীন দেববর্মণের সুরে গীতা বালির লিপে গীতা দত্তের সেই আশ্চর্য জাদুকরী কণ্ঠে।

গানে অবশ্য সোর্সের মন ছিল না, রুচিও না। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ততক্ষণে সজাগ, এই চ্যাংড়া-টাইপ ছেলেটা এত টাকা পেল কী করে? আর এক পেগ বানানোর মাঝে নেহাতই হালকা চালে প্রশ্ন ছুড়ে দিল অপরিচিত যুবককে, 'এখানে নতুন দেখছি, কী কাজ করো গুরু তুমি?' যুবক ততক্ষণে নিরাপদ রকমের মাতাল, উত্তরও দিল হালকা চালেই, 'পিয়নের কাজ করি বড়লোকের বাড়ি, ও কাজ আর করব না শালা!'

সোর্স-মারফত খবর পেয়ে সেই রাতেই তোলা হল 'বড়লোকের বাড়ির পিয়নকে'। অপরাধ-জগতে কথিত আছে, লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্টারোগেশন রুমে ঢুকলে সমস্ত রকম নেশা নিমেষে কেটে যায়। আকণ্ঠ মদ্যপান করে এলেও সংবিৎ ফিরতে সময় লাগে না বিশেষ। নতুন অতিথির ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না। 'আদরযত্ন' করার আগেই স্বীকারোক্তি এল স্বতঃস্ফূর্ত, 'স্যার, আমি খোকন গিরি, খেতওয়াত সাহেবের অফিসে পিয়নের কাজ করি। খুন আমি একা করিনি। রাজু, কামিনী আর জগদীশও ছিল স্যার।'

—বেশ, পুরোটা বল এবার, কীভাবে করলি, কেন করলি?

উত্তরে খোকনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া মুহূর্তের জন্য বাক্‌রুদ্ধ করে দিল দুঁদে গোয়েন্দাদেরও,

—লোভে পড়ে করেছি, খুন করার জন্য ম্যাডাম এক লাখ টাকা দেবেন বলেছিলেন।

—ম্যাডাম!! কোন ম্যাডাম?

—বিমলা ম্যাডাম, খেতওয়াত সাহেবের স্ত্রী।

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে জেরা শুরু হল খোকনকে। জানা গেল, যা ঘটেছিল, যেভাবে ঘটেছিল, যে কারণে ঘটেছিল।

খেতওয়াত পরিবার ও নওলাখা পরিবারের সামাজিক পরিচয় আটের দশকের শুরু থেকেই। নওলাখারা তখন থাকতেন বালিগঞ্জের মুলেন স্ট্রিটে। একসঙ্গে বাইরে খাওয়াদাওয়া, উৎসব-উদ্‌যাপন, ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল ক্রমশ। বিমলা খেতওয়াত এসব পছন্দ করতেন না। অন্তর্মুখী স্বভাবের মহিলা ছিলেন, একটু রক্ষণশীল মানসিকতারও। পুজো-আর্চা ঘর-সংসারেই বেশি স্বচ্ছন্দ। নওলাখা-দম্পতি আবার জীবনকে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগে বিশ্বাসী, ক্লাব-পার্টিতে যাতায়াত নিয়মিত। যুগলকিশোর খেতওয়াতও তা-ই, হইহুল্লোড় তাঁরও মনপসন্দ।

নিয়মিত সামাজিক মেলামেশা চলতে চলতেই যুগলকিশোর আকৃষ্ট হলেন বীণা নওলাখার প্রতি। একতরফা ছিল না আকর্ষণ, বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয়ে সম্মতি ছিল বীণারও। দু'জনেই তখন মধ্যচল্লিশ। বালিগঞ্জের বাড়ি বেচে ১৯৮৬-তে রামেশ্বর অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এলেন নওলাখারা। প্রণয়িনীকে প্রতিবেশিনী হিসেবে পাওয়ার তাগিদে জলের দরে দশতলার ফ্ল্যাটটি বেচলেন যুগলকিশোর। গিরিশ-বীণা দু'জনেই বেসরকারি সংস্থার উচ্চপদস্থ চাকুরে ছিলেন। স্বচ্ছলতা ছিল, কিন্তু ওই বহুতলে ফ্ল্যাট কেনাটা ছিল সামর্থ্যের বাইরে। গিরিশ নির্বোধ ছিলেন না, কেন সস্তায় ফ্ল্যাট দিচ্ছেন খেতওয়াত সাহেব, বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। সম্ভবত পারিবারিক শান্তির কারণেই সব জেনেও মেনে নিয়েছিলেন, মানিয়েও নিয়েছিলেন।

মেনে নিতে পারেননি বিমলা খেতওয়াত, মানিয়ে নিতেও না। পরকীয়া থেকে স্বামীকে দূরে সরিয়ে আনতে চেষ্টার কসুর করেননি। ঝগড়া করেছেন স্বামীর সঙ্গে, প্রবল অশান্তি হয়েছে দিনের পর দিন, ঘরে ওঝা ডাকিয়ে তন্ত্রমন্ত্রেরও শরণ নিয়েছেন মরিয়া হয়ে। লাভ হয়নি কোনও। যুগলকিশোরের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বেড়েছে মিসেস নওলাখার সঙ্গে। রোজ সকালে নওলাখাদের বাড়িতে চা-বিস্কুট, সন্ধেবেলা তাস-আড্ডা-মদ্যপান, চোখের সামনে দেখতে দেখতে একটা সময় প্রায় অসুস্থই হয়ে পড়েন বিমলা। খেতওয়াতদের একমাত্র পুত্র অনিল চাকুরিজীবী, নিজেকে নিয়ে থাকতেন। মা-বাবার দাম্পত্য অশান্তির ব্যাপারে ছিলেন চূড়ান্ত উদাসীন।

'নারীচরিত্র দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা।' মানসিক অশান্তিতে নিত্যদিন ক্ষতবিক্ষত হতে থাকা বিমলা ঠিক করলেন, পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেবেন নওলাখা-দম্পতিকে। বীণার প্রতি আক্রোশ সহজবোধ্য। গিরিশের উপর তীব্র রাগ পরকীয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি একা অশক্ত মহিলা, কাজটা করবে কে?

বিমলা ডেকে পাঠালেন খোকনকে। খেতওয়াতদের কোম্পানির দীর্ঘদিনের পিয়ন খোকন গিরি। একতলার অফিসে থাকে। প্রায় রোজই আসে ফ্ল্যাটে, খোকনের হাত দিয়ে খামভরতি টাকা বীণার কাছে মাঝেমাঝেই পাঠান যুগলকিশোর। বিমলা প্রস্তাব দিলেন, গিরিশ-বীণাকে খুনের বিনিময়ে এক লক্ষ টাকা দেবেন, চল্লিশ হাজার অগ্রিম। প্রথমে গররাজি ছিল খোকন, সে তো আর পেশাদার খুনি নয় যে 'সুপারি' নিয়ে মানুষ মারবে। বিমলা টাকার লোভ দেখাতেই থাকলেন, হাতে ধরিয়ে দিলেন নগদ চল্লিশ হাজার। মাথা ঘুরে গেল খোকনের। সে-সময়ে এক লাখ মানে অনেক টাকা। পিয়নের চাকরি ছেড়ে নিজের ছোটখাটো ব্যবসা চালু করার পক্ষে যথেষ্টেরও বেশি।

খোকন রাজি হয়ে গেল। একা মুশকিল হবে, শুরু করল সঙ্গীসাথি জোটানোর কাজ। কাঁচা টাকার লোভ বড় সাংঘাতিক, জুটেও গেল তিন শাগরেদ। রঞ্জিত রাও ওরফে রাজু, একসময় খেতওয়াতদের গাড়ি চালাত। চাকরি ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন অন্য বেসরকারি সংস্থার গাড়ি চালিয়েছিল। তারপর আবার ফিরে এসে রামেশ্বর অ্যাপার্টমেন্টের-ই ৭ডি-র বাসিন্দা ওমপ্রকাশ ভুয়ানিয়ার ড্রাইভারের চাকরি নিয়েছিল। খোকন-রাজুর সঙ্গে যোগ দিল জগদীশ যাদব, মিস্টার খেতওয়াতের অফিসের সাফাইকর্মী। জগদীশই জোটাল কুকর্মের চতুর্থ শরিককে। কামিনীকুমার রায়, দক্ষিণ কলকাতার একটি গ্যারেজের কর্মী। চুক্তি হল, কাজ শেষ হলে প্রত্যেকে পাবে পঁচিশ হাজার করে। অগ্রিমের টাকা থেকে দশ হাজার করে ভাগ হল। দুটো দামি ইয়াশিকা ক্যামেরা কিনে ফেলল খোকন আর রাজু। কামিনী কিনল দামি সুটকেস।

খুনের ঘটনাপ্রবাহ ছিল এরকম। মনে রাখুন, ক্রিস্টমাস ইভের রাত। গমগম করছে বহুতল-প্রাঙ্গণ। গাড়ির স্রোত সন্ধে থেকেই, ঢুকছে-বেরচ্ছে। কেউ পার্টিতে যাচ্ছেন, কারও আবার বাড়িতেই উৎসবের আয়োজন। অতিথিদের অবিরাম আনাগোনা। কর্মীরাও উঠছেন-নামছেন সর্বক্ষণ। দিনটা ভেবেচিন্তেই বেছে ছিল খোকনরা। নওলাখাদের পুত্র-পুত্রবধূ যে ২৪ নয়, ২৬ তারিখে ফিরবেন, সে-খবর বিমলা আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন খোকনকে।

খোকন, রাজু এবং জগদীশ নিরাপত্তারক্ষীদের বহুদিনের পূর্বপরিচিত কর্মী। অপরিচিত বলতে কামিনী। যাকে সঙ্গে নিয়ে রাজু ন'টা নাগাদ উঠে গেল নিজের সাততলার কোয়ার্টারে, যা বরাদ্দ গৃহকর্মীদের জন্য। নিয়ম অনুযায়ী, রিসেপশনের রক্ষীরা আটকাল না। জগদীশ গেল একটু পরে, যোগ দিল রাজু আর কামিনীর সঙ্গে।

বিমলা খেতওয়াত ঠিক সাড়ে ন'টা নাগাদ বেল বাজালেন নওলাখাদের ফ্ল্যাটে। দরজা খুললেন বীণা নওলাখা। বিমলা বললেন, তাঁর স্বামী বোধহয় সকালে পানপরাগের কৌটোটা ফেলে গিয়েছেন, বাড়িতে খুঁজে পাচ্ছেন না,একটু যদি দেখা যায়। বীণা দেখেশুনে জানালেন, 'না, এখানে তো নেই।' ততক্ষণে বিমলার যা দেখার ছিল, দেখা হয়ে গিয়েছে। নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন, বাড়ির গৃহকর্মীরা কেউ নেই। প্রতিমা-মনিকা-শম্ভু কাজ শেষ করে বেরিয়ে গিয়েছে।

খোকন অপেক্ষা করছিল বিমলার নির্দেশমতো, নীচে ইন্টারকমের কাছে। ঠিক দশটায় বিমলার ফোন আসার কথা। যথাসময়ে ফোন এল। বিমলা জানালেন, লাইন ক্লিয়ার, এটাই মোক্ষম সময়। যুগলকিশোর ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পুত্র অনিল বেরিয়েছে পার্টিতে, রাত হবে ফিরতে।

খোকন সিঁড়ি দিয়ে সাততলায় উঠল, ডেকে নিল রাজু-জগদীশ-কামিনীকে। একটি বড় ব্যাগে সঙ্গে ছিল লোহার ব্লেড, শাবল ইত্যাদি। দশটা পাঁচে বেল বাজল নওলাখাদের ১০সি-র ফ্ল্যাটে। গিরিশ নওলাখা আইহোল দিয়ে দেখলেন খোকনকে, বহুদিনের পরিচিত মুখ। খুলে দিলেন দরজা, ঝাঁপিয়ে পড়ল খোকন আর দলবল। প্রতিরোধ ব্যর্থ হল গিরিশের। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ছিলেন, শাল ছিল গায়ে। ওই শালই গলায় পেঁচিয়ে খুন করল খোকন।

বেডরুমে ছিলেন বীণা, বেরিয়ে এসে চেষ্টা করলেন টেলিফোনের কাছে যাওয়ার। বৃথা চেষ্টা। ফোনের তার ততক্ষণে কেটে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বীণাকে যথেষ্ট শারীরিক হেনস্থা করা হল, বেডরুমে পড়ে থাকা একটি শাড়ির প্রান্ত দিয়ে শ্বাসরোধের চেষ্টা হল, অন্য প্রান্ত সিলিংফ্যানে বেঁধে। চেষ্টা বিফল হওয়ায় বালিশ মুখে চেপে কেড়ে নেওয়া হল প্রাণবায়ু। এরপর গেস্ট রুমের আলমারি ভেঙে যথেচ্ছ লুঠপাট এবং সরে পড়া, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে।

খোকন-রাজু-জগদীশ ফিরে গেল নিজেদের কোয়ার্টারে, স্নান করে শুয়ে পড়ল দিব্যি। কামিনীই একমাত্র বহিরাগত, ভোর হওয়ার আগে ব্যাগভরতি লুঠের সামগ্রী সমেত পালাল পাঁচিল টপকে, ঝিমোতে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের এড়িয়ে। ঠিক ছিল, লুঠের মাল পরে ভাগ হবে।

খোকনের জবানবন্দির ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হল বিমলা খেতওয়াতকে। বিমলা অপরাধ স্বীকার

করলেন। কয়েকদিনের মধ্যে পুলিশের জালে ধরা পড়ল রাজু আর কামিনী। জগদীশ পালিয়েছিল বিহারের প্রত্যন্ত জেলার বাড়িতে, ধরে আনলেন গোয়েন্দারা। লুঠ করা জিনিস খুনের পরের রাতেই ভাগ করে নিয়েছিল চারমূর্তি। উদ্ধার হল প্রচুর গয়নাগাটি, ঘড়ি, ঘর সাজানোর বহু দামি সামগ্রী। যা শনাক্ত করলেন প্রয়াত নওলাখা-দম্পতির পুত্র ও পুত্রবধূ।

১৯এ, শরৎ বোস রোডের বহুতল বাড়িটির প্রবেশপথ

আশ্চর্যের, ঘটনার পরের দু'দিনও খোকন-রাজু-জগদীশ ওই অ্যাপার্টমেন্টে কাজ করে গিয়েছে নির্বিকার। বিন্দুমাত্র স্নায়ুর চাপ ছাড়াই। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর দিয়েছে, চা এনে দিয়েছে তদন্তকারী দলের জন্য। একেই কি বলে 'ক্রিমিনাল মাইন্ড'?

সুজিত মিত্র, লিখেছি আগেই, তদন্তকারী অফিসার ছিলেন। পদোন্নতির পর দীর্ঘদিন ওসি হোমিসাইড পদে চাকরি করেছেন সুনামের সঙ্গে। বছরদুয়েক আগে অবসর নিয়েছেন ডিসি স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ হিসেবে। যত্নশীল এবং লড়াকু তদন্ত করেছিলেন।

যত্নের অংশবিশেষ প্রথমে বলে নিই। গড়ফা মেইন রোডের কমল স্টুডিয়ো থেকে খোকন ও রাজু কিনেছিল দুটি ইয়াশিকা ক্যামেরা। সেই স্টুডিয়ো থেকে বাজেয়াপ্ত করা হল সংশ্লিষ্ট ক্যাশমেমো দুটি। কামিনী অগ্রিম থেকে পাওয়া ভাগের টাকায় একটি বড় সুটকেস কিনেছিল ভবানীপুরের দোকান থেকে। সেই ক্যাশমেমোও বাজেয়াপ্ত হল। কামিনী গ্রেফতার হওয়ার পর দেখা গিয়েছিল, ডান পায়ের পাতায় ক্ষতচিহ্ন। পাঁচিল টপকে পালানোর সময় লোহার শলাকায় আঘাত লেগেছিল। পাঁচিলে দাগ ছিল রক্তের। সেই রক্ত যে কামিনীরই, প্রমাণ করতে হল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। ঘটনাস্থলের নানা জায়গা থেকে নেওয়া হাত-পায়ের ছাপ পাঠানো হল ফরেনসিক পরীক্ষায়, মিলে গেল চার আততায়ীর সঙ্গে। আদালতে গোপন জবানবন্দিতে দোষ কবুলও করল খোকন এবং রাজু।

পড়তে যতটা সহজ মনে হল, আদতে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংহত করার কাজটি তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন ছিল। গ্রেফতার-পরবর্তী তদন্ত আসলে মালা গাঁথার মতোই। ঠান্ডা মাথায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি একটি করে প্রমাণ ঘটনা-পরম্পরা অনুযায়ী সাজিয়ে তবেই তৈরি হয় এধরনের জটিল মামলার চার্জশিট। মালাটি নিখুঁত গাঁথতে পারলে জাল কেটে বেরনোর রাস্তা থাকে না অভিযুক্তের, আইনের কাছে নতজানু হতে হয় নিরুপায়ভাবে।

তদন্তের প্রেক্ষিতে 'লড়াকু' শব্দটি লিখেছি আগের এক অনুচ্ছেদে, সচেতনভাবেই। তিন মাসের মধ্যেই পেশ হল চার্জশিট, শুরু হল বিচারপর্বের লড়াই। অন্যতম অভিযুক্ত রাজু নিজেই ইচ্ছে প্রকাশ করল রাজসাক্ষী হওয়ার। কাজ কিছুটা সহজ হল পুলিশের।

খেতওয়াত পরিবার অত্যন্ত বিত্তশালী ছিলেন। বিমলার জামিনের জন্য রাজ্যের এবং ভিনরাজ্যের প্রথিতযশা আইনজীবীদের লাগানো হয়েছিল। কলকাতা পুলিশের পক্ষে ছিলেন অভিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর শিশির ঘোষ। অন্যদিকে আইনি দুনিয়ার তারকাদের ছড়াছড়ি। বিচার চলাকালীন তীব্র চাপান-উতোরের সাক্ষী থাকল আদালত।

কিন্তু ওই যে লিখলাম, মালাটি গাঁথা হয়েছিল নিপুণ। ১৯৯৯ সালে আলিপুরের জেলা ও দায়রা আদালত বিমলা খেতওয়াত, খোকন গিরি, কামিনীকুমার রায় এবং জগদীশ যাদবকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল। রাজসাক্ষী রাজু আগাগোড়া সহযোগিতা করেছিল। মুক্তি দেওয়া হয় 'প্রসিকিউশন'-এর আবেদনের ভিত্তিতে।

মামলা গড়ায় হাইকোর্টে। যেখানে রাষ্ট্রের আর-এক প্রস্থ লড়াই এক ডজন নামজাদা আইনজীবীর সঙ্গে। হাইকোর্টও নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখল বিস্তর সওয়াল-জবাবের পর। সেটা ২০০৬ সাল।

পরের ধাপ সুপ্রিম কোর্ট। ততদিনে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বিমলা খেতওয়াত। দেহের একটি দিক প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আরও নানা ব্যাধি বাসা বেঁধেছে শরীরে। স্বাস্থ্যজনিত কারণে বিমলাকে জামিন দেয় সর্বোচ্চ আদালত। একটু সুস্থ হলেই আত্মসমর্পণ করতে হবে ফের, এই শর্তে। বিমলা ফেরেন শরৎ বোস রোডের ফ্ল্যাটে।

সুপ্রিম কোর্টও শেষমেশ হাইকোর্টের রায়ের সঙ্গেই সহমত হয়। তার আগেই অবশ্য জাগতিক আদালতের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিলেন বিমলা। ২০০৮-এর জুনের এক দুপুরে দশতলার বারান্দা থেকে ঝাঁপ দেন নীচে। মৃত্যু ঘটে মাটি ছোঁয়া মাত্রই। দেহের পাশে ওঁর ক্রাচটি পড়ে ছিল, যেটি সঙ্গে নিয়েই মরণঝাঁপ দিয়েছিলেন।

কেন আত্মহনন? ফের কারাবাসের আতঙ্ক? সামাজিক অসম্মানের গ্লানি, নাকি বিবেকদংশন? নাকি ‘জীবন যখন শুকায়ে যায়’, মুক্তি এভাবেই আসে ‘করুণাধারায়’?

মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে

ভ্রু তুলিয়া একটু বিস্মিতভাবে ব্যোমকেশ বলিল —"বিজ্ঞাপন পড় না? তবে পড় কি?"

"খবরের কাগজে সবাই যা পড়ে, তাই পড়ি—খবর।"

"অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়ায় কার আঙুল কেটে গিয়ে রক্তপাত হয়েছে আর ব্রেজিলে কার একসঙ্গে তিনটে ছেলে হয়েছে, এই পড়। ওসব পড়ে লাভ কী? সত্যিকারের খাঁটি খবর যদি পেতে চাও, তাহলে বিজ্ঞাপন পড়।"

আমি খোঁচা দিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না, বলিলাম— "ও, তাই না কি? কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা তাহলে ভারি শয়তান, সমস্ত কাগজখানা বিজ্ঞাপনে ভরে না দিয়ে কতক গুলো বাজে খবর ছাপিয়ে পাতা নষ্ট করে।"

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল— "তাদের দোষ নেই। তোমার মত লোকের চিত্তবিনোদন না করতে পারলে বেচারাদের কাগজ বিক্রি হয় না, তাই বাধ্য হয়ে ঐ সব খবর সৃষ্টি করতে হয়। আসল কাজের খবর থাকে কিন্তু বিজ্ঞাপনে। দেশের কোথায় কি হচ্ছে, কে কি ফিকির বার করে দিন-দুপুরে ডাকাতি করছে, কে চোরাই মাল পাচার করবার নতুন ফন্দি আঁটছে— এই সব দরকারী খবর যদি পেতে চাও তো বিজ্ঞাপন পড়তে হবে। রয়টারের টেলিগ্রামে ওসব পাওয়া যায় না।"

বড়তলা থানায় ফোনটা বেজেছিল কাকভোরে, পৌনে পাঁচটা নাগাদ।

—এখানে গণ্ডগোল হচ্ছে স্যার, প্রচুর লোক জমে গেছে। তাড়াতাড়ি আসুন।

—এখানে মানে?

—২সি, বিডন স্ট্রিট। খুন করে ফেলেছে স্যার।

—খুন?

ডিউটি অফিসার ফোন নামিয়ে রাখেন। সবে মিনিট পনেরো হল সকালের শিফটে বসেছেন। প্রথম ফোনটাতেই খুনের খবর? সাধে কি বলে, 'মর্নিং শোজ় দ্য ডে!' সকালই বুঝিয়ে দিচ্ছে, বাকি দিনটা কেমন যাবে?

বড়তলা থানা থেকে কতই বা দূরত্ব ঘটনাস্থলের? এক কিলোমিটার বড়জোর। পুলিশের জিপ যখন থামল ২সি বিডন স্ট্রিটের সামনে, অত ভোরেও অন্তত শ'তিনেক লোক। চিৎকার-চেঁচামেচিতে বোঝা দায়, ঠিক কী ঘটেছে। পুলিশের আবির্ভাবে সমবেত কোলাহল নিমেষে আরও উচ্চকিত, জানোয়ারটাকে আমরাই ফাঁসি দেব স্যার, আপনারা ফিরে যান!

২সি, বিডন স্ট্রিট

অপরাধের সুলুকসন্ধান পরে। পরিস্থিতি যা, এ তো আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হতে যাচ্ছে। এমনিতেই জনবসতিপূর্ণ এলাকা, কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমাট বাঁধছে দ্রুত। অফিসার ওয়ারলেস সেট হাতে নিলেন, বার্তা পাঠালেন থানায়। থানা থেকে যা অবিলম্বে পৌঁছল লালবাজার কন্ট্রোলে, "Commotion at Beadon Street over suspected murder. Reinforcement required as early as possible. Please inform superiors."

থানা জানাল ওসিকে, লালবাজার জানাল ডিসি নর্থ আর ডিসি ডিডিকে। ওসি সাততাড়াতাড়ি ছুটলেন, হোমিসাইড শাখার অফিসাররাও। পার্শ্ববর্তী থানাগুলি থেকে বাড়তি ফোর্স রওনা দিল বিডন স্ট্রিটের উদ্দেশে। কন্ট্রোল রুম ঘটনাস্থলে অফিসারদের জানিয়ে দিল, "DC North and DC DD on way. Situation report every five minutes please."

বিশ্বনাথ দত্ত হত্যা মামলা। বড়তলা থানা, কেস নম্বর ৬২/৯৪। তারিখ ৬/৩/৯৪, ভারতীয়

দণ্ডবিধির ১২০ বি/৩০২/২০১ ধারায়। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, খুন এবং প্রমাণ লোপাট।

সূচনায় শরদিন্দুর 'পথের কাঁটা'-র প্রারম্ভিক অংশের একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছি।

উপায়ান্তর ছিল না। আলোচ্য মামলার ঘটনাপ্রবাহে নির্ণায়ক ভূমিকা ছিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের, যেখানে ব্যোমকেশের ভাষায়, "আসল কাজের খবর" ছিল।

৩১ জানুয়ারি, ১৯৯৪, সোমবার। চন্দননগরের বাড়িতে বসে আনন্দবাজার পত্রিকার সারিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিলেন অভিজিৎ। চাকরির সন্ধানে আছেন, কর্মখালির বিজ্ঞাপন খুঁটিয়ে পড়েন। লিখে রাখেন, কোথায় কোথায় আবেদনপত্র পাঠাবেন। দেখতে দেখতেই নজর পড়ল জমি/বাড়ি বিক্রয়-এর কলামে। এটা কী?

'নোটিস

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালের অন্তর্ভুক্ত/ ২/সি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, বড়তলা থানার অধীন বাড়ী বিক্রয় হইবে। উক্ত ঠিকানার বাড়ীর দুই অংশিদার ছাড়া, যদি কোন অংশিদার বা দাবিদার থাকেন, তাহা হইলে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৭ দিনের মধ্যে এসে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। বিকাশ পাল এডভোকেট স্মল কজেজ কোর্ট। ২/১, কিরণ শংকর রায় রোড, কলিকাতা-১'

একবার নয়, দু'বার পড়লেন অভিজিৎ। কাগজ হাতে নিয়েই সোজা পাশের ঘরে, 'বাবা! এটা দেখেছ?'

সকাল সোয়া ন'টা তখন। প্রাতরাশ সেরে অফিসযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অমরনাথ। ছেলেকে বিচলিত দেখে একটু অবাকই হলেন। অভিজিৎ আশৈশব শান্ত প্রকৃতির, অকারণ উত্তেজনার প্রকাশ তার স্বভাববিরুদ্ধ। কাগজটা টেনে নিলেন ছেলের হাত থেকে।

'কী হল? কী বেরিয়েছেটা কী? দেখি...'

অমরনাথ দেখলেন, এবং অফিসে হাজিরার ব্যস্ততা সাময়িক অগ্রাধিকার হারাল। বসার ঘরের ল্যান্ডলাইন থেকে তৎক্ষণাৎ ফোন করলেন কলকাতার নম্বরে।

—সমর, আজকের আনন্দবাজার দেখেছিস? আটের পাতা, বিজ্ঞাপনের কলাম... জমিবাড়ি...

বিডন স্ট্রিটের তিনতলা বাড়িটি সাতের দশকের শেষাশেষি তৈরি করেছিলেন জগন্নাথ দত্ত। তিনি গত হলেন '৯০-এর শুরুতে। স্ত্রী-ও প্রয়াত হলেন বছরতিনেকের মধ্যেই। উত্তরাধিকার সূত্রে বাড়ির মালিকানা পেলেন চার পুত্র, এক কন্যা।

বাড়ি বিক্রির নোটিস

বড় অমরনাথ ব্যাংকের আধিকারিক। সপরিবারে বাস চন্দননগরে। স্ত্রী সংসারধর্মে ব্রতী, পুত্র অভিজিৎ পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরিপ্রত্যাশী। মেজো সমরনাথ পৈতৃক বাড়িতে থাকেন না, তবে কলকাতারই বাসিন্দা, চাকুরিজীবী। পরের ভাই বিশ্বনাথ, অকৃতদার। ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ধর্মতলা শাখার কর্মী। নির্বিরোধী মানুষ, নেশা বলতে দুটি, গান আর বিভিন্ন দেশের পুরনো মুদ্রা সংগ্রহ। রেকর্ড-ক্যাসেট কিনতেই ব্যয় হয়ে যায় বেতনের অর্ধাংশেরও বেশি। তিনতলায় দুটি ঘর নিয়ে অন্তর্মুখী জীবনযাপন।

পরের সন্তান অনুরাধা, বিবাহিতা। শ্বশুরবাড়ি কলকাতারই ফকির চক্রবর্তী লেনে।

সর্বকনিষ্ঠ অলোকনাথ কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল। স্ত্রী মমতা, এক শিশুপুত্র এবং দুই নাবালিকা কন্যাসহ থাকেন দোতলার দুটি ঘরে একটি আচ্ছাদিত বারান্দাসহ। অলোকনাথের ভায়রাভাই শিবশঙ্কর, ডাকনাম বাবু। কর্মহীন। ওই বারান্দাতেই তার নিশিযাপন।

একতলার ঘরগুলিতে ভাড়াটেরা থাকেন। মাসান্তে ভাড়ার সমবন্টন হয় ভাইবোনদের মধ্যে। অমরনাথ-সমরনাথ-অনুরাধার ভাগের কয়েকটি ঘর খালিই পড়ে থাকে দু'তলা—তিনতলায়।

আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপন নজরে আসার পর কালক্ষেপের প্রশ্ন ছিল না। অমরনাথ যোগাযোগ করলেন সমরনাথ ও অনুরাধার সঙ্গে। বিডন স্ট্রিটের বাড়ির মালিকানার অংশীদার তাঁরাও এবং তাঁদের অনুমতি ব্যতিরেকে বাড়ি বিক্রি আইনসিদ্ধ নয়, উকিলকে জানিয়ে দিলেন যৌথ চিঠিতে। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে।

প্রশ্ন ওঠা সংগত, বিশ্বনাথ এবং অলোকনাথকে কিছু জানালেন না কেন, কেন কিছু জানতে চাইলেন না? উত্তরে ভাইবোনদের সম্পর্কের সমীকরণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত জরুরি।

বিশ্বনাথ, পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন, নিজের জগতে থাকতে ভালবাসতেন। নিস্তরঙ্গ দিনাতিপাত, সামাজিক মেলামেশায় তীব্র বীতস্পৃহা। বৈষয়িক আলোচনায় বরাবরের অনাগ্রহী। অলোকনাথের মানসিক অবস্থান অবশ্য আমূল বিপ্রতীপে। ভোগবিলাসে আকর্ষণ মজ্জাগত, অনায়াস বিচরণ রেসের মাঠে, দিনান্তে মেজাজি মদ্যপান, নিষিদ্ধপল্লিতে পরিচিত মুখ নিয়মিত যাতায়াতের সৌজন্যে।

বিশ্বনাথ ভাইয়ের জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকতেন। কিন্তু সমরনাথ-অমরনাথ-অনুরাধার সঙ্গে অত্যন্ত তিক্ত সম্পর্ক ছিল অলোকনাথের। ছোটভাইয়ের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের তীব্র বিরোধী ছিলেন ওঁরা। পারস্পরিক বাক্যালাপ বন্ধই ছিল একরকম, বাবা-মা গত হওয়ার পর বিডন স্ট্রিটের পৈতৃক বাড়িতেও আর পা-ই রাখেননি অন্যত্র বসবাসকারী ভাইবোনরা।

বিজ্ঞাপন দেখে ওঁরা ভাবলেন, আপনভোলা বিশ্বনাথকে ভুল বুঝিয়ে নিশ্চয়ই বাড়ি বিক্রির মতলব ফেঁদেছেন অলোকনাথ। উকিলকে তথ্যপ্রমাণসহ প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে আশ্বস্ত হলেন তিন ভাইবোন। যাক, বাড়ি বিক্রির সম্ভাব্য চক্রান্ত সমূলে বিনষ্ট করা গেল।

সমরনাথের কলকাতার বাইরে কাজ ছিল অফিসের, ফেরার কথা ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে। অমরনাথ ঠিক করলেন, সমরনাথ ফিরলে মার্চের প্রথম সপ্তাহে দু'জনে মিলে বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে যাবেন। একটা হেস্তনেস্ত অলোকের সঙ্গে এবার না করলেই নয়। কী ভেবেছেটা কী? 'ধাবু'কেও (বিশ্বনাথের ডাকনাম) বোঝানো দরকার। কাউকে কিছু না জানিয়ে রাজি হয়ে গেল অলোকের কথায়? টাকাপয়সার লোভ তো ধাবুর কোনওকালেই ছিল না, তা হলে?

'তা হলে'-র উত্তর মিলল ৬ মার্চের ভোরে। আগের রাতেই অমরনাথ পুত্র অভিজিৎকে নিয়ে চন্দননগর থেকে পৌঁছলেন কলকাতায়। উঠলেন সমরনাথের বাড়িতে। ঠিক হল, তিনজনে রাত দুটো-আড়াইটে নাগাদ যাবেন বিডন স্ট্রিটে। অলোকের মর্নিং ডিউটি থাকলে ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে যাবে। দেখাই হবে না সকালে গেলে। আর দেখা হলেও ডিউটির অজুহাতে আলোচনাটা হতে দেবে না। বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরবেই না হয়তো দু'-তিনদিন। ধরতে হবে ঘুমনোর সময়।

ঘুমচোখে দরজা খুললেন অলোক, চমকে গেলেন দাদাদের ওই গভীর রাতে দেখে।

—তোমরা?

—অনেকদিন আসা হয়নি, খোঁজখবর নিতে এলাম। উপরে গিয়েছিলাম, ধাবুর ঘর দেখলাম ভিতর থেকে বন্ধ। ধাক্কা দিতে কেউ আওয়াজ দিল ভিতর থেকে, 'বাদ মে আইয়েগা।' ধাবু কই?

—ওহো, তোমাদের বলা হয়নি, ধাবুদা তো দিন পনেরো হল বারাসতে ঘরভাড়া নিয়ে চলে গেছে।

—মানে? হঠাৎ বারাসতে কেন?

—বলল, কিছুদিনের মধ্যেই ইউবিআই-এর বারাসত ব্রাঞ্চে বদলি হয়ে যাবে। এখান থেকে যাতায়াতের অসুবিধে হবে। তাই আগে থেকেই ওখানে একটা আস্তানা...

মাঝপথে থামিয়ে দেন অমরনাথ।

—তোর গল্পটা দাঁড়াচ্ছে না। কী হয়েছে বল? আর আমাদের ঘরগুলোও ভিতর থেকে বন্ধ কেন? খোলাই তো থাকে সবসময়। ধাবু কোথায়?

—বললাম তো বারাসত! বিশ্বাস না হয় দেখে এসো। ১১/১ ঝাউতলা লেন, বারাসত চৌরাস্তার কাছে। শুধুশুধু চোটপাট করছ কেন?

—করছি কি আর সাধে! আমাদের ঘর বন্ধ কেন? ধাবুর ঘরেই বা কারা? এসব কী করেছিস তুই? আমরা বারাসত থেকে ঘুরে এসে তোর সঙ্গে বোঝাপড়া করছি।

ততক্ষণে তর্কাতর্কি আর চেঁচামেচিতে বেরিয়ে এসেছেন একতলার ভাড়াটেরা। দু'তলা—তিনতলার ভিতর থেকে বন্ধ ঘরগুলি থেকেও বেরিয়ে এসেছেন এক অবাঙালি পরিবারের সদস্যরা। সমরনাথ পরিচয় জানতে চাইলে এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, 'মেরা নাম নন্দলাল সিং। অলোকবাবু আর বিশ্বনাথবাবু আপনা আপনা হিস্যা মুঝে বেচ দিয়া থোড়ে দিন পহেলে।'

—তার মানে? ওই ঘরগুলোর মালিক আমরা, কিনে নিয়েছেন মানে?

—আপ অলোকবাবুসে পুছিয়ে না! এগ্রিমেন্ট হ্যায় মেরে পাস। দেখ লিজিয়ে।

বাড়ি বিক্রির দলিল আনতে ঘরে ঢুকলেন নন্দলাল, আর সমরনাথ কলার চেপে ধরলেন ছোটভাইয়ের। অলোকনাথ তখন দৃশ্যতই কোণঠাসা, মুখে টুঁ শব্দটি নেই। মমতাও নিশ্চুপ, নতমস্তক। অমরনাথ নিরস্ত করলেন সমরনাথকে।

—আগে বারাসত যাই চল। ধাবুটার কী হল কে জানে! ফিরে এসে বাকি বোঝাপড়া করছি।

অমরনাথ—সমরনাথ-অভিজিৎ ট্যাক্সি করে রওনা দিলেন বারাসত, ফিরলেন রাত সোয়া চারটে নাগাদ। অলোক যে ঠিকানা বলেছিলেন, সেখানে অন্য পরিবার বাস করে। বিশ্বনাথের খোঁজ পাওয়া যায়নি। আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে, ডাহা মিথ্যে বলেছেন অলোক।

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল দুই দাদার। চড়থাপ্পড়ের অকৃপণ বৃষ্টিপাত হল অলোকের উপর, 'বল কী করেছিস? পিটিয়েই মেরে ফেলব না হলে!' চেপে ধরলেন একতলার ভাড়াটেরাও।

মিনিটপাঁচেকের বেশি ওই ঝড়ঝাপটা সহ্য করতে পারলেন না অলোক, স্বীকারোক্তি এল।

—ধাবুদাকে মেরে পুঁতে দিয়েছি।

—মানে?

'মানে' উদ্ধারে অবিলম্বে বড়তলা থানার নম্বর ডায়াল করলেন অভিজিৎ।

অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী পৌঁছনোর পর ভিড় ঠেলে ঢোকা গেল ২সি বিডন স্ট্রিটের অন্দরমহলে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছেন অলোকনাথ দু'তলার বারান্দায়, এক কোণে প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে মমতা। একতলার ভাড়াটেদের অনেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বারান্দার এদিক-সেদিক। অমরনাথ থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে। সমরনাথ বিধ্বস্ত, চোখের জল মুছছেন। অভিজিৎ সামলাচ্ছেন শোককাতর কাকাকে। ওসিকে দেখে অমরনাথ এগিয়ে এলেন।

—আসুন বড়বাবু, আমার নাম অমরনাথ দত্ত।

—কী হয়েছে? শুনলাম খুন...

কাঁদতে কাঁদতে সমরনাথ ছুটে যান অলোকনাথের দিকে। কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকেন ছোটভাইয়ের।

—স্যার, এ খুন করেছে, এ! ধাবুকে খুন করে পুঁতে দিয়েছে। নিজের দাদাকে খুন করে জাল দলিল বানিয়ে বাড়ি বিক্রি করেছে, কুলাঙ্গার একটা, ফাঁসি দিন স্যার...কিছুতেই বলছে না কোথায় পুঁতে রেখেছে

আমাদের ধাবুকে...

অফিসাররা বুঝলেন, এভাবে কাজের কাজ কিছু হবে না। একান্তে জিজ্ঞাসাবাদ দরকার। ক্রোধোন্মত্ত জনতার ভিড় ঠেলে অলোকনাথকে কোনওমতে নিয়ে যাওয়া হল বড়তলা থানায়।

'ঘটনাটা পুরোটা বলুন। আপনি কলকাতা পুলিশের কর্মী। পুলিশের কায়দাকানুন জানেন। সত্যিটা তাড়াতাড়ি বললে ভাল। যত দেরি করবেন, তত বেশি ক্ষতি, এটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না।'

অলোকনাথ বিস্তর মারধর খেয়েছেন দাদাদের হাতে একটু আগেই। ঠোঁট ফুলে গিয়েছে, চুল উস্কোখুস্কো, হাঁফাচ্ছেন। বলতে শুরু করলেন। রহস্য ক্রমে উন্মোচিত হল।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে কতই-বা বেতন ছিল একজন কনস্টেবলের? স্ত্রী এবং তিন সন্তানের সংসার সামলে বেহিসাবি বিলাসব্যসন অসম্ভব। ইন্দ্রিয়ের তাড়নাকে সংযত রাখার ক্ষমতা অবশ্য কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল অলোকনাথের অনায়ত্ত ছিল। রেস-জুয়া-মদ-নারীসঙ্গের অভ্যাস ত্যাগ করার অক্ষমতা বাধ্য করেছিল ধারদেনায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়তে। পরিত্রাণের পথ খুঁজছিলেন মরিয়া অলোকনাথ।

পথের দিশা পেলেন একটাই, অনেক ভাবার পর। বাড়ির দু'তলা-তিনতলাটা যদি বেচে দেওয়া যায়, অর্থাগম হবে যথেষ্ট। কিন্তু বড়দা-মেজদা আর দিদি রাজি হবে? সম্ভাবনা শূন্য। ধাবুদা? বলে দেখা যেতে পারে একবার। বললেনও '৯৩-এর নভেম্বরের শেষদিকে এবং হতাশ হয়ে পড়লেন বিশ্বনাথের প্রতিক্রিয়ায়।

—না না, বাড়ি বেচার প্রশ্ন আসছে কেন হঠাৎ? দিব্যি আছি তো।

বিশ্বনাথ 'দিব্যি' থাকতে পারেন, ধারদেনায় বিপর্যস্ত অলোকনাথ মোটেই স্বস্তিতে ছিলেন না। ভ্রাতৃহত্যার ষড়যন্ত্রের বীজ বপনে দেরি করলেন না বিশেষ। আশ্রিত ভায়রাভাই শিবশঙ্করকে শরিক করলেন পরিকল্পনার। চিত্রনাট্য রচনায় থাকল স্ত্রী মমতারও সক্রিয় অংশগ্রহণ। টাকার লোভে চক্রান্তে যুক্ত হলেন শিবশঙ্করের ভগ্নিপতি মৃণাল দত্ত। বাড়ি নিমতায়, পেশায় ব্যাংককর্মী। নিয়মিত যাতায়াত ছিল বিডন স্ট্রিটের বড়িতে।

জেরায় নাজেহাল অলোকনাথ মাঝেমাঝেই কেঁদে ফেলছেন, জবানবন্দিতে ছেদ টানছে স্বগতোক্তি, 'এ আমি কী করলাম! ক্ষমা করে দিন স্যার!'

এসব কুম্ভীরাশ্রু অনেক দেখেছেন গোয়েন্দারা, বাকিটা বলতে বাধ্য করছেন নির্মোহ নৈপুণ্যে, তারপর কী হল?

—ব্রোকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। খদ্দেরও পেয়ে গেলাম কয়েকজন। মৃণাল আমার শালা, আমি আর মমতা মিলে বোঝালাম মৃণালকে, ধাবুদার নামে সই করতে হবে বেচাকেনার দলিলে, বিশ্বনাথ দত্ত সেজে। প্রথমে রাজি হচ্ছিল না, কিছু টাকা দিলাম। মৃণাল সামান্য চাকরি করত, রাজি হয়ে গেল।

—তারপর?

—নন্দলাল সিং নামে এক অবাঙালি খদ্দেরের সঙ্গে চুক্তি ফাইনাল হল। বাড়ি দেখতে এলেন নন্দলাল। ধাবুদা যখন অফিসে, তখন দেখালাম। মৃণালকে পরিচয় দিলাম বিশ্বনাথ দত্ত হিসেবে, আর মমতাকে নিজের দিদি অনুরাধা হিসেবে। দোতলা আর তিনতলার ঘরগুলো বেচার এগ্রিমেন্ট হল, সইসাবুদ জানুয়ারির মাঝামাঝি। মৃণাল-মমতা সই করল বিশ্বনাথ-অনুরাধা হিসেবে। অ্যাডভান্স হিসেবে ষাট হাজার মতো পেলাম।

নন্দলালদের তাড়া ছিল। তাগাদা দিচ্ছিলেন, কবে পজেশন পাবেন? দখল পাওয়ার এবং রেজিস্ট্রেশনের পর বাকি লাখদুয়েক দেওয়ার কথা হয়েছিল। ধাবুদা থাকলে কী করে পজেশন দেব? অ্যাডভান্স নিয়ে ফেলেছি, বাগুইআটির অশ্বিনীনগরে ফ্ল্যাট ভাড়াও হয়ে গেছে, যেখানে উঠে যাব ঠিক করেছিলাম বাড়ি বিক্রির পর।

—এর পর?

—ধাবুদাকে মেরে ফেলা ছাড়া তো আর উপায় ছিল না স্যার।

—তা কী উপায় করলেন?

—২২ জানুয়ারি রাতে ধাবুদা সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরল। বললাম বাড়িতে মিস্ত্রি লেগেছে, আমাদের বারান্দায় শুয়ে পড়ো। সরল মানুষ ছিল, বিশ্বাস করল। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ আমি-শিবশঙ্কর-মৃণাল মিলে কম্বল চাপা দিয়ে মেরে ফেললাম। পরের দিন বিকেলেই পজেশন দিলাম নন্দলালকে। ওঁরা চলে এলেন, দখল নিলেন ঘরগুলোর। আমি বললাম, আমার ঘরটা কয়েকদিন পরেই ছেড়ে দেব। জিনিসপত্র শিফট করতে একটু সময় দরকার। নন্দলাল রাজি হয়ে গেলেন।

—বডি কোথায়?

—পুঁতে দিয়েছি স্যার।

—সে তো বুঝলাম, কিন্তু কোথায়?

অলোক নিরুত্তর। কলার ধরে ঝাঁকুনি দিতে কথা বেরল অস্ফুটে।

—নিমতলা ঘাটের কাছে স্যার।

—জায়গা দেখাতে পারবেন?

—হ্যাঁ স্যার।

কালবিলম্ব না করে গাড়ি ছুটল নিমতলা ঘাটে। অলোক একবার এ-জায়গা দেখাচ্ছেন, একবার ও-জায়গা। যেন দিকভ্রান্ত, অকস্মাৎ স্মৃতিভ্রষ্ট।

অপরাধীর এহেন অকাল স্মৃতিভ্রংশের সঙ্গে পরিচিত গোয়েন্দারা। বুঝলেন, সহজে কবুল করবেন না অলোকনাথ। একে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া দরকার, থানায় হবে না। তবে তার আগে অলোকনাথের এবং বিশ্বনাথের ঘরটা সার্চ করা প্রয়োজন, সকালের তাড়াহুড়োয় আর হট্টগোলে করা যায়নি। স্থির হল, ঘরগুলো তল্লাশি করে seizure list তৈরি করে তারপর সোজা লালবাজার। অনেক সময় আছে, কতক্ষণ চেপে রাখবে সত্যিটা?

ফের বিডন স্ট্রিট। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা ততক্ষণে দখল নিয়ে ফেলেছেন বাড়ির।

বারান্দার এবং বাড়ির বাকি অংশের স্কেচম্যাপ তৈরির কাজ চলছে পুরোদমে। শিবশঙ্কর এবং মমতাকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। দু'জনেরই মুখে কুলুপ। মৃণালের নিমতার বাসস্থানের খোঁজে টিম বেরিয়ে গিয়েছে। কাদের কাদের জেরা করা আশু প্রয়োজন, তৈরি হচ্ছে তালিকা। তদারকিতে ডিসি ডিডি স্বয়ং, সহায়তায় ডিসি নর্থ।

হোমিসাইড বিভাগের টিমে ছিলেন অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন আটাশ বছরের তরুণ সাব-ইনস্পেকটর, অধুনা ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। অতনু ছিলেন অনুসন্ধিৎসু স্বভাবের, সজাগ মস্তিষ্ক এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির সুবাদে প্রিয়পাত্র ঊর্ধ্বতন অফিসারদের।

তন্নতন্ন করে প্রতিটি ঘর খুঁজে যখন প্রস্তুতি চলছে seizure list-এর, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা খুঁজছেন বারান্দায় হাত বা পায়ের ছাপের নমুনা, অতনুও ঘুরে দেখছিলেন এঘর-ওঘর। হঠাৎই চোখ আটকে গেল নন্দলালের ঘরের দেওয়ালে। ঠাকুরের বেদি, যেমন আছে এবাড়ির অধিকাংশ ঘরে। কিন্তু এটার রং একটু অন্যরকম লাগছে না? একটু কাঁচা মনে হচ্ছে না চোখের দেখায়? বাকি দেওয়ালের রঙের সঙ্গে একটু তফাত যেন? ঘরের সমস্ত অংশ সাদা, এই বেদিটা একটু ক্রিমরঙা, সামান্য লালচেও না? বিদ্যুৎঝলক খেলে যায় অতনুর মাথায়।

—স্যার, একবার এদিকে আসবেন?

সিমেন্ট করা সেই বেদিটি, যার নীচে মৃতদেহ ছিল

তড়িঘড়ি এলেন ডিসি ডিডি সহ বাকিরা। আরে, সত্যিই তো! রং সামান্য আলাদা, আর কাঁচাও। অলোকনাথকে নিয়ে আসা হল বেদির সামনে। মিনিটদুয়েকের ধমকধামক এবং মৃদু চড়চাপড়ের পর ভেঙে

পড়লেন দত্তবাড়ির কনিষ্ঠ পুত্র।

—ওখানেই ধাবুদাকে পুঁতে দিয়েছিলাম স্যার।

নিজেদেরই বাড়ির দেওয়ালে দাদাকে খুন করে পুঁতে দিয়ে বাড়ি বিক্রি, 'পথের কাঁটা'-কে সরিয়ে দেওয়া? বাক্‌রুদ্ধ অভিজ্ঞ অফিসাররাও, সংবিৎ ফিরতে সময় লাগল কিছু। মিস্ত্রি ডাকা হল, বেদিতে কোদালের প্রথম কোপ পড়ার কিছু পরেই দুর্গন্ধ দখল নিল ঘরের। উদ্ধার হল দেহ, মৃত্যুর দেড় মাস পরে। ঘাড়ে-গলায়-বুকে সামান্য মাংস লেগে রয়েছে, শরীরের অবশিষ্ট প্রায় কঙ্কালে পর্যবসিত। জেরায় প্রকাশ্যে এল, কখন কীভাবে মৃত্যু এসেছিল তেতাল্লিশ বছরের বিশ্বনাথের, সহোদরের চক্রান্তে।

বিশ্বনাথ দত্ত-র কঙ্কাল

২২ জানুয়ারি, ১৯৯৪। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরলেন বিশ্বনাথ, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ব্যাংকের একটি বিচিত্রানুষ্ঠান দেখে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাবেন, মুখোমুখি অলোকনাথের সঙ্গে।

—ধাবুদা, আজ তুই আমাদের ঘরের লাগোয়া বারান্দাটায় শুয়ে পড়বি?

—কেন রে?

—না, ঘরগুলোর যা অবস্থা, মিস্ত্রি লাগিয়েছি একটু চুনকামের জন্য। তাড়াহুড়োয় বলা হয়নি আগে। আজ তিনতলাটা ধরেছে, কাল-পরশু দোতলাটা করবে।

বিশ্বনাথ দেখতেও পেলেন কয়েকটি সিমেন্টের বস্তা দু'তলা থেকে তিনতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে। ভাইকে বিশ্বাস করলেন। খাওয়াদাওয়া সেরে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লেন দু'তলায় ভাইয়ের ঘরের লাগোয়া বারান্দায়। মৃণাল পূর্বপরিকল্পনা মাফিক সাড়ে ন'টার মধ্যেই এসে পৌঁছলেন, অপেক্ষা করলেন অলোকনাথের ঘরে। যেখানে তখন উপস্থিত শিবশঙ্করও। এগারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল অলোকের পুত্র-কন্যারা। ঘড়ির কাঁটা যখন পেরল সাড়ে বারোটা, অলোক বেরলেন ঘর থেকে। ফিরলেন মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই।

—দাদা ঘুমিয়ে পড়েছে। মমতা, কম্বলটা দাও।

কম্বল নিয়ে শিবশঙ্কর, মৃণাল আর অলোক এলেন বারান্দায়, যেখানে বিশ্বনাথ গভীর

নিদ্রাচ্ছন্ন। শিবশঙ্কর দুই পা চেপে ধরলেন বিশ্বনাথের, মৃণাল হাত দুটো। অলোক কম্বল চাপা দিলেন দাদার মুখে, সর্বশক্তি প্রয়োগে চেপে ধরে থাকলেন প্রায় মিনিটসাতেক। হাত-পায়ের নিষ্ফল ছটফটানি ক্রমে থেমে এল বিশ্বনাথের। কম্বল মুখ থেকে তুলে নাকের কাছে হাত নিয়ে পরীক্ষা করলেন অলোকনাথ। চোখের পাতা টেনে দেখলেন...

নাহ্, নিশ্বাস পড়ছে না আর, কাজ হয়ে গেছে।

কাজ আরও বাকি ছিল, সম্পূর্ণ করলেন চক্রী-চতুষ্টয়, অলোক-মমতা-মৃণাল-শিবশঙ্কর। মিস্ত্রিদের দিয়ে কিছুদিন আগেই অলোক দু'তলার একটি ঘরে নতুন করে ভিত করিয়ে রেখেছিলেন ঠাকুরের বেদির। যেমন বেদি দেয়ালের সঙ্গে ছিল বিডন স্ট্রিটের বাড়ির অধিকাংশ ঘরেই। মজুত ছিল পর্যাপ্ত সিমেন্ট-বালিও।

বিশ্বনাথের নিস্পন্দ দেহকে বেদির মধ্যে পা মুড়িয়ে ঢোকানো এবং অতঃপর গাঁথনি, প্রমাণ লোপাটে ভোর হয়ে গেল প্রায়। মৃণাল ফিরে গেলেন নিমতার বাড়িতে, শিবশঙ্কর রোজকার মতো শুয়ে পড়লেন বারান্দায়, যেখানে ঘণ্টাখানেক আগেই ঘুমোচ্ছিলেন বিশ্বনাথ। এবং পাশের ঘরের দেওয়ালে দাদার মৃতদেহ গেঁথে দেওয়ার পর অলোকনাথ-মমতা ঘরে ফিরে নিদ্রা গেলেন নির্বিকার।

অলোক-মমতা-শিবশঙ্কর গ্রেফতার হয়েছিলেন মৃতদেহ আবিষ্কারের দিনই। মৃণাল ধরা পড়লেন পরের দিন, নিমতার বাড়ি থেকে।

তদন্তের দায়িত্ব ন্যস্ত হল অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই। পুলিশকর্মী নিজের দাদাকে হত্যা করে পুঁতে

রেখেছিলেন বাড়ির দেওয়ালে, অশ্রুতপূর্ব এই ঘটনায় শহর জুড়ে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিকই ছিল। যেমন স্বাভাবিক ছিল দ্রুত চার্জশিট পেশ করে শাস্তিবিধানের চাপ। অলোকনাথ যে প্রকৃতির মানুষ, পুলিশকে দেওয়া বয়ান সম্পূর্ণ অস্বীকার করবেন আদালতে, অনায়াসে অনুমেয়। পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতেই দোষী সাব্যস্ত করতে হবে অভিযুক্তদের, স্পষ্ট ছিল গোড়া থেকেই।

তদন্ত হল ম্যারাথন। অভিযুক্তদের গ্রেফতারির অর্থ, বিয়াল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে অতিক্রান্ত মাত্র দশ। বাকি বত্রিশে প্রমাণ সংগ্রহ, চার্জশিট পেশ এবং আদালতে বিচারান্তে শাস্তিপ্রাপ্তি। দৌড় শুরু করলেন অতনু। প্রমাণ একত্রিত করার জরুরি কাজটি সম্পন্ন করলেন নিখাদ নিষ্ঠায়, প্রত্যয়ী পরিশ্রমে।

বাগুইআটির অশ্বিনীনগরে অলোকনাথের ভাড়া করা ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল বিশ্বনাথের তিনটি ট্রাঙ্ক। যাতে ছিল পোশাকআশাক, প্রচুর পুরনো মুদ্রা আর গানের রেকর্ড-ক্যাসেট। অর্থলোভ কতটা অতলগামী করে ফেলে মানুষকে, তার প্রমাণ মিলল ২৪/এ, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট-নিবাসী গোবিন্দ সর্দারের বাড়িতে। যাঁকে বিশ্বনাথের পাম্পসেট এবং কিছু আসবাবপত্র বেচে দিয়েছিলেন অলোকনাথ এবং কবুল করেছিলেন জেরায়।

বাড়ি বিক্রির দলিলে সই করেছিলেন অলোক-মৃণাল-মমতা। ত্রয়ীর হস্তাক্ষরের নমুনা (Specimen hand writing) সংগ্রহ করে পাঠানো হল ফরেনসিক পরীক্ষায়, প্রত্যাশিতভাবেই মিলে গেল হুবহু।

পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের অস্ত্রাগারে (Armoury) কর্মরত ছিলেন অলোকনাথ। হাজিরা খাতা খুলে দেখা গেল, ২৩ জানুয়ারি ডিউটিতে এসে কিছু পরেই মেয়ের অসুস্থতার অজুহাতে বেরিয়ে যান। ফের কাজে যোগ দেন সপ্তাহখানেক পর। খুনটা হয়েছিল ২২-র রাতে। পরের সাতদিন অলোক ব্যস্ত থেকেছিলেন নন্দলালদের মালিকানা দেওয়ায় এবং অন্য সম্ভাব্য প্রমাণ লোপাটে। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কর্মক্ষেত্রে ওই ঘটনা-উত্তর অনুপস্থিতি।

সিমেন্ট-বালি অলোকনাথ কিনেছিলেন সৌমিত্র নায়ক নামের এক ইমারতি সামগ্রী বিক্রেতার থেকে, জানুয়ারির মাঝামাঝি। দোকান এবং দোকানের মালিক, দুই-ই চিহ্নিত হল। আদালতে রাখঢাকহীন বয়ান দিলেন সৌমিত্র, চিহ্নিত করলেন ক্রেতা অলোকনাথকে।

গ্রেফতারির পর থেকেই মৃণাল দত্ত তদন্তকারীদের বলে আসছিলেন, যে পাপ করেছি, তার ক্ষমা নেই। অভিনয় নয়, বাস্তবিকই অনুতাপদগ্ধ ছিলেন মৃণাল, মনে হয়েছিল অতনুর। মৃণাল সম্মত হয়েছিলেন আদালতে বিচারপতির কাছে জবানবন্দি (judicial confession) দিতে। ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ। যা চূড়ান্ত সহায়ক হয়েছিল শাস্তিবিধানে।

বয়ান নেওয়া হল আইনজীবী বিকাশ পালেরও, যিনি আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। বিকাশকে নিয়োগ করেছিলেন নন্দলাল, সম্পত্তি বেচাকেনায় কোনও আইনি জটিলতা রয়েছে কি না খতিয়ে দেখতে। বিক্রয়প্রক্রিয়া চলাকালীন অলোক আগাগোড়া বলে এসেছিলেন, তাঁরা দুই ভাই, এক বোন। বাড়ির দলিলপত্র পুরসভায় 'সার্চ' করে অন্য তথ্য পেয়েছিলেন বিকাশ। নথি বলেছিল, চার ভাই, এক বোন। প্রশ্ন করায় অস্বীকার করেছিলেন অলোক, এড়িয়ে গিয়েছিলেন উত্তর। অবধারিত সন্দেহের উদ্রেক হয়, কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বিকাশ। যে বিজ্ঞাপন দেখা দিয়েছিল রহস্যভেদের প্রধান অনুঘটক রূপে। বিকাশও আদালতে চিহ্নিত করেছিলেন অলোক-মমতা-মৃণালকে।

মূল কাজটি অবশ্য তখনও অসমাপ্ত। প্রায় কঙ্কালে পরিণত দেহ যে বিশ্বনাথেরই, তার সন্দেহাতীত প্রমাণ।

ময়নাতদন্ত করেছিলেন অধ্যাপক ডা. অপূর্বকুমার নন্দী, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক অ্যান্ড স্টেট মেডিসিন বিভাগের তৎকালীন প্রধান। দীর্ঘ কর্মজীবনে কয়েক হাজার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডা. নন্দী রিপোর্টে লিখলেন, "Death in my opinion was caused by compression of neck, for example, throttling ante-mortem and homicidal in nature." জানালেন, মৃতের বয়স

আনুমানিক তেতাল্লিশ। বিশেষ তাৎপর্যের, অমরনাথ-সমরনাথ-অনুরাধা জানিয়েছিলেন, গজদাঁত ছিল বিশ্বনাথের। সেই গজদাঁতেরও উল্লেখ ছিল রিপোর্টে, যা চিহ্নিতকরণের পক্ষে অন্যতম পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হয়েছিল বিচারপর্বে।

দেহ শনাক্তকরণে তর্কাতীত প্রমাণ অবশ্য মিলেছিল 'photographic superimposition' পদ্ধতিতে। তদন্তকারী অফিসারের আর্জিতে যার সফল প্রয়োগ করেছিলেন কলকাতার Central Forensic Science Laboratory (CFSL)-র তৎকালীন ডেপুটি ডিরেক্টর ড. ভি কে কশ্যপ। ১৯৬০ সালে পঞ্চম শুক্লা হত্যা মামলায় কলকাতা তথা ভারতে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল 'সুপারইমপোজিশন' পদ্ধতি। বিশ্বনাথ দত্তের খুনের মামলায় যার প্রয়োগ কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে হয়েছিল দ্বিতীয়বার, চৌত্রিশ বছর পরে।

মৃতের করোটি। গজদাঁতের চিহ্নিতকরণের অন্যতম প্রমাণ

রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, "The super-imposition test suggests that the skull and the mandible belonged to a person whose photographs were forwarded to me for test."

ঘটনার 'কী-কেন-কখন-কীভাবে' এত নিখুঁত উঠে এসেছিল অতনুবাবুর চার্জশিটে, অভিযুক্তদের আইনজীবী হালে পানি পাননি। অলোকনাথ-মমতা—শিবশঙ্কর-মৃণালকে ফাঁসির সাজা শোনান সেশন কোর্ট, ২০০০ সালে। যা বহাল রাখেন কলকাতা হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট অলোকের সাজা লঘু করে দণ্ডিত করেন যাবজ্জীবন কারাবাসে। বাকিদের, যাঁদের দীর্ঘ কারাবাস ততদিনে সম্পূর্ণ, মুক্তি দেওয়া হয়।

অলোকনাথ সম্প্রতি বহরমপুর জেলে পরলোকগত হয়েছেন। আপাতত 'সর্বোচ্চ' আদালতের বিচারাধীন হয়তো।

বিবরণীর সূচনা 'পথের কাঁটা'-র উদ্ধৃতি দিয়ে। সমাপ্তিতেও নিই শরদিন্দুর শরণ। ব্যোমকেশের সেই বহুপঠিত কাহিনি মনে করুন, যাতে বৃদ্ধ করালীবাবুকে খুন করা হয়েছিল মেডালা আর ফার্স্ট সার্ভিকল ভার্টিব্রার সন্ধিস্থলে ছুঁচ ফুটিয়ে।

কল্পনার করালীবাবুর হত্যার সঙ্গে বাস্তবের বিশ্বনাথের খুনের বাহ্যত মিল নেই কোনও। তলিয়ে ভাবলে মনে হয়, সত্যিই নেই? মোটিভের মোহনায় তো মিলেমিশে গেছেই দুই হত্যাকাণ্ডের কল্পনা আর বাস্তব।

অর্থমনর্থম!

কী বিচিত্র এই দ্বেষ!

—রোল নাম্বার ওয়ান?

—প্রেজেন্ট মিস!

—রোল নাম্বার টু?

—ইয়েস মিস!

—থ্রি?

—প্রেজেন্ট প্লিজ়!

—রোল নাম্বার ফোর?

উত্তর না পেয়ে অ্যাটেনডেন্সের খাতা থেকে মুখ তোলেন শাহনাজ, রিপন স্ট্রিটের Progressive Day School-এর ক্লাস ওয়ানের টিচার |

—হারুন কোথায়? আসেনি?

—না মিস, অ্যাবসেন্ট।

—ওকে, রোল নাম্বার ফাইভ?

রোল কল চলতে থাকে। সিক্স, সেভেন, এইট...

আমাদের হাওড়া-শিয়ালদায় যেমন অষ্টপ্রহর থিকথিক জনস্রোত, এখানেও তা-ই। একই ছবি মোটামুটি। কাঁধে বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে কুলিদের ব্যস্তসমস্ত যাতায়াত, এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্যতে। ক্লান্তিহীন। হিন্দি-ইংরেজিতে ট্রেনের ঘোষণা মিনিটে মিনিটে, পাল্লা দিয়ে ইঞ্জিনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী, আওয়াজের গজরানি। এক একটা ট্রেন থামছে, উগরে দিচ্ছে মানুষের দঙ্গল। এক একটা ছাড়ছে, টইটম্বুর যাত্রীদল সমেত। স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সি-অটোর স্ট্যান্ডে নিত্যদিনের জটলা চালকদের। পান-বিড়ি-সিগারেটের আড্ডা। ওঁরা জানেন, খদ্দেরের অভাব এখানে হওয়ার নয়। সে কাকভোর হোক বা মাঝরাত। নির্জনতার প্রবেশ নিষেধ এ তল্লাটে।

বেরিলি জংশন। দিল্লি থেকে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার দূরের স্টেশন। উত্তরপ্রদেশের পাঁচটি ব্যস্ততম স্টেশনের তালিকা বানাতে বসলে বেরিলির অন্তর্ভুক্তি অবধারিত। এখান থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রোজ ছোটে দূরপাল্লার ট্রেন। সঙ্গে যোগ করুন যাত্রীবোঝাই লোকাল ট্রেনের দৈনন্দিন কু-ঝিকঝিক আর যথেষ্ট সংখ্যায় পণ্যবাহী গাড়ির প্রাত্যহিক আসা-যাওয়া।

বেরিলি জিআরপি (Government Railway Police) থানাকেও শশব্যস্ত থাকতে হয় চব্বিশ ঘণ্টাই। দিনে গড়ে দশটা মিসিং ডায়রি হবেই। বাচ্চাদের অনেকেই দলছুট হয়ে যায় রোজ, কপাল নেহাত খারাপ না হলে পাওয়া যায় খোঁজাখুঁজির পর। আর বড় স্টেশন মানেই, কে না জানে, পকেটমারদের যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী। বেরিলিও ব্যতিক্রম নয়। সকাল-সন্ধে মিলিয়ে পকেটমারির অভিযোগ জমা পড়ে ডজন ডজন। রাত বাড়লে সাইডিং-এর আধো-অন্ধকারে মদ-জুয়ার মোচ্ছব তো রোজকার উপদ্রব। প্ল্যাটফর্মের এমাথা-ওমাথা টহলদারি চালাতেই হয় তিন শিফটে। মর্নিং, ইভনিং, নাইট। ঢিলেমির জো নেই এতটুকু।

সন্ধে তখন রাতের চৌকাঠে পা দেব-দেব করছে। প্ল্যাটফর্মে টহল দিতে দিতেই বড় স্টিলের ট্রাঙ্কটা নজরে এল দুই কনস্টেবলের।

এখানে এভাবে পড়ে কেন? কুলি নিয়ে এসে রেখেছিল? ট্রেনে ওঠাতে ভুলে গেছে, আর যার জিনিস সে-ও খেয়াল করেনি? না কি কেউ রেখে গিয়ে কিছু কিনে-টিনে আনতে গেছে, চলে আসবে শিগগির? কিন্তু এভাবে কোনও পাহারা ছাড়া মালপত্র ফেলে রেখে গেলে হাওয়া হয়ে যেতে আর কতক্ষণ? থানায় নিয়ে যাওয়াই ভাল, না হলে একটু পরেই হয়তো কেউ এসে কান্নাকাটি জুড়বে, আমার ট্রাঙ্ক চুরি হয়ে গেছে, অমুক প্ল্যাটফর্মের তমুক জায়গায় রাখা ছিল। মালপত্র আকছার চুরি হয় এই স্টেশনে, নতুন কিছু নয়।

ধরাধরি করে ট্রাঙ্ক আনা হল থানায়। ওসি এবং অন্য অফিসাররা উলটেপালটে দেখলেন। নাহ্, কোথাও এমন কিছু লেখা নেই, যা থেকে মালিকের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। ওসি সিদ্ধান্ত নিলেন, খুলেই দেখা যাক কী আছে ভিতরে, জিনিসপত্র থেকে যদি সন্ধান মেলে মালিকের।

তালা ভাঙা হল এবং ট্রাঙ্কের ভিতরের দৃশ্যে আঁতকে উঠলেন বেরিলি জিআরপি থানার কর্মী-অফিসাররা। যাঁরা লাশ দেখে অভ্যস্ত এবং হঠাৎ মৃতদেহ দেখে যাঁদের বিচলিত হওয়ার কারণ নেই কোনও।

হারুন রশিদ হত্যা মামলা। পার্ক স্ট্রিট থানা, কেস নম্বর ৫৩৯। তারিখ ১৫/৮/৯৪। ধারা ৩৬৪/৩০২/২০১/৩৪ আইপিসি। খুনের উদ্দেশ্যে অপহরণ, খুন, প্রমাণ লোপাট এবং একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা। মহম্মদ হাদিস সপরিবারে থাকতেন পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকার ২২/২এ, ব্রাইট স্ট্রিটে। আদি বাড়ি বিহারের গয়া জেলায়। চাকরির সন্ধানে আটের দশকের মাঝামাঝি চলে আসেন কলকাতায়। চেষ্টাচরিত্রের পর চাকরি জোটে অজন্তা লেদার্স ফ্যাশন লিমিটেডে। ইলিয়ট রোডের কাছে সিরাজুল ইসলাম লেনে কোম্পানির ফ্যাক্টরি, তৈরি হয় চামড়ার জিনিসপত্র। কাজে ফাঁকি দেওয়া হাদিসের ধাতে ছিল না। দক্ষ কর্মী হিসেবে অল্পদিনেই মালিকের অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ছোট পরিবার, সুখী পরিবার। স্ত্রী, নয় বছরের ছেলে হারুন আর বছর চারেকের ফুটফুটে মেয়ে। যার সেভাবে নামই ঠিক হয়নি এখনও। বাবা-মা-দাদা যে যেমন খুশি ডাকে আদর করে।

ছেলেমেয়েকে কলকাতায় পড়াবেন, ইচ্ছে ছিল হাদিসের। হারুন একটু বড় হতেই গয়ার স্কুল থেকে ছাড়িয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। একটু বেশি বয়সেই হারুনকে ভরতি করলেন রিপন স্ট্রিটের 'Progressive Day School'-এ ক্লাস ওয়ানে। হারুন তখন নয়। সালটা ১৯৯৪।

স্কুল শুরু হত সকাল সাড়ে সাতটায়। ছুটি বারোটায়। ট্রামে করে হারুনকে স্কুলে পৌঁছে দিতেন হাদিস। ছুটির পর কখনও হেঁটে, কখনও ট্রামে, একাই সাধারণত বাড়ি ফিরত হারুন। খেয়েদেয়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়েই বিকেলে পাড়ায় ফুটবল পেটাতে ছুটত।

১৩ অগস্টের বিকেলে অন্যরকম হল। ফুটবল নিয়ে দাপানো তো দূরের কথা, স্কুল থেকে বাড়িই ফিরল না হারুন। সাড়ে বারোটার মধ্যে যে ছেলে চলে আসে, তিনটে পেরিয়ে সাড়ে তিনটে বেজে গেলেও তার পাত্তা নেই। কোথায় গেল? কী হল হারুনের?

খবর গেল হাদিসের কাছে, সব কাজ ফেলে বাড়ি ফিরলেন তড়িঘড়ি।

হারুনের স্কুল

খোঁজ-খোঁজ। স্কুলে ছোটা হল প্রথমে। দারোয়ান জানালেন, ছাত্ররা সবাই রোজকার মতো বেরিয়ে গিয়েছে। আলাদা করে হারুনকে খেয়াল করেননি। বন্ধুদের বাড়ি যেতে পারে? খোঁজখবর হল। নেই। পাড়াপ্রতিবেশীরা ভিড় জমালেন, এলেন অফিসের সহকর্মীরাও। হাদিস খবর দিলেন চার ঘনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ীকে। ছুটে এলেন মহম্মদ সামসুদ্দিন, কুদ্দুস আলম, মহম্মদ একলাখ এবং দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী আলমগির।

চারজনই বহুদিনের পরিচিত হাদিসের। সবারই বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। একলাখ ছাড়া গয়ারই বাসিন্দা সবাই, কর্মসূত্রে কলকাতায়। সামসুদ্দিন অনেকদিনের বন্ধু, ছোটখাটো কাপড়ের ব্যবসা আছে। বন্ধুর সঙ্গে যৌথভাবে ৩৬, আগা মেহেন্দি লেনে একটা ছোট দু'কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন হাদিস বছরখানেক

হল। গ্রামের বাড়ি থেকে আত্মীয়পরিজনরা প্রায়ই আসে, থাকতে দেওয়ার তো একটা জায়গা চাই। সেই উদ্দেশ্যেই বাড়ি ভাড়া।

মহম্মদ একলাখের বাড়ি বিহারের ছাপড়ায়। কাজ করতেন অজন্তা লেদার্সেই, হাদিসের সুপারিশেই চাকরি। কৃতজ্ঞ ছিলেন স্বাভাবিক কারণেই, হাদিসের পরিবারের যে-কোনও বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন সবার আগে। দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে ফ্যাক্টরির চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন সম্প্রতি, টুকটাক ব্যবসাপাতিতে দিন গুজরান। অবিবাহিত, বাবার সঙ্গে থাকেন ৪, দেদার বক্স লেনের একটা দু'কামরার ভাড়াবাড়িতে।

আলমগির একটা গাড়ির যন্ত্রাংশ মেরামতির দোকান চালান ইলিয়ট রোডের কাছে। থাকেন সপরিবারে ব্রাইট স্ট্রিটে, হাদিসের বাড়িতে নিয়মিত আসা-যাওয়া। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক। সুখ-দুঃখে একে অন্যের পাশে থাকেন নিঃস্বার্থ।

হারুনের হারিয়ে যাওয়ার খবরে সবচেয়ে বিচলিত কুদ্দুস আলম। যিনি ভীষণ প্রিয় ছিলেন বালক হারুনের। 'কুদ্দুস চাচা' বলতে অজ্ঞান। ফুটবলের নেশা চাচাই ধরিয়েছিলেন। আগা মেহেন্দি রোডে সামসুদ্দিন-হাদিসের ভাড়ার ফ্ল্যাটে থাকতেন। হাদিস অস্থায়ী পার্টটাইম কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন কুদ্দুসকেও, ওই অজন্তা লেদার্স ফ্যাক্টরিতেই।

সারারাত ছোটাছুটি করেও যখন খোঁজ মিলল না হারুনের, পরের দিন সকালে, ১৪ অগস্ট, পার্ক স্ট্রিট থানায় মিসিং ডায়রি করলেন হাদিস। GDE (জেনারেল ডায়রি এন্ট্রি) নম্বর ১৫১৫। পুলিশকে জানালেন না, আগের দিন, ১৩ অগস্ট, বিকেল সোয়া তিনটে নাগাদ ফ্যাক্টরিতে একটা ফোন এসেছিল।

—হাদিসভাই, আপনার ফোন...

অজন্তা লেদার্সের বহুদিনের কর্মী ফজলুল ডাক দেন কাজে ব্যস্ত হাদিসকে।

—আমার? কে?

বলল না। আপনাকে খুঁজছে।

হাদিস রিসিভার কানে দেন। ওপার থেকে ভাঙাভাঙা গলায়, থেমে থেমে বলতে থাকে অপরিচিত।

—আপনার ছেলে আমাদের কাছে। আজ রাত দশটা নাগাদ পার্ক সার্কাসের ৪ নম্বর ব্রিজের মুখে দাঁড়াবেন। পঁচিশ হাজার টাকা একটা কালো ব্যাগে নিয়ে আসবেন। আমাদের লোক থাকবে। মাথায় লাল টুপি, ডানহাতে ঘড়ি। ওকে ব্যাগটা দিয়ে দেবেন। পুলিশে জানাতে পারেন। তবে জানালে আর ছেলেকে জীবিত পাবেন না। টাকা পেলে কাল সন্ধের মধ্যে ছেলেকেও পাবেন। আর একটা কথা, একা আসবেন। চালাকি পছন্দ করি না আমরা।

ফোন কেটে যাওয়ার পর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল হাদিসের। পঁচিশ হাজার? মাসমাইনের চাকরি, চলে যায় মোটামুটি। এখন বিকেল সোয়া তিনটে। রাত দশটার মধ্যে এত টাকা জোগাড় হবে কী করে? ফোনে একবার হারুনের সঙ্গে কথা বলতে চাওয়ার কথাও মাথায় এল না। একবার 'আব্বা' ডাকটা শুনতে পেলে মনটা শান্ত হত একটু।

সামসুদ্দিন হাজার দুয়েক দিলেন, কুদ্দুস-একলাখ দিলেন হাজার খানেক করে। আলমগির জোগাড় করলেন চার হাজার। ফ্যাক্টরির মালিক খুবই পছন্দ করতেন হাদিসকে, বিপদে পাশে দাঁড়ালেন। দিলেন পাঁচ হাজার। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে ধার আর নিজের সঞ্চয় থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল পঁচিশে। ব্রাইট স্ট্রিটের বাড়ি থেকে পার্ক সার্কাস আর কতটুকু? রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ হেঁটেই রওনা দিলেন কালো ব্যাগ হাতে। একাই।

সোয়া দশটা বাজল, ক্রমে সাড়ে দশটা, অপেক্ষা করতে করতে একসময় ঘড়ির কাঁটা দশকে অগ্রাহ্য করে এগারো ছুঁল। কোথায় সেই মাথায় লাল টুপি, ডানহাতে ঘড়ি? সাড়ে এগারোটা অবধি ধৈর্য ধরেও যখন কেউ এল না, একরাশ উদ্বেগ-আশঙ্কা-দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন হাদিস।

মাথা কাজ করছে না আর। কোথায় গেল ছেলেটা? কারা কিডন্যাপ করল? কেন? বাড়িতে ইতিমধ্যেই

অবস্থা সঙ্গিন। স্ত্রী নাওয়া-খাওয়া প্রায় বন্ধই করে দিয়েছেন। মেয়ে বারবার জানতে চাইছে দাদার কথা। কী করবেন এখন?

আত্মীয়স্বজন-পাড়াপ্রতিবেশী সবাই গতকাল থেকে একই কাটা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাল লাগছে না আর শুনতে। কী ঠিক হয়ে যাবে? হারুনকে ফিরে না পেলে কীভাবে ঠিক হয়ে যাবে সব? যার যায়, তারই যায়। অন্যরা কী করে বুঝবে হারুনের মুখটা মনে পড়লেই ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কোথায় আছে, কেমন আছে ছেলেটা?

পুলিশে জানানো দরকার এবার। মুক্তিপণ চেয়ে ফোনের কথাটা বলব? না কি আপাতত মিসিং ডায়েরি করে রেখে অপেক্ষা করা উচিত পরের ফোনের? কিডন্যাপাররা হয়তো আজ ইচ্ছে করেই টাকাটা নিল না, দূর থেকে নজর রাখছিল? না, আর একদিন দেখি, পুলিশকে বললে যদি জানতে পেরে যায় ওরা, মেরে ফেলে হারুনকে? আর ভাবতে পারেন না হাদিস।

মুক্তিপণের ফোনের ব্যাপার চেপে যাওয়া হল ১৪ তারিখ সকালের মিসিং ডায়েরিতে। কিন্তু সারাদিন অপেক্ষার পরও যখন আর ফোন এল না টাকা চেয়ে, বিপর্যস্ত হাদিসকে নিয়ে সামসুদ্দিন-কুদ্দুস-একলাখ-আলমগির এবং কয়েকজন সহকর্মী পার্ক স্ট্রিট থানায় এলেন সেদিনই সন্ধেবেলায়। সব খুলে বললেন হাদিস, অভিযোগ দায়ের হল। তদন্তের দায়িত্ব নিলেন সাব-ইনস্পেকটর আশিক আহমেদ, যিনি বর্তমানে তপসিয়া থানার ওসি।

থানা থেকে যখন বেরচ্ছেন লেখাজোকা শেষ হওয়ার পর, হাদিস দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি, পরের

দিনই ফিরে আসতে হবে আবার, চরম দুঃসংবাদ পেয়ে।

যা যা সঙ্গে থাকে ওই বয়সের স্কুলছাত্রের সঙ্গে, সব ছিল। খাতাবই স্কুলব্যাগের ভিতর, ওয়াটারবটল, টিফিনবক্স। স্কুলের ইউনিফর্ম পরা বালকের নিথর দেহ পড়ে ট্রাঙ্কের ভিতর।

শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে, গলায় আঙুলের স্পষ্ট দাগ দেখে অনুমান করতে অসুবিধে হয় না বেরিলি থানার ওসি-র। পরিচয়ও জানা যায় সহজেই, প্রত্যেকটি খাতায় নাম লেখা আছে গোটা গোটা অক্ষরে।

—স্যার লড়কা কা নাম হারুন রশিদ, কলকাত্তা কা কোই Progressive Day School কা স্টুডেন্ট লাগতা হ্যায়।

—স্কুল কা ফোন নম্বর পতা করো য্যায়সে ভি হো ... অউর কলকাত্তা ট্রাঙ্ককল বুক করো জলদি ....

১৫ অগস্টের রাত সাড়ে ন'টা তখন।

রাত পৌনে এগারোটায় যখন বেরিলি থেকে ফোন এল হারুনের স্কুলে, ধরার লোক বলতে শুধু একজন দারোয়ান। যিনি ঘুমচোখে ফোন তুললেন এবং খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে জানালেন প্রিন্সিপালকে। যিনি এক মুহূর্ত দেরি না করে খবর দিলেন হাদিসকে। বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজন নিয়ে হাদিস ছুটলেন থানায়।

পার্ক স্ট্রিট থানার তৎকালীন ওসি ব্যোমকেশ ব্যানার্জি ট্রাঙ্ককলে কথা বললেন বেরিলি

জিআরপি-র ওসি-র সঙ্গে। সিদ্ধান্ত হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাদিসকে নিয়ে পার্ক স্ট্রিট থানার একটি দল রওনা দেবে বেরিলিতে। অজন্তা লেদার্স ফ্যাক্টরির মালিক খবর পেয়ে মাঝরাতেই চলে এসেছিলেন থানায়। বললেন, হাদিসের প্লেনভাড়া তিনি দেবেন, সকালের ফ্লাইটে দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে গাড়িতে বেরিলি বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

সাততাড়াতাড়ি টিকিট জোগাড়ে সাহায্য করল থানা, প্লেনেই যাওয়া হল ১৬ অগস্টের ভোরে। হাদিসের সঙ্গে সামসুদ্দিন ছাড়াও গেলেন আলমগির। হাদিসের স্ত্রী ততক্ষণে শয্যা নিয়েছেন, অসংলগ্ন কথা বলতে শুরু করেছেন। সামলানোর জন্য কলকাতায় থেকে গেলেন কুদ্দুস-একলাখ।

বেরিলি পৌঁছতে ১৬ অগস্ট বিকেল হয়ে গেল। ছেলের দেহ শনাক্ত করলেন হাদিস, এবং করেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। পোস্টমর্টেম বেরিলিতেই হল। যেমন ভাবা গিয়েছিল, শ্বাসরোধ করেই মারা

হয়েছিল হারুনকে। শরীরের অন্য কোথাও কোনও ক্ষতচিহ্ন ছিল না।

দিনেদুপুরে একটা বাচ্চা ছেলেকে কিডন্যাপ করল কে বা কারা, এবং দেহ পাওয়া গেল কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের বেরিলি স্টেশনে, ট্রাঙ্কবন্দি অবস্থায়! এমনটা কখনও ঘটেনি কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে। কারা ঘটাল?

১৫ অগস্টের মাঝরাতেই ঘণ্টাখানেক আলাদা করে হাদিসের সঙ্গে কথা বলেছিলেন অফিসাররা। পরের দিন সকালে ফ্লাইট, পুত্রশোকে বাক্‌রুদ্ধ। তবু কিছু প্রশ্ন তো না করলেই নয়।

—কোনও শত্রু ছিল আপনার?

—না স্যার, ছাপোষা মানুষ, বউ-বাচ্চা নিয়ে থাকি। কোনও শত্রুতা নেই।

—কাউকে সন্দেহ হয়?

—না স্যার। হারুনকে কেন মারল স্যার? ও তো কোনও ক্ষতি করেনি কারওর। আমার সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কাউকে সন্দেহ হয় না। কাকে সন্দেহ করব? আচ্ছা বডি কি সত্যিই হারুনের? কোথাও কোনও ভুল হচ্ছে না তো?

একমাত্র ছেলের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে ট্রাঙ্কে, সুদূর উত্তরপ্রদেশে। মাথা কাজ না করারই কথা। এই মানসিক অবস্থায় কিছু জানতে চাওয়া এবং ঠিকঠাক উত্তরের প্রত্যাশা করাটাই অনুচিত। হাদিসকে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসেন তদন্তকারী অফিসার আশিক। থানায় ফেরার পথে মাথায় পাক খেতে থাকে একাধিক সম্ভাবনা।

প্রথম প্রশ্ন, কিডন্যাপ যে বা যারা করেছে, সে বা তারা মুক্তিপণের টাকা নিতে এল না কেন পার্ক সার্কাসে চার নম্বর ব্রিজের কাছে? টাকা না পেয়েই মেরে দিল? এমন তো হওয়ার কথা নয়।

প্রশ্ন নম্বর দুই, পঁচিশ হাজার টাকার জন্য অপহরণ এবং খুন? পেশাদার গ্যাং খোঁজখবর নিয়ে কাজে নামে। যার থেকে মুক্তিপণ চাইব, তার সেটা দেওয়ার মতো সামর্থ্য আছে কি না সেটা নিশ্চিত জেনে নেয় আগেভাগে খোঁজখবর করে। হাদিস সামান্য চাকুরে, মাস গেলে সাকুল্যে মাইনে হাজার তিনেক। তিনি কোত্থেকে পঁচিশ হাজার দেবেন এক কথায়? ন্যূনতম হোমওয়ার্ক করল না অপহরণকারীরা?

তিন, মোটিভটা কী? টাকা যে নয়, বোঝাই যাচ্ছে। হাদিস অল্পক্ষণের জেরায় বলেছেন, কোনও শত্রু নেই। তা হলে? বেরিলি থেকে ফিরুন, তারপর হাদিসকে আর একবার বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ না করলেই নয়। পারিবারিক কোনও ঝামেলা, যার উৎস আদৌ কলকাতাতেই নয়, গয়ার বাড়িতে? বা অন্য কোথাও? ফ্যাক্টরিতে কোনও গোলমাল?

চার, মৃতদেহ বেরিলি স্টেশনে পৌঁছল কী করে? এত জায়গা থাকতে বেরিলি কেন? দেহ লোপাটের অনেক জায়গা আছে শহরে বা তার কাছেপিঠে। হারুন স্কুল থেকে ১৩ তারিখ বেরিয়েছিল ছুটির পর। আর বাড়ি ফেরেনি। বডি পাওয়া গিয়েছে ১৫ তারিখ রাতের দিকে বেরিলি স্টেশনে। অপহরণের পর হারুনকে নিয়ে ট্রেনে করে বেরিলি রওনা দিয়েছিল কিডন্যাপাররা? খুনটা ট্রেনে হয়েছিল?

পাঁচ, দিনের বেলা, রিপন স্ট্রিটের মতো জনবসতিপূর্ণ এলাকায় একটা ছেলেকে কে বা কারা তুলে নিয়ে গেল, কেউ দেখল না? অস্বাভাবিক নয়? তা হলে কি পরিচিত কেউ যুক্ত? কাল প্রথম কাজ, স্কুলে যাওয়া। হারুনের ক্লাসে এবং অন্য ছাত্রদের কাছে জানতে চাওয়া, কেউ কিছু দেখেছিল? দারোয়ান এবং অন্যান্য কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন।

ছয়, পুরনো ক্রাইম রেকর্ড আজই ঘাঁটতে হবে, প্রয়োজনে রাত জেগে। শহরে গত পাঁচ বছরে কতগুলো কিডন্যাপিং হয়েছে, কেসগুলোর সমাধান হয়েছে কি না, হলে অভিযুক্তরা এখন কোথায়, জেলে না জামিনে বাইরে, খোঁজ নিতে হবে। পুরনো কিডন্যাপারদের ছবি জোগাড় করতে হবে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের CRS (Crime Record Section) থেকে।

সাত, নতুন কোন গ্যাং? কিডন্যাপিং ছিঁচকে অপরাধীর কম্মো নয়। সাধারণত পেশাদার এবং পোড়খাওয়া গ্যাং-ই করে থাকে। পঁচিশ হাজারের জন্য একটা বাচ্চাকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে দেওয়া, নাহ, হিসেব মিলছে না। একেবারে আনকোরা কোনও চক্র হলে অবশ্য অন্য কথা। পঁচিশ হাজার খুব বেশি টাকা নয় হয়তো, কিন্তু নেহাত কমও না, বিশেষ করে যদি কোনও বেপরোয়া উঠতি গ্যাং হয়।

আট, ঘুরেফিরে আটকে যাওয়া সেই প্রথম প্রশ্নেই, যে বা যারাই কাজটা করুক, টাকা তো হাতে আসেইনি। তার আগেই মেরে দিল? টাকা হাতে পাওয়ার পর মেরে ফেলার ঘটনা আছে। অপহৃতের পক্ষে যাতে পরে কিডন্যাপারদের চিনিয়ে দেওয়ার সুযোগ না থাকে, অনেক গ্যাং টাকা পাওয়ার পর খুন করে সেই সম্ভাবনাটুকুও নির্মূল করে দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তো সেই থিয়োরিও খাটছে না। তা হলে?

নয়, বাবা-মাকে বাদ দিলে হারুনের সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল কুদ্দুস। হারুনের সঙ্গে রোজই ফুটবল মাঠে অনেকটা সময় কাটাত কুদ্দুস, গল্পগুজব করত। হারুনের ব্যাপারে কুদ্দুসের সঙ্গে কালই কথা বলা দরকার। কে সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল, কী খেতে ভালবাসত, অন্য পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি, জানা জরুরি।

যেমন দরকার সামসুদ্দিন, আলমগির আর একলাখকেও জিজ্ঞাসাবাদের। ওঁরা ঘনিষ্ঠ ছিলেন হাদিসের। পরিবারের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এবং শোক সামলে কিছুটা ধাতস্থ হলে হাদিসের স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলা দরকার। বাইরে থেকে আর কতটুকুই বা বোঝা যায়, কে বলতে পারে খুনের মোটিভ হয়তো আদৌ মুক্তিপণ নয়, অজানা অভাবিত কিছু?

১৬ অগস্ট, ১৯৯৪, সোমবার সকাল পৌনে আটটা। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে আড়মোড়া ভাঙছে শহর।

ফার্স্ট পিরিয়ড চলছে Progressive Day School-এ। আশিক পৌঁছলেন জনাদুয়েক অফিসারকে নিয়ে, ডেকে নিয়েছেন কুদ্দুসকেও। প্রিন্সিপালের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা সেরে নিলেন আশিক। ঘটনার কথা এখনও কাগজে বেরোয়নি, তবে আজকের মধ্যে জানাজানি হবেই। কাল ফলাও করে বেরবেই ন'বছরের স্কুলছাত্রের অপহরণ এবং খুনের খবর। তার আগে ছাত্রদের কিছু না জানাতে অনুরোধ করলেন স্কুল কর্তৃপক্ষকে। স্কুলের শিক্ষক-অশিক্ষক সমস্ত কর্মীদের তালিকা প্রয়োজন। আর, ক্লাস ওয়ানের ছাত্রদের সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার, কখন সম্ভব?

—এখনই চলুন, তবে বাচ্চারা যাতে ভয় পেয়ে না যায়, সেটা একটু ...

—শিয়োর।

ক্লাসে ঢুকেই আশিক বুঝতে পারেন, বোকার মতো কাজ করে ফেলেছেন। ইউনিফর্ম পরে আসা ঠিক হয়নি, সিভিল ড্রেসে আসা উচিত ছিল। ক্লাস ওয়ান, কতই বা বয়স ওদের? বইখাতা নিয়ে কচিকাঁচার দল, বসে আছে বেঞ্চে। পুলিশ দেখে ভয় পেয়ে গেছে, চোখেমুখে শঙ্কার জ্যামিতি।

—এই পুলিশ আঙ্কল তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলবেন। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

ক্লাসটিচার শাহনাজের আশ্বাসে যে বিশেষ কাজ হয়নি, বাচ্চাদের দেখেই বোঝেন আশিক। লাভ হবে না জেনেও মুখ খোলেন, এসেই যখন পড়েছেন।

—হারুন, তোমাদের বন্ধু, আজকেও অ্যাবসেন্ট। ও বোধহয় দুষ্টুমি করে বাড়িতে না বলে অন্য কোথাও একটা লুকিয়ে রয়েছে। ওর বাবা-মা খুব চিন্তা করছেন। লাস্ট ফ্রাইডে যখন ছুটি হয়েছিল, তোমরা কি কেউ ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলে?

পিনড্রপ সাইলেন্স।

—কেউ বলতে পারবে মনে করে, স্কুল থেকে বেরনোর পর হারুন কোনদিকে গিয়েছিল? তোমরা কেউ ছিলে সঙ্গে?

বাচ্চারা স্পিকটি নট।

আশিক বেরিয়ে আসেন। নাহ, এভাবে হবে না। কাল-পরশু অন্য অফিসারকে সিভিল ড্রেসে পাঠিয়ে

টিফিন টাইমে কয়েকজন বাচ্চার সঙ্গে আলাপ জমাতে হবে। ব্রাইট স্ট্রিটের আশেপাশে, মানে হারুনের বাড়ির কাছাকাছি, স্কুলের অন্য কোন কোন ছাত্রের বাড়ি, সেটা বার করতে হবে স্কুলের রেজিস্টার থেকে। ওদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

প্রিন্সিপালের ঘরে ফিরে আসা হল। রয়েছেন আরও দু'-তিনজন সিনিয়র টিচার। ছাত্রদের

নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন, অভিভাবকদের ছাড়া ছুটির পর বাচ্চাদের বেরতে দেওয়া না-দেওয়া নিয়ে নতুন নিয়ম চালু করার সময় হয়েছে, এইসব আলোচনা চলছে টুকটাক। কথাবার্তায় ছেদ পড়ে শাহনাজের আওয়াজে।

—স্যার, একটা কথা ছিল।

প্রিন্সিপাল তাকান। শাহনাজের পাশেই একটু ভীতসন্ত্রস্ত মুখে দাঁড়িয়ে এক ছাত্রও।

—স্যার, সাব্বির, হারুনের ক্লাসমেট। কিছু বলতে চায় মিস্টার আশিককে। তখন ভয় পেয়ে গিয়েছিল হঠাৎ পুলিশ দেখে।

আশিক ঝটিতি উঠে দাঁড়ান। বাচ্চাটা কিছু দেখেছিল? কী বলতে চায়? ক্লু বলতে এখনও পর্যন্ত কিছুই হাতে নেই। বাচ্চাটার থেকে মিলতে পারে আদৌ?

—আঙ্কল, ফ্রাইডে ছুটির পর আমি আর হারুন একসঙ্গে বেরিয়েছিলাম। রোজই একসঙ্গে যাই।

—ফ্রাইডেতে কী হল?

—বাড়ির কাছে এসে হারুনকে 'বাই' বলার সময় একটা লোক হারুনকে ডাকল।

—তোমার বাড়ি কোথায়?

—কাছেই।

—তারপর?

—তারপর হারুন খুশি মনে লোকটার সঙ্গে চলে গেল।

—খুশি মনে?

—খুশি মনে।

—লোকটাকে দেখলে চিনতে পারবে?

—ইয়েস স্যার।

—স্যার নয়, আঙ্কল।

আশিক গাল টিপে দেন সাব্বিরের। দ্রুত চিন্তা করতে থাকেন। বলছে, দেখলে চিনতে পারবে। মানে চেহারাটা মনে আছে। ছবি আঁকানো দরকার। একটা আলোর রেখা দরকার ছিল, সেটা বাচ্চাটা দিয়েছে। ক্যাডবেরি চকোলেট তো প্রাপ্যই একটা।

বাচ্চাটির হাত ধরে বেরিয়ে আসেন শাহনাজ। পিছুপিছু আশিক, প্রিন্সিপাল এবং অন্যান্য শিক্ষকরা। আশিক হাঁক দেন, কুদ্দুস, একটা ক্যাডবেরি কিনে আনো তো চটপট।

কুদ্দুস দাঁড়িয়ে ছিলেন গেটের কাছে, পুলিশের গাড়ির পাশেই। আশিকের ডাকে পিছন ফেরেন এবং ফুট বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কুদ্দুসকে দেখে শাহনাজের হাত জোরে চেপে ধরে সাব্বির।

—কী হল?

—মিস, ওই আঙ্কলটা! ওর সঙ্গেই হারুন খুশি মনে চলে গেছিল ফ্রাইডে।

আশিক মুহূর্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। কুদ্দুসও। দু'জনে চোখাচোখি হয়। কয়েক সেকেন্ড মাত্র, কুদ্দুস রাস্তার দিকে দৌড় শুরু করার উপক্রম করতেই চিৎকার শুনতে পান গাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সহকর্মী অফিসার।

—ধরো ওকে!

থানার গাড়ির ড্রাইভারও ব্যাপার বুঝে লাফিয়ে নামেন। পালাবার পথ ছিল না কুদ্দুসের। কত দৌড়বে?

উসেইন বোল্ট তো নন।

শেষমেশ কুদ্দুস? হারুনের কুদ্দুসচাচা? কিন্তু কেন?

—একা করিনি স্যার! একলাখও ছিল।

পার্ক স্ট্রিট থানার ওসি-র চেম্বারে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকা কুদ্দুসের মুখ থেকে অস্ফুটে বেরোয় কথাগুলো। সঙ্গে সঙ্গে থানার গাড়ি স্টার্ট দেয় দেদার বক্স লেনে, একলাখের ঠিকানায়।

—কেন করলি ওইটুকু বাচ্চাকে খুন?

কুদ্দুসের জবানবন্দিতে খুলতে থাকে রহস্যের জট। এবং মোটিভের বৃত্তান্ত শুনে তাজ্জব হয়ে যান অফিসাররা। এত তুচ্ছ কারণে ন'বছরের একটা ছেলেকে এভাবে মেরে ফেলা যায়?

—হাদিসভাইয়ের জন্যই একলাখ আর আমি চাকরিটা পেয়েছিলাম। সামসুদ্দিনভাই, আমার আর একলাখ, দু'জনেরই দূরসম্পর্কের আত্মীয় হন। হাদিস খুব মানত সামসুদ্দিনভাইয়ের কথা। উনি অনুরোধ করায় ফেলতে পারেননি। মালিককে অনেক বলেকয়ে আমাদের চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছিল হাদিসভাই।

—বেশ, তা সেই হাদিসের ছেলেকেই খুন করে কি ঋণশোধ করলি?

ফের দু'হাতে মুখ ঢাকে কুদ্দুস।

—মাথায় শয়তান ভর করেছিল স্যার। আমি চাইনি এর মধ্যে জড়াতে, একলাখের কথাতে করে ফেলেছি...

—ওটা তুই আগে ধরা পড়েছিস বলে বলছিস। একলাখ আগে ধরা পড়লে বলত, তোর কথাতে করেছে। দেখা আছে ওসব। মারলি কেন বাচ্চাটাকে?

—চাকরি পাওয়ার পর হাতে কিছু পয়সা আসত স্যার মাস গেলে। আগে তো এর থেকে ওর থেকে চেয়েচিন্তে চালাতে হত। আমি আর একলাখ প্রায় রোজই মদ খেতাম চাকরি জোটার পর। কাজে যেতে দেরি হয়ে যেত প্রায়ই। একদিন সুপারভাইজার খুব বকাবকি করল, কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নোটিস ধরাল। আমরা দু'জন সামসুদ্দিনভাইকে বললাম হাদিসভাইকে বলতে। হাদিসভাই মালিককে বোঝাল, আর একবার শেষ সুযোগ দিতে। মালিক অন্ধের মতো ভালবাসতেন হাদিসভাইকে। সুযোগ দিলেন, চাকরিটা বেঁচে গেল।

—তারপর?

—কিছুদিন আমরা মন দিয়ে কাজ করলাম, তারপর আবার যেই কে সেই। একলাখ শরীরের উপর এত অত্যাচার করত যে অসুস্থই হয়ে পড়ল। ফিরে গেল ছাপড়ার বাড়িতে। প্রায় ছ'মাস পরে ফিরল এই মাসখানেক আগে। ফ্যাক্টরিতে গেল, মালিক বলল, আর কাজে নেবে না। একলাখ কাজের মধ্যেই মদ খেত, হাদিসভাই অনেক বারণ করা সত্ত্বেও শুনত না। মালিক কিছুতেই আর কাজে নিল না।

একলাখ আবার ধরল সামসুদ্দিনভাইকে। এবার আর হাদিসভাই রাজি হল না মালিককে অনুরোধ করতে। স্পষ্ট বলে দিল, অনেকবার সাবধান করেছি, শুধরোসনি। আমার কথায় মালিক শেষ সুযোগ দিয়েছিল, সেই কথার দাম দিসনি, আমি এখন কোন মুখে বলব? তুই অন্য চাকরি খুঁজে নে। তর্কাতর্কি হল খুব।

—একলাখের ব্যাপারটা বুঝলাম। কিন্তু তুই তো দিব্যি চাকরি করছিলি...

—কোথায় আর করছিলাম স্যার? চাকরি তো টেম্পোরারি, পার্টটাইম। মালিক কিছুতেই পার্মানেন্ট করছিল না। সুপারভাইজার রিপোর্ট দিয়েছিল, দেরি করে আসি, কাজে ফাঁকি দিই। একলাখকে যখন আর কাজে রাখল না কোম্পানি, আমিও চিন্তায় পড়ে গেলাম। দরবার করলাম হাদিসভাইয়ের কাছে, তুমি একবার বললেই চাকরিটা পাকা হয়ে যায়। মাইনেটা বাড়ে। এত অল্প টাকায় আর চলছে না।

হাদিসভাই মুখের উপর বলে দিল, এখন বছরখানেক মুখ বুজে কাজ কর। দেখলি তো

একলাখের অবস্থা। সবাই জানে তোর আর একলাখের ব্যাপারস্যাপার। এখন কোনও চান্সই নেই

পার্মানেন্ট হওয়ার, বেশি হইচই করলে যেটা আছে, সেটাও যাবে।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল আমার। সেদিনই চাকরি ছেড়ে দিলাম। হাদিসভাইকে বললাম, তোমার দয়ার চাকরি আমি পায়ের তলায় রাখি। হাদিসভাইও রেগে গেল। বলল, তোদের দু'জনকে চাকরি জোগাড় করে দেওয়াই ভুল হয়েছে আমার।

—হুঁ...

—অমন ঝামেলা তো কতই হয়। আমি অত মনে রাখিনি স্যার। মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। হাদিসভাইদের বাড়ি তারপরও যেতাম, হারুনকে ফুটবল খেলতে নিয়ে যেতাম। একলাখ কিন্তু চাকরি যাওয়াটা ভুলতে পারছিল না। একদিন ওর দেদার বক্স লেনের বাড়িতে ডাকল। মদ কিনে এনেছিল, অনেক রাত অবধি খেলাম। একলাখ আমার মনে বিষ ঢোকাল।

—আর তুই সে-বিষ ঢুকতে দিলি?

—মাথার ঠিক ছিল না স্যার। হাতে কাজকম্মো কিছু নেই। একলাখ বোঝাল, আমাদের দু'জনের চাকরি ইচ্ছে করলেই হাদিসভাই বাঁচাতে পারত। কিন্তু করেনি। শোধ নেব ওর জীবনটাও তছনছ করে দিয়ে। আমার যে কী ভূত চেপেছিল মাথায়, রাজি হয়ে গেলাম।

ছক কষলাম দু'জনে মিলে। হারুনকে কিডন্যাপ করব, পঁচিশ হাজার চাইব। টাকা নিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে ব্যবসা করব। হারুনকে মেরে ফেলতেই হবে, ছেড়ে দিলে তো বলেই দেবে আমাদের নাম।

—কিন্তু টাকা তো আনতেই গেলি না ... কেন?

—কী করে যাব স্যার? যেদিন দুপুরে হারুনকে তুললাম, সেদিন সন্ধে থেকে তো হাদিসভাইয়ের সঙ্গে। এখানে খুঁজছি, ওখানে খুঁজছি হারুনকে, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে। হাদিসভাই টাকা নিয়ে বেরল সাড়ে ন'টায়, আমাদের বলল, তোরা থাক, ভাবিজানকে সামলা। মেয়েটাকে দ্যাখ।

তখন আমার বা একলাখের ব্রাইট স্ট্রিট থেকে বেরনোর উপায়ই ছিল না। ঘরভরতি লোক, কান্নাকাটি চলছে। প্ল্যান ভেস্তে গেল আমাদের।

—হারুনকে মারলি কখন?

কীভাবে খুন হয়েছিল হারুন, ফিরে দেখা ফ্ল্যাশব্যাকে।

১৩ আগস্ট, ১৯৯৪। স্কুল ছুটি হল, সাব্বিরের সঙ্গে বেরল হারুন, হেঁটে বাড়ি ফিরবে রোজকার মতো। আবদুল লতিফ স্ট্রিটে সাব্বিরের বাড়ির কাছে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কুদ্দুস। আর একটু দূরে একলাখ। কুদ্দুস হাত নেড়ে ডাকল হারুনকে। কুদ্দুসচাচাকে হঠাৎ ওখানে দেখে খুব খুশি হারুন, বায়না ধরল আইসক্রিমের। কুদ্দুস বলল, বেশ আমার বাড়িতে চলো। ওখানে আইসক্রিম আনব, খাওয়ার পর ব্রাইট স্ট্রিটে পৌঁছে দেব। একলাখও যোগ দিল কুদ্দুস-হারুনের সঙ্গে। একলাখের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ ছিল না হারুন। তবে চিনত বাবা আর কুদ্দুসচাচার বন্ধু হিসেবে।

হারুনকে নিয়ে কুদ্দুস-একলাখ গেল ৩৬ আগা মেহেন্দি লেনের ভাড়াবাড়িতে। পরিকল্পনা ছিল ওখানেই খুনটা করার। ঢোকার মুখে দেখা হয়ে গেল এক প্রতিবেশীর সঙ্গে, যিনি হারুনের গাল টিপে আদর করে দিলেন। হারুনকে নিয়ে বাড়িতে ঢোকার সাক্ষী রাখা ঠিক হবে না, এই ভেবে হারুনকে নিয়ে যাওয়া হল একলাখের দেদার বক্স লেনের আস্তানায়। এই বলে, আইসক্রিম একলাখ চাচার বাড়িতে আছে।

যাওয়ার পথে দেখা হল শেখ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে। দেদার বক্স লেনেই যাঁর সবজির দোকান। হারুনের বাবাকে চেনেন, সেই সূত্রে হারুনকেও। আদর করে বললেন, টফি খাবে? হারুন বলল, না না, আইসক্রিম খেয়ে বাড়ি ফিরব।

কোথায় আইসক্রিম? দেদার বক্স লেনের ফ্ল্যাটে ঢোকার পরই হারুন শুনল, কুদ্দুসচাচা বলছে একলাখচাচাকে, আর দেরি করে লাভ নেই, শেষ করে দিই!

কুদ্দুস-একলাখ গলা টিপে ধরলেন হারুনের। দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু আসতে আর কতক্ষণ? কী-ই বা প্রতিরোধ সম্ভব ওইটুকু বাচ্চার পক্ষে?

বড় স্টিলের ট্রাঙ্ক কিনে কুদ্দুস দিনকয়েক আগে রেখে দিয়েছিল আগা মেহেন্দি লেনের বাড়িতে। রিকশা নিয়ে কুদ্দুস ফের গেল আগা মেহেন্দি লেনের ফ্ল্যাটে। ট্রাঙ্ক নিয়ে ফিরল দেদার বক্স লেনে। হারুনের দেহ ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে দেওয়া হল।

যেমন আগে থেকেই ভাবা ছিল, ট্রাঙ্কবন্দি দেহ নিয়ে বেরল দু'জনে। এবং বেরিয়ে কাছেই

পেমেন্টাল গার্ডেন লেনের একটা পিসিও বুথ থেকে মুক্তিপণ চেয়ে একলাখ ফোন করল হাদিসকে। এরপর ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হাওড়া স্টেশন।

বিকেল ৪-১৭ মিনিটের হাওড়া-কাঠগোদাম এক্সপ্রেসের লেডিজ কম্পার্টমেন্টে কুদ্দুস-একলাখ তুলে দিল ট্রাঙ্ক। যা প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে পৌঁছল বেরিলিতে। ট্রেন জংশনে থামার পর যাত্রীরা নেমে গেলে সাফাইকর্মীদের চোখে পড়েছিল। কেউ হয়তো ফেলে গেছেন, এই ভেবে প্ল্যাটফর্মে ট্রাঙ্ক নামিয়ে রেখেছিলেন। সান্ধ্য টহলদারিতে চোখে পড়েছিল বেরিলির জিআরপি-র কর্মীদের।

রহস্য উন্মোচনের পর বাকি তদন্তভার পড়েছিল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হোমিসাইড শাখার তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর বিকাশ চট্টোপাধ্যায়ের উপর। যিনি সফল কর্মজীবন শেষে অবসর নিয়েছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হিসেবে।

কুদ্দুসকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, খবর পেয়ে গিয়েছিল একলাখ। পালিয়েছিল রাজ্য ছেড়ে। সহজে পাকড়াও করা যায়নি, বিহারে গোয়েন্দারা দিনের পর দিন ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা সত্ত্বেও। অক্টোবরের শেষে দিনদুয়েকের জন্য এসেছিল কলকাতায়, সোর্স মারফত খবর পেয়েছিলেন বিকাশ। বিহারে আর ফেরা হয়নি একলাখের, ঠাঁই হয়েছিল শ্রীঘরে।

বিকাশ ছিলেন সেই গোত্রের অফিসার, যাঁরা কোনও ফাঁকফোকর রাখতেন না তদন্তে, ছেঁটে ফেলতেন ন্যূনতম 'চান্স ফ্যাক্টর'ও। সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রস্তুত করেছিলেন পেশাদারি পারদর্শিতায়। জাল বুনেছিলেন নিপুণ, যাতে হীনতম অপরাধের শাস্তি পায় অভিযুক্তরা।

ট্রাঙ্কটা কিনেছিলেন কুদ্দুস মল্লিকবাজারের একটা দোকান থেকে, ২২০ টাকা দিয়ে। দোকান চিহ্নিত হল কুদ্দুসের বয়ান অনুযায়ী, বাজেয়াপ্ত করা হল সংশ্লিষ্ট ক্যাশমেমোর কপি। দোকানদার কুদ্দুসকে চিনিয়ে দিলেন আদালতে। হ্যাঁ, এই লোকটাই কিনেছিল।

মুক্তিপণের ফোনটা পেমেন্টাল গার্ডেন লেনের যে STD বুথ থেকে করা হয়েছিল, তার হদিশ মিলল কুদ্দুসকে জেরা করে। বুথের মালিক ওয়াসিম মুবারকি জানালেন, কে ফোনটা করেছিল, চিনতে পারবেন মুখ দেখলে। আদালতে চিনিয়ে দিলেন কুদ্দুসকে, ফোন করার সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একলাখকেও। বুথের 'কল রোল' বাজেয়াপ্ত করা হল, যা নিশ্চিত প্রমাণ করল হাদিসের ফ্যাক্টরিতে ১৩ অগস্ট সোয়া তিনটের ফোন কল।

রিপন স্ট্রিট এলাকায় বা আশেপাশের ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে খোঁজখবর করে সন্ধান পাওয়া গেল সেই ট্যাক্সিরও, যাতে চড়ে ট্রাঙ্কবন্দি মৃত হারুনকে নিয়ে কুদ্দুস-একলাখ রওনা দিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। WB-04/2052-র ড্রাইভার মহম্মদ আকবর সাক্ষ্য দিলেন আদালতে। সেই বিকেলের দুই আরোহীকে চিনিয়ে দিলেন, যারা একটা বড় ট্রাঙ্ক নিয়ে উঠেছিল গাড়িতে।

যে রিকশা করে ট্রাঙ্ক নিয়ে আগা মেহেন্দি লেন থেকে একলাখের দেদার বক্স লেনের বাড়িতে এসেছিলেন কুদ্দুস, খোঁজ মিলল তার চালকেরও। মহম্মদ সামসাদ, যার বয়ান পেশ হল আদালতে এবং যিনি দেখেই চিহ্নিত করলেন কুদ্দুসকে।

আগা মেহেন্দি লেনের যে প্রতিবেশী হারুনকে দেখেছিলেন কুদ্দুস-একলাখের সঙ্গে, দেদার বক্স লেনের যে সবজিবিক্রেতা হারুনকে টফি খাওয়াতে চেয়েছিলেন, তাঁদের বয়ানও গুরুত্বপূর্ণ পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসেবে

জায়গা পেল চার্জশিটে।

কফিনে শেষ পেরেক ঠোকার কাজটা বাকি ছিল। সম্পূর্ণ হল হারুনের প্রাণের বন্ধু ছোট্ট সাব্বির রহমানের বয়ানে। একসঙ্গে স্কুল ছুটির পর বেরনো, কুদ্দুসের ডেকে নেওয়া হারুনকে আর হারুনের খুশি মনে চলে যাওয়া। শনাক্তকরণে মুহূর্তের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত দেখায়নি সাব্বিরকে। সোজা আঙুল দেখিয়েছিল কুদ্দুসের দিকে, এই আঙ্কলটাই!

দীর্ঘ বিচারপর্বের পর ২০০৩ সালে দোষী সাব্যস্ত হয় কুদ্দুস-একলাখ, দণ্ডিত হয় যাবজ্জীবন কারাবাসে। উচ্চ আদালতে মুক্তির আবেদন অগ্রাহ্য হয়।

'The Murder Room', অন্যতম সেরা উপন্যাস ফিলিস ডরোথি জেমসের। যে প্রখ্যাত ব্রিটিশ গোয়েন্দাকাহিনি লেখিকা পিডি জেমস নামেই পরিচিত পাঠকদের কাছে। উপন্যাসটিতে লিখেছিলেন, "All the motives for murder are covered by four Ls: Love, Lust, Lucre and Loathing."

ঠিকই। খুনের নেপথ্যে ওই চারটে কারণই থাকে শেষ বিচারে। এক, প্রেম। দুই, কামনা বা যৌন-ঈর্ষা। তিন, অর্থলোভ। চার, তীব্র রাগ-ঘৃণা-বিদ্বেষ। হারুন শিকার হয়েছিল তালিকায় চার নম্বর অনুভূতির।

কী বিচিত্র এই দ্বেষ!

মধ্যরাতের কিড স্ট্রিটে

কোথায় : লালবাজার কন্ট্রোল রুম।

কবে : ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

কখন : রাত পৌনে দুটো।

ফোন বাজল ঝনঝন। রাতের শিফটের অফিসার তুললেন।

—দেরি হচ্ছে কেন? ওসি পার্ক স্ট্রিট বলছি। ফোর্স পাঠান।

—বেরিয়ে গেছে একটু আগে। পৌঁছে যাবে।

—লোকেশন নিন। ফোর্স দরকার। অ্যাজ় আর্লি অ্যাজ় পসিবল। না হলে সামলানো যাচ্ছে না।

—রজার।

নড়েচড়ে বসে কন্ট্রোল রুম। শিফট ইনচার্জ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আন্দাজ করেন, আজ রাতটা ঝামেলার হতে যাচ্ছে। ওয়াকিটকি হাতে নিতে যেটুকু সময়। ধাতব শব্দ ছিটকে আসে পরমুহূর্তে, 'কন্ট্রোল রুম কলিং। হেভি রেডিয়ো ফ্লাইং স্কোয়াড টেন, লোকেশন প্লিজ়?'

—রিপ্লায়িং, অ্যাপ্রোচিং ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম।

—পৌঁছে ওসি-র কাছে রিপোর্ট করুন। ডিসি সাউথ অন ওয়ে।

সে-রাতে জমাট ঠান্ডা শহরে। এখনকার মতো চটজলদি কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে বিশ্বাসী ছিল না তখনকার পৌষ-মাঘ। ঠান্ডা শীতের রাতে লেপের আদরের ওম সহজে ক্রিজ় ছাড়ত না সে-সময়। রাস্তায় বেরলে ফুল সোয়েটার বা শাল না হলেই নয়।

বাড়তি ফোর্স যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছল, গলদঘর্ম স্থানীয় পুলিশ। শ'তিনেক লোকের কৌতূহলী দঙ্গল গেটের বাইরে। ঢুকতে চায় ভিতরে। আটকাচ্ছে পুলিশ, কী করে ওভাবে আমজনতাকে ঢুকতে দেওয়া যায় ভিআইপি এলাকায়? খুনের ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে কিছুক্ষণ হল, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা আসছেন, কলকাতা পুলিশের একাধিক আইপিএস অফিসার পৌঁছে গিয়েছেন। তাবড় তাবড় রাজনৈতিক নেতাদেরও গাড়ি ঢুকছে একের পর এক। লাল বাতির ছড়াছড়ি।

ভাগ্যিস গুচ্ছের টিভি চ্যানেল ছিল না তখন। থাকলে অবস্থা আরও সঙ্গিন হত। ক্যামেরা আর বুমের দাপটে নতুন সমস্যা তৈরি হত, স্পট থেকে মিনিটে-সেকেন্ডে-মাইক্রোসেকেন্ডে 'ব্রেকিং নিউজ়' আর এক্সক্লুসিভের ইঁদুরদৌড় সামলাতে ঘাম ছুটে যেত পুলিশের। তবু, সেই মূলত দূরদর্শন-শাসিত সময়েও সাংবাদিকদের জটলা নেহাত কম নয় রাতবিরেতে।

কোনওভাবে ভিড়ভাট্টা সামলে বছর পঁয়ত্রিশের শোকস্তব্ধ সদ্য-স্বামীহারাকে যখন ধরে ধরে গেটের দিকে আনছেন পরিচিত-পরিজনেরা, ঘড়ির কাঁটা তিনটের চৌকাঠ পেরিয়ে গিয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় নির্বাক মহিলা তখন প্রায় চলচ্ছক্তিহীন।

পুলিশের তখন অনেক কাজ বাকি। ঘটনাস্থলের পুঙ্খানুপুঙ্খ স্কেচ ম্যাপ বানানো, কাদের রাতেই জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন তার তালিকা তৈরি করা, ফরেনসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যত দ্রুত সম্ভব, সিজ়ার লিস্টের লেখালেখি, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো সকাল হলেই, যাতে পরীক্ষার পর সম্ভাব্য রিপোর্টের প্রাথমিক আন্দাজ পাওয়া যায় সন্ধের আগেই। এবং, স্বামীহত্যার সাক্ষী থাকা স্ত্রীর বয়ান নিয়ে FIR নথিভুক্ত

করা।

সাংবাদিকদের ব্যস্ততাও কম নয় তখন। লেট সিটির এডিশনে খবরটা ধরাতেই হবে, যে করে হোক। ফ্রন্ট পেজ নিউজ, নিশ্চিত।

পার্ক স্ট্রিট থানার ওসি-র চেম্বারে বসানো হয়েছে মহিলাকে। পৌনে চারটে বাজে প্রায়, একটু পরেই রাত হাঁটা দেবে ভোরের দিকে। যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন মহিলা পুলিশকর্মীরা। ডিসি ডিডি স্বয়ং থানায় উপস্থিত। অনেক সাধ্যসাধনার পর দুটি বাক্য বেরল দৃশ্যতই বিধ্বস্ত মহিলার মুখ থেকে, 'ম্যায় তো বিলকুল আকেলি হো গয়ি... লাইফ বরবাদ হো গয়া...' কেঁদে ফেললেন বলতে বলতেই।

—শান্ত হন ম্যাডাম, বলুন প্লিজ, ঠিক কী হয়েছিল।

একটু ধাতস্থ হয়ে বলতে শুরু করেন তালাত সুলতানা। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর থেকে নির্বাচিত ফরওয়ার্ড ব্লক বিধায়ক রমজান আলির স্ত্রী।

"কলকাতায় এলে কিড স্ট্রিটের এমএলএ হস্টেলেই উঠি আমরা। ১৩ ডিসেম্বর রমজান সাহেবের সঙ্গেই এসেছিলাম। ওঁর চিকিৎসার প্রয়োজনে। উঠেছিলাম চারতলার রুম নম্বর ৩/১০-এ। গতকাল দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ সুব্বাদিদি (রেণুলীনা সুব্বা, অল ইন্ডিয়া গোরখা লিগের প্রাক্তন বিধায়ক) এল। বলল, 'কোনও রুম খালি নেই, তোদের ঘরে রাতটা থাকতে দিবি?' আমি সুব্বাদিদিকে চিনতাম। আর রমজান সাহেবের সঙ্গে তো দীর্ঘদিনের পরিচয়। বললেন, 'নিশ্চয়ই। আমাদের সঙ্গেই থেকে যান।'

লাগেজ আমাদের ঘরে রেখে সুব্বাদিদি বেরল। ফিরল ছ'টা নাগাদ। রাত সোয়া ন'টায় আবার বেরল ওষুধ কিনতে। ফেরার পর আমরা তিনজন খাওয়াদাওয়া করলাম। সুব্বাদিদি দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি আর রমজান সাহেব সোয়া দশটা—সাড়ে দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ শুনলাম, রাত সাড়ে এগারোটা হবে তখন। আমার আর রমজান সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। সুব্বাদিদির খুব গাঢ় ঘুম, জাগেনি। রমজান সাহেব বললেন, 'বোধহয় মতিন, খুলে দাও। কিছু দরকার আছে হয়তো।'

মতিন ফরওয়ার্ড ব্লকের সর্বক্ষণের কর্মী। ও আর আলম রুম নম্বর ১/৮ —এ ছিল। খুলে দিলাম দরজা। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, কই, কেউ তো নেই করিডরে! তা হলে কি ঘুমের ঘোরে ভুল শুনলাম আমরা? রমজান সাহেব বললেন, 'দরজাটা খুলেই রাখ। মতিনই হবে। পার্টির কাজ নিয়ে কিছু আলোচনা ছিল। সে জন্যই এসেছিল নিশ্চয়ই। দরজা খুলতে দেরি হওয়ায় চলে গিয়েছে। ভেবেছে, ঘুমিয়ে পড়েছি।'

দরজা খুলে রেখেই আমি ঘরের লাগোয়া বারান্দায় গেলাম। ভাবলাম, উঠেই যখন পড়েছি, বাসনকোসনগুলো ধুয়ে রাখি। বাসন গুছোচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন মুখ চেপে ধরল। দেখি, দু'জন লোক, হাতে পিস্তল। গলায় ওটা ঠেকিয়ে কম্বল দিয়ে মুখচাপা দিয়ে হাত-পা বাঁধল কাপড় দিয়ে। টানতে টানতে নিয়ে গেল ভিতরে। দেখলাম আরও দু'জন ঢুকে পড়েছে ঘরে। আমি তখন ভয়ে প্রায় আধমরা। সুব্বাদিদি ততক্ষণে জেগে গিয়েছে টানাহ্যাঁচড়ার শব্দে। রমজান সাহেবও। ওরা সুব্বাদিদিরও মুখ-হাত-পা বাঁধল। ভয় দেখাল, শব্দ করলে জানে মেরে দেবে।

আলনায় থাকা আমার হলুদ শাড়ি দিয়ে রমজান সাহেবের গলায় পেঁচিয়ে ধরল একজন। আমি বাধা দিতে গেলে একজন সজোরে লাথি মারল পেটে, গালি দিল অকথ্য ভাষায়, 'শালি হারামজাদি।' রমজান সাহেব যখন ছটফট করছিলেন, ওরা বলছিল, '১০ তারিখে মিটিং, না? মজা দেখাব।'

আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করল, 'টাকা কই?' তারপর সুটকেসের উপর রাখা মানিব্যাগ থেকে যা টাকাপয়সা ছিল, নিয়ে নিল। ওরা আধঘণ্টা মতো ছিল। বারবার ভয় দেখাচ্ছিল, গুলি করে মেরে দেওয়ার।

ওরা চলে যাওয়ার পর ঘষটে ঘষটে আমি আর সুব্বাদিদি ইন্টারকমের কাছে গেলাম। রমজান সাহেবের কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম না। নিথর হয়ে পড়ে ছিলেন। খুব ভয় করছিল আমার।

কোনওভাবে আমি আর সুব্বাদিদি অনেক চেষ্টা করে আমার হাতের বাঁধনটা খুলতে পারলাম। ফোন

করলাম মতিনের ঘরে। মতিন আর আলম দৌড়ে এল। আমাদের বাঁধন খুলে দিল। রমজান সাহেবের তখনও কোনও সাড়াশব্দ নেই। মতিন ওঁর গলার ফাঁস খুলে দিল। নাড়ি টিপে দেখল কিছুক্ষণ, নাকের কাছে হাত রাখল। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছিল তখন। মতিন ছলছল চোখে বলল, 'রমজান ভাই আর নেই!'

পুরো ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে ঘটল স্যার... ওদের দেখলে চিনতে পারব, খুঁজে বের করে শাস্তি দিন.....।"

ফের কেঁদে ফেললেন তালাত।

একটানা এতক্ষণ কথা বলে হাঁপাচ্ছেন তখন। তালাতকে জলের গ্লাস এগিয়ে দিলেন ডিসি ডিডি, 'নিন ম্যাডাম, আপনার একটু বিশ্রাম দরকার। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব খুনিদের ধরতে, কথা দিচ্ছি।'

এ মামলার কথা অনেকেরই মনে থাকার কথা। জওহরলাল নেহরু রোড ধরে দক্ষিণ দিকে এগোলে পার্ক স্ট্রিটের একটু আগেই বাঁ হাতে কিড স্ট্রিট। রাস্তা ধরে সামান্য হাঁটলেই ডান দিকে এমএলএ হস্টেল। গ্রিলের উঁচু গেট, সামনে সর্বক্ষণের পুলিশি প্রহরা। 'বিধানসভা সদস্য আবাস বিভাগ'-এর গ্লো সাইনবোর্ড চোখ এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

নিরাপত্তা যেখানে নিশ্ছিদ্র থাকার কথা, সেখানেই মাঝরাতে খুন হয়ে গেলেন এক বিধায়ক। তুমুল হইচই হওয়ার কথা। হলও। পুলিশের বাপবাপান্ত করার এমন পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা মিডিয়া হাতছাড়া করে না সাধারণত। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো-র কটাক্ষ নানা রকমফেরে আক্রান্ত করল আমাদের। উত্তাপ যথানিয়মে বাড়ল রাজ্য-রাজনীতিরও।

খুনিদের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার না হলে বাংলা বন্‌ধের হুমকি দিল ফরওয়ার্ড ব্লক। লালবাজারে গঠিত হল দুটি বিশেষ দল। সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকলেন উচ্চপদস্থ কর্তারা। ঘটনার দু'দিনের মধ্যেই মামলার তদন্তভার প্রত্যাশিতভাবেই বর্তাল গোয়েন্দা বিভাগের উপর। তদন্তকারী অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হলেন হোমিসাইড শাখার তৎকালীন ইনস্পেকটর মহম্মদ আক্রম, যিনি চাকরিজীবনের শেষে অবসর নিয়েছিলেন কলকাতা সশস্ত্র পুলিশের অষ্টম ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমিশনার হিসেবে।

বিধানসভা সদস্য আবাস

মহম্মদ রমজান আলি হত্যা মামলা। পার্ক স্ট্রিট থানা, কেস নম্বর ৮২৫, তারিখ ২০/১২/৯৪। ধারা ৩০২/৩৪/৩৯৪/৩৯৭ আইপিসি। খুন, একই উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা, লুঠের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে খুন বা গুরুতর আঘাতের চেষ্টা।

তদন্ত শুরু হল প্রথাগত বিধিনিয়মে। ময়নাতদন্তে কী পাওয়া যাবে, জানাই ছিল। শ্বাসরোধ করে খুন, 'manual strangulation'।

রুম নম্বর ৩/১০-এ ঢুকেই একটা দশ ফুট বাই আট ফুট মতো জায়গা। মোটা পরদা টাঙানো রয়েছে সামনে। যা পেরলে মূল ঘর। পরদার ভিতর থেকে বাইরেটা দেখা যায় না, বাইরে থেকে ভিতরটাও।

যে ঘরে রমজান আলিকে হত্যা করা হয়েছিল

তন্নতন্ন করে খুঁজেও মিলল না 'ডেভেলপ' করার যোগ্য হাত বা পায়ের ছাপ। বেশ কিছু টুকিটাকি জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হল বটে, কিন্তু সেসব নিয়মরক্ষার। ঘেঁটেঘুঁটেও নির্ণায়ক কিছু পাওয়া গেল না। তালাত বলেছিলেন, খুনিদের দেখে চিনতে পারবেন। ছবি আঁকানো হল বর্ণনা অনুযায়ী। ছড়িয়ে দেওয়া হল সোর্সদের মধ্যে, বিভিন্ন থানায়। লাভ হল না।

সূত্র, সে যতই তুচ্ছ হোক, পেলে তবেই না পরের ধাপ! হস্টেলের কর্মী-আবাসিক বা সেদিনের

‘ভিজিটর’-দের বিস্তারিত জেরা করেও অধরাই থাকল তদন্তের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ।

জটিল কেসে আমাদের প্রচলিত পদ্ধতি, তদন্তের অগ্রগতির কাটাছেঁড়া হয় নিয়মিত। গুরুত্বের বিচারে কখনও দু’-তিন দিন অন্তর, কখনও সকাল-বিকেল-সন্ধে। এ মামলা ছিল দ্বিতীয় গোত্রের, আক্ষরিক অর্থেই ঘুম ছুটে গিয়েছিল পুলিশের।

এমনই এক রিভিউ-বৈঠকের আগে তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে তাঁর সহযোগীর কথোপকথন। ঘটনার দিনতিনেক পরের কথা লিখছি।

—স্যার, তালাত সুলতানার বয়ান নিয়ে খটকা লাগছে।

—সে তো আমারও লাগছে, প্রথম দিন থেকেই।

—রাইট স্যার। রমজান দরজা খুলে রাখতে বলবেন কেন? মতিন আসেনি, জানার পরও?

তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, মতিন তো বলছে সে ফোন পেয়েছে রাত একটার পর...

—আর খুনটা হয়েছে, তালাতের বয়ান অনুযায়ী রাত সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। পোস্টমর্টেমও তা-ই বলছে।

—কারেক্ট! এতক্ষণ কী করছিলেন উনি?

—বলছেন তো, অনেক চেষ্টা করে হাতের বাঁধন খুলেছিলেন বলে দেরি হয়েছিল। তারপর ফোন করেছেন।

—হুঁ... ক্রিমিনাল গ্যাং হলে ফোনের লাইন কেটে দিয়ে যেত।

—হয়তো মিস করে গেছে তাড়াহুড়োয়।

—তুমিও আসল ব্যাপারটা মিস করে যাচ্ছ। বাইরে পুলিশ। নিতান্ত পরিচিতের সঙ্গে কেউ ঢুকলে তবেই রেজিস্টারে লেখা হয় না। চার জন অপরিচিত ঢুকে পড়বে এমএলএ হস্টেলে, কেউ খেয়াল করবে না? আর যদি এক এক করে ঢুকেও পড়ে কোনওভাবে, পুলিশ, রিসেপশন, সবার চোখ এড়িয়ে গেল?

—হয়তো সেন্ট্রি কনস্টেবলের ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। শীতের রাত, সেই সুযোগে টুক করে...

—তালাত বলেছেন, সাড়ে এগারোটায় দরজায় টোকা। অন্তত তার পৌনে এক ঘণ্টা আগে সেন্ট্রি চেঞ্জ হয়। ডিউটি ধরেই কেউ ঝিমোবে না। রাত দুটো-আড়াইটা হলে তবু মানা যায়...

—মহিলা বলছেন, লোকগুলোকে দেখলে চিনতে পারবেন। স্পেশিফিক ডিটেলস দিচ্ছেন চেহারার। অথচ লাইট অফ ছিল। কী করে দেখলেন এত?

—হুঁ... ওটা তো সবচেয়ে বড় কন্ট্রাডিকশন...

—তালাতকে অ্যারেস্ট করলে হয় না? শিয়োর কিছু লুকোচ্ছেন। আর রেণুলীনাও কিছু দেখলেন না, এটাও কেমন যেন...

—গ্রেফতার করা যায়... কিন্তু রিস্ক আছে। প্রমাণ ছাড়া কমপ্লেনান্টকে ওভাবে.. অবশ্য আর একবার ইন্টারোগেট করাই যায়। ডিসি-কে বলব ভাবছি আজ।

—বলুন স্যার, এই প্রেশার আর নেওয়া যাচ্ছে না। পলিটিক্যাল মার্ডার বলে বাজার গরম করছে কাগজগুলো। আর তালাত তো ফিরে গেছেন কিষাণগঞ্জে গতকাল।

—এভাবে পলিটিক্যাল মার্ডার হয়? কত জায়গা আছে মার্ডার করার। এমএলএ ছিলেন উনি। জনসংযোগ করতে হত, মিটিং-মিছিল করতে হত। রাজনৈতিক খুন করতে এমএলএ হস্টেলের মতো সিকিয়োর জায়গায় চারজন দল বেঁধে আসবে মার্ডার করতে? হয় কখনও?

—ওই জন্যই তো আরও সন্দেহ। ডেলিবারেটলি মিসলিড করছেন তালাত। আর ভেবে লাভ নেই স্যার, ডিসি-কে বলুন।

বলা হল, আলোচনা হল বিস্তর। প্রমাণ ছাড়া আটক করাতেও সমালোচনার ঝুঁকি প্রচুর। কিন্তু তালাতের

বয়ানে অসংগতির আধিক্য এতটাই, হিসেবে গরমিল এতটাই, ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। আদালত থেকে ওয়ারেন্ট বের করা হল তালাতের নামে। ডিসি ডিডি-র নেতৃত্বে ২৪ ডিসেম্বর বিহার রওনা দিল দল। কিষাণগঞ্জের বাহাদুরপুরের বাড়ি থেকে তালাতকে গ্রেফতার করে কলকাতায় আনা হল ২৬ ডিসেম্বর।

প্রশ্নমালা তৈরিই ছিল। অথচ কাজেই লাগল না তেমন। মিনিট দশেক জেরার পর তালাত নিজেই বললেন, 'মিথ্যে বলেছিলাম। খুনটা রবি করেছিল। রমজান সাহেবের কনফিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট।'

—করল কেন?

—সেটা আদালতে বলব। আপনাদের নয়।

—আদালতে স্বীকারোক্তি দেবেন?

—অবশ্যই, ওখানেই দেব। আপনারা ব্যবস্থা করুন।

—সে না হয় করব। কিন্তু শুরুতে মিথ্যে বলেছিলেন কেন? রবির সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?

—বললাম তো, যা বলার আদালতেই বলব। রবি আমাকে দিদি বলে ডাকত। খুনের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

নির্দিষ্ট দিনে তালাত আদালতে স্বীকারোক্তি দিলেন। 'যাহা বলিব সত্যি বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না'-র পর কী সেই স্বীকারোক্তি? তুলে দিলাম হুবহু।

"আমার এই খুনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। আমি সাধারণ গৃহবধূ। দুই মেয়ে, এক ছেলে। গত মে মাসের পনেরো তারিখে পুরসভা নির্বাচন ছিল উত্তর দিনাজপুরে। তার আগের রাতে, ১৪ মে, ইসলামপুরের হোগলবাড়িতে একটা রাজনৈতিক মারামারি হয়। রমজান সাহেব আহত হন। রবি ছিল ওঁর পিএ। সবসময় সঙ্গে সঙ্গে থাকত। রমজান সাহেবকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়, ভরতি করা হয় ক্যালকাটা হসপিটালে। সেখানে এবং তারপর এমএলএ হস্টেলে আমি প্রাণপণ শুশ্রূষা করি স্বামীর। রবিও সাহায্য করেছিল খুব। ওই সময় রবির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়, অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি আমরা। রমজান সাহেব আমার প্রতি উদাসীন ছিলেন, ভাল ব্যবহার করতেন না।

আমরা কিষাণগঞ্জের বাড়িতে তখন। ফিরে গিয়েছি চিকিৎসার পর। একদিন আমাকে আর রবিকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেন আমার স্বামী। রবির সামনেই অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন আমাকে। রবিকে ছাড়িয়ে দেন কাজ থেকে। সেই থেকেই রবির আক্রোশ রমজান সাহেবের উপর। আমি অবশ্য ভুল বুঝতে পেরেছিলাম। কোনও সম্পর্ক সেই থেকে রাখিনি রবির সঙ্গে।

আবার বলছি, আমি খুন করিনি। কোনও সম্পর্ক নেই খুনের সঙ্গে। খুন রবি করেছে।

২০ তারিখ রাতে সাড়ে দশটা নাগাদ আমি, সুব্বাদিদি আর এমএলএ সাহেব ঘরে ছিলাম। সুব্বাদিদি ঘুমিয়ে পড়েছিল। রমজান সাহেবের চোখে ড্রপ দেওয়ার পর আমি মেঝেতে শতরঞ্চি পেতে শুয়েছিলাম। দুটো আলাদা খাটে আমার স্বামী আর সুব্বাদিদি শুয়ে ছিল। ঘরের লাইট অফ করা ছিল। দরজা খোলা ছিল।

হঠাৎ রবি দরজা ঠেলে পরদা সরিয়ে ঢুকল ঘরে। বলল, 'কাকুর (এই নামেই ডাকত ও রমজান সাহেবকে) শরীর কেমন দেখতে এসেছি।' রবিকে দেখেই ভীষণ রেগে গেলেন রমজান সাহেব। খুব গালাগালি করলেন আমাকে, বললেন, 'তোমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতেই এসেছে হারামজাদা।' রবিও ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, 'আপনি দিদির জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছেন।' বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রমজান সাহেবের উপর। আমি আটকানোর চেষ্টা করলাম, হাতেপায়ে ধরলাম। আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল রবি। আমি জ্ঞান হারালাম।

কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে দেখি, আমি সুব্বাদিদির খাটে শুয়ে। রমজান সাহেবের শার্ট আর গেঞ্জি দিয়ে আমার মুখ বাঁধা। সুব্বাদিদির মুখ বাঁধা ওঁর লাল শাল দিয়ে। এমএলএ সাহেব নিজের খাটে। গলায় শাড়ির ফাঁস দেওয়া। এর বেশি কিছু জানি না।

আমার হার্টের সমস্যা আছে। কিন্তু রমজান সাহেব কখনও আমার অসুখের ব্যাপারে যত্ন নেননি। তবু আমি ওঁর সেবাযত্নে কোনওদিন ত্রুটি রাখিনি। এবারও কলকাতায় আসা ওঁর চিকিৎসার জন্যই।”

ম্যাজিস্ট্রেট সব শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘পুলিশের কাছে মিথ্যে বলেছিলেন কেন?’

তালাত সোজাসাপটা উত্তর দিলেন, ‘ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া রবি শাস্তি পাক, এটা চাইনি। ওকে ভালবেসেছিলাম আমি। পরে মনে হল, সত্যিটা না বললে অন্যায় হবে।’

যাক, তা হলে কিনারা তো হল শেষমেশ! — এমনই প্রতিক্রিয়া সাধারণত আমাদের হয় আদালতে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিতে অভিযুক্ত রাজি হলে। এ যাত্রায়ও প্রাথমিকভাবে তেমনটাই ভেবেছিল পুলিশ। সত্যিটা অন্তত এবার জানা যাবে।

ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারায় নথিবদ্ধ হওয়া স্বীকারোক্তির (Judicial Confession) কপি যখন হাতে এল, মাথায় হাত গোয়েন্দাদের। স্বস্তি তো দূরের কথা, বরং আরও অস্বস্তির গ্রাসে। এটা কীরকম হল?

FIR—এ যা তালাত বলেছিলেন, তার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই। এবং এই অমিলের থেকেও বড় কথা, আদালতে দেওয়া বয়ানেও অজস্র অসংগতি। রাত এগারোটায় কেন দরজা খুলে রাখলেন? ব্যাখ্যা নেই। এতদিন পরে রবি হঠাৎ কেন ‘কাকু’—র শরীরের খোঁজ নিতে প্রায় মাঝরাতে এমএলএ হস্টেলে চলে এল? মতিনের উল্লেখ কোথায় নয়া স্বীকারোক্তিতে? নেই। তালাত বলছেন, পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। ঘটনার পরদিন প্রাথমিক চিকিৎসার সময় শরীরের কোথাও দৃশ্যমান আঘাত ছিল না, মাথাতেও নয়। একমত হলেন গোয়েন্দারা, ইনি কঠিন মহিলা। হয় মিথ্যে, নয় অর্ধসত্য বলছেন।

সিদ্ধান্ত হল, রবিকে তো আগে ধরা হোক। জেরা করলেই ‘দুধ কা দুধ, পানি কা পানি’ হয়ে যাবে। রবি শিকদার, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। ধরা হল নদিয়ার বাড়ি থেকে, নিয়ে আসা হল কলকাতায়।

এরপর যা ঘটল, তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না পোড়খাওয়া গোয়েন্দারাও। জানা গেল, রবি কিছুদিন গাড়ি চালিয়েছিলেন রমজানের। কাজ করেছিলেন ব্যক্তিগত সহায়ক হিসেবেও। বেশ কয়েক মাস আগে অন্য চালক নিয়োগ করেন রমজান। সেই থেকে নদিয়ার বাড়িতেই থাকেন, জমিজমা দেখাশোনা করেন। চাকরি যাওয়ার পর তালাতের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই, দেখাও হয়নি কখনও। রবি স্পষ্ট বললেন, তালাতকে ‘দিদি’ বলে ডাকতেন, প্রশ্ন নেই দূরতম কোনও অবৈধ সম্পর্কের। আরও জানালেন জোর গলায়, কলকাতায় শেষ এসেছেন মাসছয়েক আগে। ঘটনার দিন তিনি নদিয়াতেই ছিলেন।

রবিকে নিয়ে পুলিশের বিশেষ টিম রওনা হয়ে গেল নদিয়ায়। খোঁজখবর-জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ নিশ্চিত হল, রবি সত্যি বলছেন। ঘটনার দিন নিজের গ্রামের বাড়িতেই ছিলেন। অসংখ্য সাক্ষী রয়েছে। আদালতে রবির জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করল না পুলিশ। রেহাই পেলেন নির্দোষ যুবক।

এদিকে কাগজে ফলাও করে প্রচার হয়েছে রবি ধরা পড়ার পর থেকে, চর্চা হয়েছে তালাতের স্বীকারোক্তি নিয়ে। ‘স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিকের রোষেই খুন রমজান’ শীর্ষক খবর বেরিয়েছে সর্বত্র। রবির জামিনের পর আর-এক প্রস্থ নিন্দেমন্দ সহ্য করতে হল আমাদের।

অতঃকিম? লালবাজার ঠিক করল, শূন্য থেকে শুরু করা ছাড়া উপায় নেই। মূলত তিনটে সিদ্ধান্ত হল।

এক, আবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সেই রাতে হস্টেলে থাকা সমস্ত আবাসিক-কর্মীদের, ঘটনাস্থলের এক কিলোমিটারের মধ্যে সমস্ত দোকানপাটের কর্মচারীদেরও। কেউ কিছু যদি মনে করতে পারেন, যা খেয়াল করেননি প্রথম বারের জেরায়।

দুই, এলাকার দু’-তিন কিলোমিটারের মধ্যে সমস্ত পিসিও বুথ চষে ফেলতে হবে। ঘটনার অন্তত কুড়ি দিন আগে থেকে খুনের দিন পর্যন্ত ফোনের রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এমএলএ হস্টেলে বাইরে থেকে কী কী ফোন এসেছিল কখন, রুম নম্বর ৩/১০-এ তো বটেই, অন্য সব রুমেও, জানতে হবে।

তিন, টিম পাঠানো হবে উত্তর দিনাজপুরে এবং কিষাণগঞ্জে। পার্টিকর্মীদের নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ

করলেও মুখ খুলছেন না কেউ। স্থানীয় স্তরে সোর্স লাগিয়ে খোঁজখবর নিতে হবে রমজানের পারিবারিক ব্যাপারে। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে কোনও বিবাদ ছিল কি না, মৃত্যুতে রাজনৈতিক ভাবে কেউ লাভবান হতে পারত কি না, রমজান-তালাতের সম্পর্কে কতটা টানাপোড়েন ছিল ইত্যাদি।

ত্রিমুখী স্ট্র্যাটেজিতে সর্বাত্মক ঝাঁপাল লালবাজার। ফলও মিলল পরিশ্রমের, ধৈর্যের, অধ্যবসায়ের।

তদন্তকারী অফিসার মহম্মদ আক্রম রোজ নিয়ম করে দশ-বারোটা পিসিও বুথে ঘুরে ঘুরে কললিস্ট ঘাঁটতে শুরু করলেন। প্রথম কিনারাসূত্র এল সেখান থেকেই।

সেদিন সন্ধে হয়ে এসেছে প্রায়। জানুয়ারির শেষাশেষি। সারাদিন টো টো করে ঘুরেছেন আক্রম। শরীরে-মনে 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু'-র রিংটোন বাজতে শুরু করেছে। ঠিক করলেন, আর গোটা তিনেক বুথ ঘুরে আজকের মতো দাঁড়ি টানবেন।

৩সি চৌরঙ্গি লেন। ছোট পিসিও বুথ, মালিক রঞ্জিত দাস। আদর-আপ্যায়ন করে বসালেন আক্রমকে, চা এল। কললিস্ট খুঁজতে খুঁজতেই খুচরো এ-কথা সে-কথার মাঝে রঞ্জিত বললেন, 'স্যার, আপনারা তো সব ক'টা বুথ ঘুরছেন ক'দিন ধরে। ওই এমএলএ মার্ডারের ব্যাপারে, না?'

—হুঁ!

—স্যার, অভয় দেন তো একটা কথা বলি?

আক্রম চোখ তুলে তাকালেন। দৃষ্টিতে খুব একটা কৌতূহল আছে, এমনটা বলা যায় না।

গলার স্বর প্রায় খাদে নামিয়ে আনেন রঞ্জিত।

—স্যার, ম্যাডাম আমার বুথে প্রায়ই আসতেন ফোন করতে। ভাল আলাপ আছে আমার সঙ্গে।

—কোন ম্যাডাম?

—এমএলএ সাহেবের মিসেস।

আক্রম আবার চোখ তুললেন ফোন নম্বরের তালিকা থেকে। দৃষ্টি বদলে গিয়েছে এখন, উঠে পড়েছেন চেয়ার ছেড়ে। ক্লান্তি- শ্রান্তি উধাও।

—কোথায় করতেন ফোন?

—এসটিডি কল স্যার। দিল্লিতে।

—কোন নম্বর? শেষ কবে করেছেন?

—দশ মিনিট বসুন স্যার, বের করে দিচ্ছি। শেষ এসেছিলেন বোধহয় মাসখানেক আগে। স্পষ্ট মনে আছে। আর একবার চা বলি স্যার?

চা কেন, স্বর্গের অমৃতসুধা এনে দিলেও তাতে তখন আর রুচি নেই আক্রমের। সম্ভাব্য সূত্রের আভাস পেলে তদন্তকারী অফিসারের যা হয়, মনের তখন সেই অবস্থা। শিরা-ধমনীতে একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে উত্তেজনা-উৎকণ্ঠা-ঔৎসুক্য।

২০ অক্টোবর থেকে ১৫ ডিসেম্বর, বারোবার তালাত ফোন করেছিলেন দিল্লিতে। নম্বর ০১১-৭৩৮৬২৪। কথোপকথনের সময়সীমা কখনও তিন-চার মিনিট, কখনও আট-দশ। ওই বুথ থেকেই ফোন ঘোরালেন আক্রম। নম্বরটা দিল্লির একটা ব্যবসায়িক সংস্থার, নাম 'Mumbai Trading & Co'। মালিকের নাম কলিম খান। যাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল কর্মচারীদের ব্যাপারে। বাংলা বা বিহারের কেউ আছে? এমন কি কেউ আছে যে কুড়ি তারিখ কাজে আসেনি?

—হাঁ, বাঙ্গাল সে এক হ্যায়। নুরুল, নুরুল ইসলাম। ষোলা তারিখ সে ছুট্টি লিয়া থা। লওট কে নেহি আয়া। কোই গড়বড় হ্যায় কেয়া?

এক মুহূর্ত দেরি করলেন না আক্রম। গাড়ি ছোটালেন লালবাজারে। ঝটিতি মিটিং সারলেন ডিসি ডিডি। সেই রাতেরই ট্রেন ধরতে রওনা হয়ে গেলেন অফিসারদের একটি দল। গন্তব্য দিল্লি।

পাশাপাশি ঠিক হল, যদি নুরুলই খুনি হয়, আর দিল্লি থেকে এসেই যদি খুনটা করে থাকে, আশেপাশের হোটেলে ওঠার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। আজ রাতেই হানা দিতে হবে দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার সমস্ত হোটেল-ধর্মশালায়। নুরুল ইসলাম বা অন্য কোনও নামে ১৬/১৭ তারিখ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে কেউ উঠেছিল কি না, খোঁজ নিতে হবে।

বেশি পরিশ্রমের দরকার পড়ল না। ঘণ্টা তিনেকের ছোটাছুটির পরই এমএলএ হস্টেল থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বের খাজা হাবিব হোটেলের রেজিস্টারে পাওয়া গেল নুরুল ইসলামের নাম। উঠেছিলেন ১৯ তারিখ সকালে, লিখেছিলেন ২২ তারিখ অবধি থাকবেন। কিন্তু ২০ তারিখ রাতেই টাকাপয়সা মিটিয়ে দিয়ে দশটা নাগাদ বেরিয়ে যান।

পরদিন সকালেই আরও প্রমাণ মিলল। সে-রাতে হস্টেলের ভিজিটার্স রেজিস্টারে যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় আর একটি দল জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছিল বেশ কয়েকদিন ধরে। জেরায় মনজুর আলম বলে একজন অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন, যেটা প্রথমবার বলেননি।

"রমজান সাহেব আমাদের এলাকার বিধায়ক। আমার বাড়ি চাকুলিয়া থানা এলাকায়। রমজান সাহেবের আদি বাড়ি কিষাণগঞ্জে, কিন্তু ওঁর আমাদের গ্রামের কাছেও একটা বাড়ি ছিল। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সঙ্গে আমাদের একটা জমিজমা সংক্রান্ত মামলা চলছিল অনেকদিন ধরে। সেই ব্যাপারে সাহায্য চাইতে বেশ কয়েকবার গিয়েছি এমএলএ সাহেবের বাড়ি। ওখানে নুরুলকে দেখেছি। রমজান সাহেবের ব্যক্তিগত সহায়ক ছিল নুরুল। ওর বাড়ি চাকুলিয়া থানারই বড়ডিহা গ্রামে। আলাপ ছিল আমার সঙ্গে।

২০ তারিখে কলকাতায় এসেছিলাম কাজে। উঠেছিলাম বেকার হস্টেলে এক বন্ধুর রুমে। রাত ১০টা নাগাদ করণদিঘির বিধায়ক সাজাদ আলির সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল এমএলএ হস্টেলে। ব্যবসায়িক সমস্যার ব্যাপারে। গিয়ে দেখি, সাজাদ সাহেবের রুম (২/৭) তালাবন্ধ।

আধঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। সাজাদ ভাই এলেন না। ভাবলাম, রমজান ভাইয়ের রুম থেকে ঘুরে আসি একবার। জানতাম, উনি কলকাতায় এসেছেন। হস্টেলে রুম ৩/১০-এই উঠতেন চিরকাল। সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় উঠলাম। রুমের সামনে গিয়ে দেখলাম, ভিতর থেকে বন্ধ। আলো জ্বলছে না। ভাবলাম, ঘুমিয়ে পড়েছেন। অসুস্থ মানুষ, ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না।

যখন লিফটের দিকে ফিরে আসছি, নুরুলকে করিডরের উলটোদিক থেকে আসতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ভাই, এখানে এত রাতে?' নুরুল বলল, রমজান সাহেবের সঙ্গে একটা দরকার আছে।"

গোয়েন্দারা মনজুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব আগে বলেননি কেন?

—স্যার, পরের দিন যখন শুনলাম, রমজানভাই খুন হয়ে গিয়েছেন, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সব বলতে গিয়ে যদি ঝামেলায় পড়ি, কোর্টকাছারি করতে হয়, কী দরকার?

ওদিকে রহস্যজাল পরতে পরতে খুলতে শুরু করেছে কিষাণগঞ্জের বাড়িতেও। যেখানে রমজানের পরিবারের খুঁটিনাটি তথ্যতালাশ চালাচ্ছিলেন গোয়েন্দারা। জেলার অত্যন্ত প্রভাবশালী পরিবার, কঠিন হচ্ছিল আত্মীয়-পরিজন, পাড়াপ্রতিবেশী-পার্টিসদস্যদের মুখ খোলানো। কিন্তু খবর বের করাটাই তো কাজ আমাদের। যেন তেন প্রকারেণ।

কী-কখন-কেন-কীভাবের উত্তর ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এল প্রকাশ্যে।

১৯৮৯ থেকে '৯৩, চার বছর রমজান আলির ব্যক্তিগত সহায়ক হিসেবে কাজ করেছিল নুরুল ইসলাম। '৯১ সালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন রমজান। ডায়াবেটিস ধরা পড়ে, ক্ষয়রোগও বাসা বাঁধতে শুরু করেছিল শরীরে। চিকিৎসার জন্য দিল্লি গেলেন, সঙ্গে তালাত আর নুরুল। রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে বেশ কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকলেন রমজান এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল তালাত-নুরুলের।

রমজান তখন পঞ্চাশোর্ধ্ব, নানা রোগভোগে জীর্ণ। তালাত সবে তিরিশ পেরিয়েছেন, নুরুলও সমবয়সি

প্রায়। ঘি এবং আগুনের সহাবস্থানে যা হওয়ার, তাই হল। গভীর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেন দু'জনে। মানসিক, শারীরিকও। চিকিৎসার পর কিষাণগঞ্জে ফিরলেন রমজান। কিছুদিনের মধ্যেই আঁচ করতে পারলেন তালাত আর নুরুলের ব্যাপারটা। একদিন দু'জনকে ধরে ফেললেন ঘনিষ্ঠ অবস্থায়। গালাগাল-মারধোর করে তাড়িয়ে দিলেন নুরুলকে। লেখার অযোগ্য শব্দ ব্যবহার করলেন তালাতের উদ্দেশে।

নুরুল দিল্লি চলে গেলেন, চাকরি নিলেন Mumbai Trading & Co—তে। রমজান ভাবলেন, আপদ গেল। কিন্তু সম্পর্ক ততদিনে গড়িয়েছে অনেকদূর। ভৌগোলিক দূরত্বের সাধ্য ছিল না আর তাতে ইতি টানার। নিয়মিত চিঠির আদানপ্রদান চলতে থাকল তালাত-নুরুলের। সপ্তাহে অন্তত দু'বার ফোনেও প্রেমালাপ।

ভাই হাফিজ আলম সৈরানি এবং খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের কাছে তালাতের ব্যাপারে বিষোদগার করতেন এমএলএ সাহেব। রমজান-তালাতের পারস্পরিক অবিশ্বাস আর তিক্ততা কোন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা বোঝা যায় দুটি নথি থেকে। প্রথমটা রমজানের ডায়েরির পাতা, যা উদ্ধার হয়েছিল কিষাণগঞ্জের বাড়ি থেকে। কিছু অংশ তুলে দিলাম।

'আজ, ১৩/৪/৯২, বড় দুঃখের সাথে লিখছি। ভালবাসার ধারণাটাই বদলে গিয়েছে আমার।

লুকিয়ে লাভ নেই, আমার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে নিজের শারীরিক চাহিদা মেটাতে আমার স্ত্রী এমন একজনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, যার সঙ্গে মাত্র কয়েক বছরের আলাপ। এই অনাচার আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে। দিনের পর দিন। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, যখন এই সেদিন ও আমাকে বলল, প্রয়োজনে আবার বিয়ে করবে!'

দ্বিতীয়টা নুরুলকে লেখা তালাত সুলতানার একটি চিঠি, যেটা তিনি পোস্ট করেননি। এটিও উদ্ধার হয়েছিল ওই কিষাণগঞ্জের বাড়ি থেকেই। উর্দু চিঠির অংশবিশেষ রইল বঙ্গানুবাদে।

'ডিয়ার,

আদাব।

চিঠি পেয়েছি।

এত দুঃখ পাচ্ছি এখানে যে ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে দেখা করে সব দুঃখ হালকা করে নিই। লোকে ঠিকই বলে। অভীষ্টের খোঁজে আমরা এমন জায়গায় পৌঁছে যাই, যখন মনে হয় খুঁজতে খুঁজতে সব হারিয়ে ফেলেছি। ভয় হয়, তোমাকেও হারিয়ে ফেলব না তো? আমার জীবন বলতে তো তুমিই।'

ঘটনার পর আর দিল্লি ফেরেনি নুরুল। পালিয়েছিল বিহারে। জানুয়ারির শেষ থেকে পুলিশ বিহারের আনাচকানাচ চষে ফেলেছিল নুরুলের খোঁজে। একটা দল ঘাঁটি গেড়েছিল উত্তর দিনাজপুরে, অন্যটা বিহারে। মাসখানেক চোর-পুলিশ খেলার পর নুরুল ধরা পড়েছিল ফেব্রুয়ারির ২৭ তারিখে, রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড় থেকে।

জেরাতে নুরুল স্বীকার করেনি কিছু, গোয়েন্দারা অকাট্য পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হাজির করা সত্ত্বেও। অনড় থেকেছে নিজেকে নির্দোষ ঘোষণায়, যুক্তি-তর্ক কিছুই ধোপে টিকছে না দেখেও।

রেণুলীনা সুব্বার সাক্ষ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু কে জানে কেন, উনি FIR—এ তালাতের প্রাথমিক বক্তব্যকেই ঘুরিয়েফিরিয়ে সমর্থন করে আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। পুলিশ বুঝেছিল, সত্য গোপন করছেন। রেণুলীনা নিজেও জানতেন নিশ্চিত, আসলে কী ঘটেছিল। কিন্তু বলেননি, হাজার প্রশ্নবাণের মুখেও নড়েননি একটুও। তালাতকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, পরিষ্কার। কিন্তু কেন? উত্তর পাইনি আমরা। সব কিছু জানা যায় না।

দ্রুত চার্জশিট পেশের পর দীর্ঘ বিচারপর্ব চলেছিল। তীব্র বাদানুবাদের সাক্ষী থেকেছিল আদালত।

তালাত-নুরুলের আইনজীবী দাবি করেছিলেন, এটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। যে যুক্তিকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ খুঁজে পায়নি আদালত। পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ঠাসবুনোট বুনিয়াদ তৈরি করেছিলেন তদন্তকারী অফিসার।

খাজা হাবিব হোটেলের রেজিস্টারে খুনের আগের দিন নুরুলের হাতের লেখার সঙ্গে পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন সংগৃহীত 'handwriting specimen'—এর মিলে যাওয়া। পিসিও বুথের কলকাতা-দিল্লি ফোনের খতিয়ান, বুথমালিকের শনাক্তকরণ তালাতকে। মনজুর আলমের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে নুরুলের এমএলএ হস্টেলে ঘটনার রাতে উপস্থিতি প্রমাণ হওয়া। তালাত, তদন্তে জানা গিয়েছিল, বেশ কয়েকবার নিউ মার্কেটের সাব-পোস্ট অফিস থেকে মানিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়েছিলেন নুরুলকে। তার রসিদের প্রতিলিপি উভয়ের সম্পর্কের গভীরতা বোঝাতে আদালতে পেশ হওয়া। উত্তর দিনাজপুরে জয়শ্রী কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজারের

সাব-ডিস্ট্রিবিউটরশিপ গোপনে নিয়েছিলেন তালাত-নুরুল। সংশ্লিষ্ট প্রমাণ হাজির করা সেই ব্যবসায়িক অংশীদারির। এবং সর্বোপরি রমজানের ডায়েরির পাতার আক্ষেপ আর তালাতের পোস্ট-না-করা প্রেমপত্র।

নিম্ন আদালত তালাত-নুরুলকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা শুনিয়েছিল। হাইকোর্ট যা বহাল রেখেছিল। দু'জনেই এখনও সংশোধনাগারে।

ঠিক কী ঘটেছিল সে-রাতে? নুরুল-তালাত স্বীকার করেননি, রেণুলীনা কৌশলে এড়িয়েছেন। কিন্তু এঁদের তিনজনকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করে, সব দিক বিচার করে তদন্তকারী দলের যা নিশ্চিতভাবে মনে হয়েছিল, তা এরকম।

নুরুল কলকাতায় এসেছিলেন তালাতের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু বাইরে দেখা করায় ঝুঁকি ছিল অনেক। দু'জনে ঠিক করেছিলেন, রাতে রমজান ঘুমিয়ে পড়লে নুরুল হস্টেলের ঘরে আসবেন। রেণুলীনার রাত্রিবাসটা হিসেবের বাইরে ছিল। রাত্রি সাড়ে দশটা-পৌনে এগারোটা নাগাদ গেটের বাইরের 'সেন্ট্রি চেঞ্জ' হচ্ছিল। পাহারা বদলের সময় নজরদারি একটু ঢিলেঢালা থাকেই। সেই সুযোগেই চাদরমুড়ি দিয়ে ঢুকেছিল নুরুল। 'ভিজিটার্স রেজিস্টার'-এর দায়িত্বে যিনি ছিলেন রিসেপশনে, তাঁরও নজর এড়িয়ে গিয়েছিল।

তালাত দরজা খুলে রেখেছিলেন পৌনে এগারোটার পর। রমজান আর রেণুলীনা তার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন, নিশ্চিত ছিলেন। ঘুমিয়ে পড়েওছিলেন ওঁরা। এগারোটা নাগাদ সন্তর্পণে ঢুকলেন নুরুল। পরদা ঘেরা জায়গায় একান্তে দু'জনে সময় কাটানোই ছিল উদ্দেশ্য।

বাদ সাধল ফিসফিস কথার আওয়াজে রমজানের ঘুম ভেঙে যাওয়ায়। উঠে পড়লেন, গলা ছেড়ে আওয়াজ দিলেন। রমজান বুঝে ফেলেছিলেন, নুরুল এসেছে। এবং নুরুল জানত, যেখানেই পালান, পার পাবেন না। রমজান ক্ষমতাশালী লোক, ধনেপ্রাণে অতিষ্ঠ করে দেবেন জীবন। এরপর রমজানের গলায় ফাঁস দেওয়া নুরুলের। রেণুলীনার সঙ্গে তালাতকেও বেঁধে ফেলার নাট্যরূপ। নুরুল বেরিয়ে গিয়েছিল মেন গেট দিয়েই। প্রহরায় থাকা পুলিশ সন্দেহ করেনি। ভেবেছিল, ঢুকেছে যখন, বৈধভাবেই ঢুকেছে। বৈধ অতিথিকে আটকানোর কথাও নয় বেরনোর সময়।

রমজানের মৃতদেহ, গলায় ফাঁস লাগানো

রাজনীতির কোনও প্যাঁচপয়জার ছিল না রমজান-হত্যায়। খুন, কিন্তু ছক কষে নয়। সে তালাতই হন বা নুরুল, দাগি আসামি তো আর ছিলেন না। খুন-পরবর্তী-চিত্রনাট্যে ফাঁকফোকর থেকে গিয়েছিল বিস্তর। আবেগ আর আক্রোশের তাৎক্ষণিক তাড়নাই ছিল চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেপথ্যে, পোড়খাওয়া অপরাধীর স্থিরমস্তিষ্ক নয়।

সত্যের অন্বেষণই তদন্তের মূল কথা, "to ascertain the truth"। তবে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী যে বিলাসিতা দেখাতে পারতেন, তা আমাদের, বাস্তবের সত্যসন্ধানীদের থাকে না। এক এবং অদ্বিতীয়

ব্যোমকেশ উৎসাহী ছিলেন অপরাধীর মনস্তত্ত্বে, সত্য উদ্‌ঘাটনে। শাস্তিবিধানে তাঁর নিবিড় মনোনিবেশ বড় একটা দেখি না আমরা। অপরাধীর বাধ্যবাধকতা বিচার করে কখনও কখনও অব্যাহতি দেন সত্যিটা জানা হয়ে যাওয়ার পর, স্বজ্ঞানে মুক্তি দেন পুলিশের হাত থেকে। বিবেকের শাসনে জীবনভর যন্ত্রণা পাওয়াকেই যথেষ্ট শাস্তি মনে করেন।

বাস্তবের গোয়েন্দা রক্তমাংসের, আইনের চৌহদ্দির বাইরে যাওয়ার অধিকার তাঁর নেই। তাঁকে বাধ্যত নিরাবেগ হতে হয়। অভিযুক্তকে ধরা, সাক্ষ্যপ্রমাণ একত্রিত করা এবং আদালতে চার্জশিট দাখিল করা শাস্তিবিধান চেয়ে। অনেক অপরাধই ঘটে যায় বিচিত্র পরিস্থিতির জাঁতাকলে। তদন্তকারী অফিসার যতই নৈর্ব্যক্তিক মানসিকতায় রহস্যভেদ করুন, কখনও কখনও সহানুভূতি বা সম-অনুভূতি মননে প্রভাব ফেলেই। সেই প্রভাবের ছোঁয়াচ কাটিয়ে নির্মোহ তদন্ত কোনও কোনও ঘটনায় নেহাত সহজসাধ্য নয়।

আক্রম সাহেব কি কখনও আক্রান্ত হয়েছিলেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে, যখন তদন্ত চলছিল মামলার, যখন একটু একটু করে পরদা উঠছিল রহস্যের? ভেবেছিলেন, কোন পরিস্থিতিতে, কোন মনস্তাপে তালাত এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন? কুড়ি বছর সংসারযাপনের পর, তিন সন্তানের জন্মদাত্রী হয়েও? কে জানে?

জল্পনায় লাভও নেই বোধহয়। কথাই তো আছে, "the more you know, the more you know you don't know."

যত বেশি জানবে, ততই বেশি জানবে, জানা হয়নি বিশেষ।

বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ

মেরে স্বপ্নো কি রানি কব আয়েগি তু..
আয়ি রুত মস্তানি কব আয়েগি তু..
বিতি যায়ে জিন্দেগানি কব আয়েগি তু..
চলি আ.. আ তু চলি আ ...

শেষ লাইনটা গাওয়া হচ্ছে কোরাসে। ট্যাক্সি থেকে মুখ বার করে এক যুবক তারস্বরে গাইছে। বলা ভাল, চেঁচাচ্ছে, আ তু চলি আ...। বিকৃত উল্লাসে গলা মেলাচ্ছে ট্যাক্সির ভিতরের বাকিরা, চলি আআআ...।

যাঁর উদ্দেশে নেশাতুর আহ্বান, মোটরসাইকেলের পিছনে বসা যুবতী, ততক্ষণে আতঙ্কের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছেন। হাত ধরে টানার চেষ্টা করছে ট্যাক্সির জানালা থেকে এক যুবক, অশ্লীল ইঙ্গিতসহ মন্তব্য ছিটকে আসছে, হ্যাপি নিউ ইয়ার ডার্লিং! কোনওক্রমে সামলাচ্ছেন যুবতী, পুরুষসঙ্গীকে বলছেন, তাড়াতাড়ি চালাও, ভয় করছে ভীষণ।

কী করে চালাবেন তাড়াতাড়ি? সম্ভব কখনও, যখন ইচ্ছেমতো গতি বাড়িয়ে-কমিয়ে ধাওয়া করছে ট্যাক্সি মিনিট দশেক ধরে? সামনে যে রাস্তা ধু ধু ফাঁকা, এমনও নয়। ওই মাঝরাতের রাজপথে তখনও গাড়ির জটলা যথেষ্ট। মোটরসাইকেলের গতি কমিয়ে দিলে ট্যাক্সিও কমাচ্ছে, বাড়ালে দ্রুত তাল মিলিয়ে পাশে চলে আসছে। আশেপাশে পুলিশও তো কই দেখা যাচ্ছে না। যত পুলিশ আজ পার্ক স্ট্রিটে। কী করা যায়, কী করা উচিত?

সামনে ওয়েলিংটন স্কোয়ার, হিন্দ সিনেমা। এভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে! বাধ্য হয়েই মোটরসাইকেল থামালেন চালক। হেলমেট খুললেন। ট্যাক্সিও থামল। নেমে এল পাঁচ যুবক, সবারই বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। যুবতী দাঁড়িয়ে জড়সড়। সঙ্গী বললেন, 'এটা কী হচ্ছে? অসভ্যতা করবেন না প্লিজ়।'

অসভ্যতা ভাবলে তো অসভ্যতা! ততক্ষণে যুবতীকে ঘিরে ফেলেছে পাঁচজন। সঙ্গী বাধা দিতে এলে বিদ্রুপ এবং ধাক্কা, 'তুই একাই মস্তি করবি বে?' শুরু হয়ে গিয়েছে মহিলার হাত ধরে টানাটানি। এবং পাল্লা দিয়ে খিস্তিখেউড়।

এমন চলল মিনিটখানেক। পাশ দিয়ে এরপর হুস করে বেরিয়ে গেল একটা লাল মারুতি। ব্রেক কষল মিটার পঞ্চাশেক এগিয়ে। সিনেমায় যেমন হয়। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক দীর্ঘদেহী সুঠাম চেহারার যুবক। ছুটলেন পিছনে, যেখানে তখন অভিনীত হচ্ছে এক অসহায় যুবতীর অসম্মানিত হওয়ার চিত্রনাট্য।

মহিলাকে আগলে দাঁড়ালেন দীর্ঘদেহী, 'কী হচ্ছেটা কী, ছাড়ুন ওঁকে!'

ক্ষিপ্ত উত্তর আসে, 'তুই কে শালা ফোঁপরদালালি করার? পাতলা হয়ে যা চটপট।'

বর্ষবরণের রাত ছিল সেটা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০০২। ঘটনা যখন ঘটছে, ঘড়ির কাঁটা অবশ্য তখন একটা পেরিয়ে গিয়েছে। ঘুরে গিয়েছে বছর। পয়লা জানুয়ারি, ২০০৩।

ফাস্ট ফরোয়ার্ডে পরের দৃশ্য। চার দিন পেরিয়ে গিয়েছে ঘটনার। ৫ জানুয়ারির রাত আটটা। হাসপাতাল চত্বর ভিড়ে থিকথিক। মিডিয়া তো রয়েইছে একঝাঁক। তার চেয়েও ঢের বেশি কলকাতা পুলিশের নানা স্তরের

কর্মী-আধিকারিকরা। যাঁরা হাসপাতাল-প্রাঙ্গণকেই ঘরবাড়ি করে ফেলেছেন পয়লা জানুয়ারির দুপুর থেকে। ‘যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ’-এর আপ্তবাক্যে ভরসা রেখে।

—ডক্টর আগরওয়াল, প্লিজ়, ওকে বাঁচান। যেভাবে হোক। উই কান্ট অ্যাফোর্ড টু লুজ় হিম...। নগরপালের আর্তি ছুঁয়ে যায় প্রথিতযশা নিউরোসার্জেনকে।

—আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমরা। নিউরোলজিক্যাল স্ট্যাটাস ভেরি পুয়োর। কোমায় চলে গিয়েছে। প্রচুর ইন্টারনাল ইনজুরি, স্কালে মাল্টিপল ফ্র্যাকচার। জানি না, কতটা সম্ভব হবে। ফিঙ্গারস ক্রসড, ট্রায়িং আওয়ার বেস্ট...। ফোন রেখে দেন ডক্টর অজয় আগরওয়াল।

Calcutta Medical Research Institute (সিএমআরআই)-এর আইসিইউ-তে চূড়ান্ত ব্যস্ততা তখন। ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে পেশেন্ট। যা যা করা সম্ভব, করছেন ডাক্তাররা। হাসপাতালে ভরতি হওয়া ইস্তক রোগীর জ্ঞান ফেরেনি, ফেরার দূরতম সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশ। প্রহর গোনা একরকম শুরুই হয়ে গিয়েছে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির।

সার্জেন্ট বাপি সেন হত্যা মামলা। বউবাজার থানা, কেস নম্বর ১/২০০৩। তারিখ জানুয়ারির পয়লা। ধারা, ৩০২/৩৪/৩৫৪ আইপিসি। খুনের উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা, শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে মহিলার উপর বলপ্রয়োগ।

এ মামলায় সে অর্থে রহস্যভেদের রোমাঞ্চ নেই, নেই একাধিক সন্দেহভাজনের মধ্য থেকে অপরাধীকে চিহ্নিত করতে মগজাস্ত্রের কুশলী প্রয়োগ। বাপি সেনের হত্যা তবু আজও কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে সবচেয়ে চর্চিত মামলাগুলির অন্যতম। ঠিক কী ঘটেছিল, কীভাবে ঘটেছিল, জল্পনার বিষয় আজও। পনেরো বছর পরেও। শহর কলকাতাকে সে-সময় তোলপাড় করে দেওয়া এই ঘটনার প্রামাণ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখা জরুরি। কেস ডায়েরির খুঁটিনাটি, আদালতে বাদী-বিবাদীর তর্কবিতর্ক এবং সর্বোপরি যাবতীয় তথ্যপ্রমাণের চুলচেরা বিশ্লেষণের পর বিচারকের রায়, ধরা থাকল ঘটনাপ্রবাহ। যা ঘটেছিল, যে ভাবে ঘটেছিল।

বেহালার পর্ণশ্রীর বাসিন্দা নারায়ণচন্দ্র সেন-রেণুকা সেনের তিন পুত্র, তিন কন্যা। নারায়ণবাবু পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত সাব-ইনস্পেকটর। বড়ছেলে জয়দেব থাকেন সপরিবারে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের M.E.S. কোয়ার্টারে। মেজো অনুপ, ইন্ডিয়ান ব্যাংকের কর্মী। ছোটছেলে বাপি। চব্বিশ বছর বয়সে কলকাতা পুলিশে সার্জেন্ট হিসেবে যোগদান ’৯১-তে। বোনদের মধ্যে জয়শ্রী অবিবাহিতা। বাকি দুই বোন মন্দিরা আর দীপার শ্বশুরবাড়ি যথাক্রমে মহেশতলা এবং পর্ণশ্রীতে।

বাপির স্ত্রী সোমা, বিয়ে হয় ’৯২-এর জুনে। বাপি-সোমার দুই ছেলে। সোমশুভ্র বড়, ঘটনার সময় বয়স ছয়, ক্লাস ওয়ান। ছোট শঙ্খশুভ্র, হাঁটি-হাঁটি পা-পা তখন। বয়স সবে এক পেরিয়েছে দুধের শিশুর।

বাপি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ডাকাবুকো স্বভাবের। বাবাকে আশৈশব দেখেছেন পুলিশের চাকরিতে, স্বপ্ন লালন করতেন ভবিষ্যতে উর্দিধারী হওয়ার। খেলাধুলোয় তুমুল উৎসাহ, ভাল ফুটবল খেলতেন। টেবিলটেনিসও। ২০০২ সালে, ঘটনার সময়, টালিগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত ছিলেন। প্রতিবাদী স্বভাবের জন্য পরিচিত ছিলেন চাকরিজীবনের শুরু থেকেই। পার্ক স্ট্রিট এলাকায় এক মহিলার হার ছিনতাই করে পালানো দুষ্কৃতীকে অনেকটা ধাওয়া করে হাতেনাতে ধরেছিলেন একবার। কে জানত, ওই প্রতিবাদী স্বভাবেরই মাশুল দিতে হবে প্রাণ দিয়ে, মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে?

বাপি সেন

৩১ ডিসেম্বর, ২০০২, নিউ ইয়ার্স ইভ।

কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জরুরি ঘটনায় ঢোকার আগে। অশোক সেনগুপ্ত, বাড়ি নেতাজিনগরে। পেশায়

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। নাজিবুল হোসেন মোল্লা, দক্ষিণ কলকাতারই বাসিন্দা, ইনিও মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। গৌতম মজুমদারেরও একই পেশা, থাকতেন পর্ণশ্রীতে। কানাই কুন্ডু, কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল। বাড়ি বেহালা অঞ্চলেই।

উপরে যাঁদের নাম করলাম, অনেকদিনের পরিচিতি পরস্পরের। সকলেই মধ্যতিরিশ। বাপিও ছিলেন এই বন্ধুদলে। পর্ণশ্রী রিক্রিয়েশন ক্লাবের পাশের মাঠটা ছিল সান্ধ্য আড্ডার ঠিকানা।

সেদিন বাপির দুপুরের শিফটে ডিউটি ছিল। সোয়া আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে গেলেন ক্লাবের মাঠে। গৌতম-অশোক-নাজিবুল-কানাই তখন আড্ডা দিচ্ছেন জমিয়ে। কথায় কথায় অশোক বললেন, সঙ্গে গাড়িটা এনেছি। চল, পার্ক স্ট্রিট ঘুরে আসি রাতের দিকে। লাল মারুতি, WB-02F-4992, রওনা দিল পার্ক স্ট্রিটের উদ্দেশে। রাত কত হবে তখন? ন'টা-সোয়া ন'টা। গাড়ি একটু এগোনোর পর বাপি বললেন, তারাতলায় এক বন্ধুর বাড়ি রাত্রে যাব বলে কথা দিয়েছিলাম। একবার না গেলেই নয়। ওখান থেকে পার্ক স্ট্রিট যাওয়া যাবে।

বন্ধুর নাম সুব্রত বসু। তারাতলার কাছেই 'নাবিকগৃহ', মার্চেন্ট নেভির শিক্ষানবিশদের আবাসিক প্রশিক্ষণ সংস্থা। সুব্রতর বাবা সেখানে সুপারিন্টেনডেন্ট, থাকেন সরকারি কোয়ার্টারে। বাপিরা পৌঁছলেন। যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করে সুব্রতর বাবা-মা একরকম বাধ্যই করলেন সবাইকে রাতের খাওয়াটা ওখানেই সারতে। খাওয়াদাওয়ার পর সুব্রতও সঙ্গী হলেন বাপি-গৌতম-অশোক-কানাই-নাজিবুলের। গন্তব্য পার্ক স্ট্রিট। বন্ধুদের সঙ্গে বাপি সেনের 'The last ride together।'

বছরের শেষ রাতের পার্ক স্ট্রিট যেমন হয়। আলো আর রঙের দাঙ্গা লেগেছে যেন। কানের পরদা বিদ্রোহ করছে আওয়াজের ধাক্কায়। যতদূর চোখ যায়, ফুটপাথে কালো মাথা পিলপিল। গাড়িঘোড়াই বা কম যায় কীসে, স্রোত যেন শেষ হওয়ার নয়। সব রাস্তাই কি এখানে এসে মিশেছে?

গাড়িটা রাসেল স্ট্রিটের হবি সেন্টারের সামনে পার্ক করেছিলেন অশোক। রাত তখন সাড়ে বারোটা ছাড়িয়েছে, পায়ে হেঁটে চক্কর দেওয়া হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকবার। বন্ধুরা ঠিক করলেন, এবার বাড়ি ফেরা যাক।

পার্ক স্ট্রিটে তখন পশ্চিমমুখী গাড়ির ভিড় তুঙ্গে। মল্লিকবাজারের দিক থেকে শয়ে শয়ে ঘরমুখী গাড়ির চাপে 'বাম্পার টু বাম্পার' ট্রাফিক। বাপির কলকাতার রাস্তা চেনা হাতের তালুর মতো। বললেন, জওহরলাল নেহরু রোড ধরলে অনেক দেরি হয়ে যাবে সামান্য রাস্তা পেরতেই। তার চেয়ে রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড ধরে যাওয়া ভাল। ওয়েলিংটন হয়ে গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ-সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পেরিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে দক্ষিণে যাওয়াই সবচেয়ে কম সময়ের। ওদিকে তুলনায় এখন কম চাপ থাকবে গাড়ির।

বাপির দেখানো রাস্তায় এগোল লাল মারুতি। ওয়েলিংটনের কাছাকাছি আসতেই আরোহীদের চোখে পড়ল দৃশ্যটা। যা লিখেছি শুরুর অনুচ্ছেদে। একটা ট্যাক্সি ধাওয়া করেছে মোটরসাইকেলকে। যা চালাচ্ছেন একজন পুরুষ, পিছনে এক মহিলা। পিছু ছাড়ছে না ট্যাক্সি, গতি বাড়িয়ে-কমিয়ে চলেছে মোটরসাইকেলের গা ঘেঁষে। ট্যাক্সির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা হাত ছুঁতে চেষ্টা করছে মহিলাকে।

একটু এগিয়ে একসময় দ্বিচক্রযান থামিয়ে দিলেন চালক। মহিলাও নেমে দাঁড়ালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে এল পাঁচ যুবক। মোটরসাইকেল-চালকের সঙ্গে সামান্য কথাকাটাকাটির পর সরিয়ে দিল একরকম ধাক্কা দিয়েই। মহিলাকে ঘিরে ধরে শুরু হল কুৎসিত ইঙ্গিত, শরীরে অবাঞ্ছিত স্পর্শ।

'অশোক,... এগিয়ে গিয়ে দাঁড় করা তো!' পিছনের মারুতির সামনের সিট থেকে ঘটনাটা লক্ষ করছিলেন বাপি। কিছুটা এগিয়ে ব্রেক কষল গাড়ি। দরজা খুলে নেমেই ছুটলেন বাপি, 'কী হচ্ছেটা কী? ছাড়ুন ওঁকে!'

—তুই কে শালা ফোঁপরদালালি করার? পাতলা হয়ে যা চটপট।

এসব হুমকিতে দমে যাওয়ার ছেলে ছিলেন না বাপি, একজনের হাত ধরে ফেললেন, 'ছেড়ে দিন ওঁকে। আমার নাম বাপি সেন, টালিগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের সার্জেন্ট।'

উত্তর এল, 'তো? আমরাও কলকাতা পুলিশের লোক। ফোট্!'

বাপি লড়ার চেষ্টা করেছিলেন সাধ্যমতো। পাঁচ যুবকের বেপরোয়া কিল-ঘুষি-লাথির তোড় অবশ্য সামলাতে পারলেন না বেশিক্ষণ। গৌতম-অশোক-কানাই-নাজিবুলরা ছুটে এলেন আটকাতে, পেরে উঠলেন না পালটা মারের ধাক্কায়। বাপি ততক্ষণে পড়ে গিয়েছেন ট্রামলাইনের উপর, তবু এলোপাথাড়ি লাথি অব্যাহত। সঙ্গে সমবেত চিৎকার, মেরে ফেল শালাকে।

গৌতম-সুব্রত-কানাই আবার এগোলেন আটকাতে, 'কী করছেন কী? ও পুলিশ অফিসার।'

কে শোনে কার কথা? 'শুনলি না, আমরাও পুলিশের! ও কি একাই পুলিশের নাকি? মেরে ফেল শালাকে!'

প্রতিরোধের চেষ্টা ব্যর্থ হল বন্ধুদের, রাস্তায় পড়ে থাকা বাপির শরীরে লাথির আঘাত পড়তে লাগল বেলাগাম। বুকে-পেটে-মাথায়-ঘাড়ে, কোথায় নয়?

বাপি যখন ট্রামলাইনের উপর নিস্পন্দ পড়ে নতুন বছরের প্রথম প্রহরে, ট্যাক্সিতে উঠে চম্পট দিল পাঁচজন। কানাই নোট করে নিয়েছিলেন ট্যাক্সির নম্বর, WB-04A-3450।

মোটরসাইকেলটা কোথায় গেল? ঝামেলা যখন তুঙ্গে, নিঃশব্দে চলে গিয়েছেন চালক ও সঙ্গিনী। সেটা কি গণ্ডগোলের সময় খেয়াল করেছিল আক্রমণকারী পাঁচজন? শিকার হাতছাড়া হওয়ার রাগেই কি ওই উন্মত্ত গণপিটুনি?

মোটরসাইকেলের খোঁজ নেওয়ার সময় নেই তখন। অচৈতন্য বাপিকে নিয়ে মারুতি ছুটল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। CB Top (ক্যাজুয়ালটি ব্লক)-এর বেড নম্বর ১৫৮-য় ঠাঁই হল বাপির। রাত তখন দুটো বা তার আশপাশ। প্রাথমিক পরীক্ষার পর নাইটডিউটিতে থাকা চিকিৎসক বললেন, অবিলম্বে CT Scan করা দরকার। বন্ধুরা তখন দিশেহারা। কেউ বাপির বাড়িতে খবর দিচ্ছেন, কেউ ছুটছেন মেডিক্যালের কোথায় কীভাবে CT Scan হবে তার খোঁজে।

বউবাজার থানার সাব-ইনস্পেকটর রক্ষাকর মণ্ডল বেরিয়েছিলেন নাইট রাউন্ডে, রাত একটা নাগাদ। সাড়ে তিনটে নাগাদ মোবাইলে ধরল লালবাজার কন্ট্রোল, মেডিক্যাল কলেজে যান শিগগির, ওখানে বোধহয় একটা assault কেস আছে।' ছুটলেন রক্ষাকর, মেডিক্যাল কলেজের পুলিশ আউটপোস্টের এএসআই ব্রজকিশোর চৌধুরির কাছে জানলেন বৃত্তান্ত। খবর পেয়ে টালিগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের তৎকালীন ওসি অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় রওনা দিলেন মেডিক্যালে, সঙ্গে বাপির মেজদা অনুপ।

CT Scan-এর রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বললেন, আঘাত গুরুতর, অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেন। আলোচনার পর অনুপ সিদ্ধান্ত নিলেন, সিএমআরআই-তে নিয়ে যাবেন ভাইকে। জ্ঞান নিশ্চয়ই ফিরে আসবে দু'-একদিনের মধ্যে। দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি, জ্ঞান আর ফেরার নয়।

সিএমআরআই-এর আইসিইউ পরবর্তী ঠিকানা বাপির। নিউরোসার্জেন ডা. অজয় আগরওয়ালের নেতৃত্বে শুরু হল চিকিৎসা। ভোর হয়ে এসেছে তখন, কন্ট্রোল মারফত পুলিশমহলে জানাজানি হয়ে গিয়েছে ঘটনাপরম্পরা। ইভটিজিং রুখতে গিয়েছিলেন ট্রাফিকের সার্জেন্ট। পিটিয়ে আধমরা করে ফেলেছে পাঁচজন। যারা মেরেছে, তারাও শোনা যাচ্ছে পুলিশের লোক।

সকালেই ট্রাফিক কন্ট্রোলে দৌড়লেন রক্ষাকর। WB-04A-3450 নম্বরের ট্যাক্সির মালিকের নাম জানা গেল ডেটাবেস থেকে অল্পক্ষণের মধ্যেই। মধুকান্ত ঝা। ট্যাক্সির খোঁজও মিলল সহজেই। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের পুলিশ মেসের সামনে, পাওয়া গেল মালিককেও। শুয়ে ছিলেন ট্যাক্সির মধ্যেই।

মধুকান্ত দ্বারভাঙার বাসিন্দা, চব্বিশ বছর আগে চলে আসেন কলকাতায়। পুলিশ মেসে রাঁধুনির কাজ দিয়ে শুরু। তারপর হিমালয় অপটিক্যালসে ড্রাইভারের কাজ দীর্ঘদিন। '৯৬ -তে ধারদেনা করে নিজের ট্যাক্সি কেনেন। হেল্পার রেখেছিলেন দেশোয়ালি মেওয়ালাল গুপ্তাকে। পুলিশ মেসেই খাওয়াদাওয়া সারতেন দু'জন। চিনতেন মেসের পুলিশকর্মীদের প্রায় সবাইকেই।

কারা ট্যাক্সিতে ছিল গত রাতে? একটুও ভাবতে হল না মধুকান্তকে। এক কথায় বলে দিলেন পাঁচজনের নাম। মধুসূদন চক্রবর্তী, শ্রীদাম বাউরি, পীযূষ গোস্বামী ওরফে গোপাল, শেখরভূষণ গুপ্ত ওরফে ভোলা এবং শেখ মুজিবর রহমান। জানতে সময় লাগল না, পাঁচ কীর্তিমানই কলকাতা পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সের কনস্টেবল। দিনের ডিউটির পর বর্ষশেষের রাতে বিনোদনে বেরিয়েছিলেন মধুকান্তের ট্যাক্সিতে সওয়ার হয়ে।

মধুসূদন আর পীযূষ গ্রেফতার হলেন মেস থেকেই। শ্রীদাম, মুজিবর আর শেখর ছিলেন না মেসে তখন। মধুসূদন আর পীযূষকে আদালতে পেশ করার সময় তদন্তকারী অফিসার রক্ষাকর আবিষ্কার করলেন, পালানোর পথ নেই বুঝে আদালতে আত্মসমর্পণের জন্য হাজির শ্রীদাম-মুজিবর-শেখর। পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হল পাঁচজনকে, সকলেই অস্বীকার করলেন অভিযোগ।

খবর প্রচারিত হল, চরম লজ্জায় পড়ল কলকাতা পুলিশ। রক্ষকই ভক্ষক, এহেন নৃশংসতায়? এক মহিলার মানইজ্জত বাঁচাতে মরিয়া লড়তে গিয়ে সতীর্থদের গণপ্রহারেই মৃত্যুশয্যায় পুলিশ অফিসার? মুখ লোকানো দায়, কলঙ্ক ঢাকার জায়গাই বা কোথায়?

বাপি তখন সংজ্ঞাহীন আইসিইউ-তে। 'যমে-মানুষে টানাটানি' লেখা গেল না। টানাটানি তখন হয় যখন উভয়েরই আংশিক জেতার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে আগাগোড়া যমেরই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল। বাপির শেষ নিশ্বাস ৬ জানুয়ারি, ভোর ৬টায়। খবর বেহালার বাড়িতে পৌঁছতে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন স্ত্রী সোমা, মা রেণুকা। গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল পর্ণশ্রী এলাকা। শুধু পর্ণশ্রী কেন, পুরো কলকাতাই ।

কলকাতা পুলিশের আংশিক কলঙ্কমোচনের একমাত্র উপায় ছিল দোষীদের দ্রুত শাস্তিবিধান। হোমিসাইড শাখার তৎকালীন ইনস্পেকটর অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্তমানে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, দায়িত্ব নিলেন তদন্তের। পাখির চোখ, অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করা।

তদন্ত হোঁচট খেল শুরুতেই। বিস্তর চেষ্টাচরিত্র করেও খোঁজ পাওয়া গেল না নিগৃহীতা মহিলার, যাঁর বয়ান অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত তদন্তের অগ্রগতিতে।

নগরপাল শেষমেশ খবরের কাগজে আবেদন জানালেন, 'আপনি যে-ই হোন, আপনার মানসিক অবস্থা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। একান্ত অনুরোধ, অনুগ্রহ করে প্রকাশ্যে আসুন। আপনার হেনস্থা হওয়ার প্রতিবাদ করতে গিয়ে মারাত্মক জখম হয়েছিলেন আমাদের এক সহকর্মী বাপি সেন। আর বেঁচে নেই তিনি। দোষীদের শাস্তিদানে আপনার বয়ান খুবই জরুরি। আপনি সহযোগিতা করলে কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব কলকাতা পুলিশের।'

অপেক্ষাই সার, সাড়া মিলল না আবেদনে। তথ্যপ্রমাণ একত্রিত করে অতনুবাবু চার্জশিট পেশ করলেন ১০ মার্চ। শুরু হল বহুবিতর্কিত বিচারপর্ব।

অভিযুক্তদের আইনজীবী যুক্তি সাজালেন অনেক। তুলে দেওয়া যাক যুক্তিতক্কো আর গপ্পোর নির্যাস। এমন কোনও ঘটনা ঘটেইনি আদৌ। বাপি ওয়েলিংটনের কাছে ট্যাক্সি থামিয়ে নিজেকে সার্জেন্ট বলে পরিচয় দিয়ে লাইসেন্স আর ব্লু বুক দেখতে চান চালকের কাছে। বাপির মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরচ্ছিল। চালক লাইসেন্স দেখাতে অস্বীকার করায় বাপি পিছনের দরজা খুলে উঠতে যান। ট্যাক্সি তখন চলতে শুরু করেছে। চলন্ত ট্যাক্সিতে উঠতে না পেরে রাস্তায় ট্রামলাইনের উপর পড়ে যান বাপি। দাবি, সেই আঘাতেই মৃত্যু। শ্লীলতাহানি-টানির কোনও গল্পই নেই।

ড্রাইভার মধুকান্ত এবং হেল্পার মেওয়ালাল, পুলিশি জেরায় যাদের বয়ান হুবহু মিলে গিয়েছিল বাপির বন্ধুদের বিবরণের সঙ্গে, বিরূপ সাক্ষ্য দিলেন আদালতে। সম্পূর্ণ উলটো কথা বলে বাপির মদ্যপ অবস্থায় পড়ে যাওয়ার তত্ত্ব সমর্থন করলেন।

সে-রাতে বাপি মদ্যপ ছিলেন, প্রমাণ করতে আদালতে পেশ করা হল মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরের টিকিট। যাতে আঘাতের প্রাথমিক বর্ণনার পাশাপাশি লেখা ছিল, "two pegs of alcohol"। যার সূত্র ধরে প্রয়াত বাপির অসংযমী জীবনযাপনের সম্ভাব্য তত্ত্বও বিস্তারে আলোচিত হল আদালতে।

বলা হল, Test Identification Parade-এ বাপির বন্ধুরা যে অভিযুক্তদের সরাসরি শনাক্ত করেছিলেন, তা প্রমাণ হিসেবে মূল্যহীন। রাত সোয়া একটার সময় ঘটনাস্থলে এত আলো কোথায় যে মুখ চিনে রাখা যাবে? পুরোটাই গাঁজাখুরি গপ্পো, ফাঁসানো হচ্ছে অভিযুক্তদের।

দুর্ঘটনার কাল্পনিক তত্ত্ব খণ্ডন করতে সরকারি আইনজীবীর সহায় হল তদন্তকারী অফিসার অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাসবুনোট চার্জশিট, যা তৈরি হয়েছিল যত্নশীল অধ্যবসায়ে।

ময়নাতদন্তে জানা গিয়েছিল, আঘাতের তীব্রতায় মাথার খুলিতে একাধিক চিড় ধরেছিল বাপির। শরীরের বাকি অংশে অগুনতি আঘাতচিহ্ন তো ছিলই। ডাক্তার স্পষ্ট লিখেছিলেন, মাথায় এবং শরীরের একাধিক আঘাতের কারণেই মৃত্যু, "ante-mortem and homicidal in nature." দুর্ঘটনা নয়, খুনই।

অতনু জানতেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিয়ে বিচারপর্বে চাপানউতোর অনিবার্য। তাই রিপোর্টের বিষয়ে লিখিত মতামত নিয়েছিলেন ফরেনসিক মেডিসিনের দিকপাল বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. অজয় গুপ্তের। যিনি তখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান।

অধ্যাপক গুপ্ত পোস্টমর্টেম রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখে সবিস্তার মতামত দিলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন, আঘাত গাড়ি থেকে পড়ে হয়নি (nothing to suggest primary and secondary impact of a vehicle)। আরও লিখলেন, বচসা-হাতাহাতি দিয়েই সম্ভবত ঘটনার শুরু, কিছু 'defensive wounds' বা আত্মরক্ষাজনিত ক্ষতচিহ্নও ছিল বাপির শরীরে। কিন্তু মৃতের শরীরের যত্রতত্র অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন জানাচ্ছে, খুন করার উদ্দেশ্যেই লাথি-কিল-ঘুষি চলেছিল লাগামছাড়া। খুলিতে যে তীব্রতায় আঘাত লেগেছে একাধিক জায়গায়, সেটা শুধু ট্রামলাইনে পড়ে গিয়ে সম্ভব নয়। ভারী বুটজুতো জাতীয় কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছিল একবার নয়, বারবার।

উদ্ধৃত করি কয়েক লাইন, "Considering the site, size and disposition of injuries on the person of Bapi Sen, it could be concluded that the injuries resulted from fists, blows and kicks by healthy adult individuals with great force that was sufficiently strong to cause fracture of skull with intracranial and intracerebral injuries."

বাপি কি সে-রাতে মদ্যপান করেছিলেন? আউটডোরের টিকিট যখন বাপির মৃত্যুর পর বাজেয়াপ্ত করেছিলেন অতনুবাবু, তাতে লেখা ছিল, "Beaten by fists, blunt injury, two pegs of alcohol."

আশ্চর্যের, যিনি লিখেছিলেন, তাঁর কোনও সই ছিল না টিকিটে। আরও বিস্ময়ের, এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায়, টিকিটে দু'রকম হাতের লেখা। আলাদা রঙের কালিতে। কোনও রকম রক্ত পরীক্ষা ছাড়াই কীভাবে লিখে দেওয়া হল নির্দিষ্টভাবে দু' পেগের কথা? সে-রাতে বাপিকে নেশাগ্রস্ত প্রমাণ করতে তথ্যবিকৃতি ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল কোনও কোনও মহল থেকে, পরিষ্কার। ডক্টর আগরওয়াল তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন স্পষ্ট, পেশেন্টকে মেডিক্যাল কলেজ থেকে সিএমআরআই-তে আনার পর যখন প্রাথমিক পরীক্ষা করেছিলাম, আমার এতদিনের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, একবারও মনে হয়নি উনি ড্রিঙ্ক করেছিলেন।

আউটডোরের টিকিট এবং বাপির নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে যাওয়ার তত্ত্ব সোজা মাঠের বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন নগর ও দায়রা আদালত। রায়ে আউটডোরের নথি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "Exhibit B has been manufactured.... because of the fact that at that relevant point of time the police officer those who are investigating the case were searching for other documents and evidence..."

আদালত স্বীকৃতি দিলেন Test Identification Parade-এর ফলকেও। ডিসি ডিডি লিখিত তথ্য চেয়েছিলেন Calcutta Electric Supply Corporation (CESC)-এর কাছে। সে-রাতে ঘটনাস্থলে কি বিদ্যুৎবিভ্রাট ঘটেছিল কোনও? যদি না-ও ঘটে থাকে, জায়গাটি কি যথেষ্ট আলোকিত ছিল? ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকা আলোর বিবরণ দিয়ে জানিয়েছিলেন CESC-র চিফ ইঞ্জিনিয়ার, কোনও বিদ্যুৎবিভ্রাট ঘটেনি সে-রাতে। আলোকিত ছিল অকুস্থল, মুখ চিনে রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল সে আলো।

ছেঁদো যুক্তির কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতেছিল দুই প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান। গণেশ বারিক এবং সমীর ঘোষ। ৩৮/১, নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটের 'জয় মাতাদি ট্রেডার্স' নামে এক বেসরকারি সংস্থার দুই নিরাপত্তারক্ষী। যাঁরা রাতপাহারায় ছিলেন এবং ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন।

বিচারক লিখলেন ১ জুলাই, ২০০৪-এর রায়ে, "এটি বিরলের মধ্যে বিরলতম কেসের পর্যায়ভুক্ত। শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর সদস্য হয়েও দোষীরা যেভাবে নির্বিচারে গণপ্রহারে খুন করেছে বাহিনীরই আর এক অফিসারকে, তা অভাবনীয়। শুধুমাত্র দোষীদের বয়স বিবেচনা করে আমি প্রাণদণ্ড দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম, যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হল দোষীরা।"

মামলা গেল হাইকোর্টে। নিম্ন আদালতের রায়কে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সাজা বহাল রাখলেন উচ্চ আদালত। যাঁদের রায়ের প্রথম লাইনটি ছিল, "Once upon a time, there lived in the city of joy a soul who pledged his mortal frame to the battery of assault before a group of revelers when he had sought to prevent their onslaught on a damsel in distress, whom, they had zeroed on after trailing her two wheeler." দুটি রায়েই লিপিবদ্ধ ছিল অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা। নগরপালের প্রতি অনুরোধ ছিল নিখুঁত তদন্তের বিভাগীয় স্বীকৃতি দিতে।

সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করল অভিযুক্তরা। হাইকোর্টের রায়ে চোখ বুলিয়ে সর্বোচ্চ আদালত শুনানির প্রয়োজনই মনে করলেন না। সরাসরি নাকচ করে দিলেন আবেদন।

বাপির মা-বাবা প্রয়াত হয়েছেন। স্ত্রী সোমার চাকরির ব্যবস্থা করেছিল কলকাতা পুলিশ, বাপির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই। বর্তমানে লালবাজারে 'আর্মস অ্যাক্ট' সেকশনে কর্মরতা। বড়ছেলে সোমশুভ্র এখন একুশ। কলেজের পাট চুকিয়ে চাকরির সন্ধানে। ছোট শঙ্খশুভ্র ক্লাস নাইন।

বাপি সেনের মৃত্যুর ইতিবৃত্ত যখন দিনের পর দিন দখল করে রেখেছিল খবরের কাগজগুলোর প্রথম পাতার সিংহভাগ, বিস্তর নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছিল আলোচনায়, কেন প্রকাশ্যে এলেন না নিগৃহীতা? যাঁকে বাঁচাতে গিয়ে অকালপ্রয়াণ পঁয়ত্রিশের তরতাজা অফিসারের, তিনি কেন নেপথ্যচারিণী হয়ে থাকলেন এটা জেনেও, তাঁর সাক্ষ্য অপরাধীদের শাস্তিপ্রাপ্তি নিশ্চিত এবং ত্বরান্বিত করবে? স্বয়ং নগরপালের আন্তরিক আবেদনেও কেন রহস্যাবৃতই রেখে দিলেন পরিচয়? ভোগেননি বিবেকের দংশনে, মনুষ্যত্বের তাড়নায়?

উত্তর অজানাই রয়ে গিয়েছে। তবে নির্বিচার দোষারোপের আগে যুবতীর দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টি বিচার্য বোধহয়। জানতেন, প্রকাশ্যে এলে পড়তে হবে পুলিশি জেরার মুখে, যা অবধারিত গড়াবে আদালতে সাক্ষ্যদান পর্বে। চাননি হয়তো ওই আইনি অণুবীক্ষণে নিজেকে মেলে ধরতে। আইন-আদালত-পুলিশ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-আশঙ্কা তো থাকেই। জানতেন, গসিপ-বুভুক্ষু মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়বেই ব্যক্তিজীবনের কাটাছেঁড়ায়, জেরবার হয়ে যাবেন 'এক্সক্লুসিভ' সাক্ষাৎকারের টানাহ্যাঁচড়ায়। পারেননি হয়তো সেই সম্ভাব্য সামাজিক চাপ সহ্য করার সাহস দেখাতে। সবাই পারেন না। বস্তুত, অধিকাংশই পারেন না। আর সেই 'না-পারা'টার দায় সামাজিক প্রেক্ষিতকে উপেক্ষা করে পুরোটাই ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া কিঞ্চিৎ অন্যায্যই।

এবং এই একুশ শতকের প্রায় বছর কুড়ি কেটে যাওয়ার পরও যখন শ্লীলতাহানির ঘটনায় মধ্যযুগীয় প্রশ্ন ওঠে নিগৃহীতার বেশভূষা নিয়ে, কে বলতে পারে, নামধাম জানলে সামাজিক বিচারসভাই বসে যেত হয়তো কোনও কোনও মহলে, কাঠগড়ায় হয়তো দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত যুবতীকেই, মধ্যরাতে পুরুষসঙ্গীর সঙ্গে নৈশভ্রমণের 'অপরাধে'? সাহস দেখালে ভালই হত, স্বীকার করি। কিন্তু না দেখানোর মধ্যেও তেমন গর্হিত কিছু দেখি না।

বাপি সেনের হত্যা আজও দগদগে ক্ষতচিহ্ন হয়ে আছে কলকাতা পুলিশ পরিবারের মননে। রবিঠাকুর লিখেছিলেন, "সত্যরে লও সহজে"। উনি ক্রান্তদর্শী ছিলেন, ওঁর মতো কি আর ভাবতে পারি আমরা

সাধারণরা, হাজার চেষ্টা করলেও?

সব সত্যি কি আত্মস্থ করা যায় অত সহজে? সহজে কি আর মেনে নেওয়া যায় এক সহকর্মীর এভাবে অকালমৃত্যু, এক অসহায় যুবতীর আব্রু রক্ষা করতে গিয়ে?

দ্য বিলিয়ন ডলার কেস

"নো স্যার! টেলিফোন ইয়েস, টেলিগ্রাফ ইয়েস, টেলিস্কোপ ইয়েস, টেলিপ্রিন্টার ইয়েস, বাট টেলিপ্যাথি?... নো স্যার!"

'সোনার কেল্লা'-র দৃশ্য মগজে হানা দিয়ে যায় লেখা শুরু করতে গিয়ে। কপালজোরে প্রাণে বেঁচে যাওয়া 'আসল' ড. হাজরা, সারা মুখে ব্যান্ডেজ, সাহায্য চাইতে এসেছেন রাজস্থানের থানায় অপহৃত মুকুলের খোঁজে। কৌতুক আর অবিশ্বাসের মিশেল ইনস্পেকটরের চোখেমুখে। ড. হাজরা 'প্যারাসাইকোলজিস্ট' হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে কিছুটা ঘাবড়েই গেলেন অফিসার, এ শব্দ কস্মিনকালে শোনেননি। ড. হাজরা তবু শেষ চেষ্টা করলেন মরিয়া, "আপ টেলিপ্যাথি জানতে হ্যায়?" এর পরই অফিসারের সেই "নো স্যার!..."

বিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন ইয়েস, বিলিয়ন ডলার স্মাইল ইয়েস, বিলিয়ন ডলার ডিল ইয়েস, বাট বিলিয়ন ডলার নোট?

আমাকে-আপনাকে প্রশ্ন করলে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হবে ওই অবধারিত "নো স্যার!" যেমন হয়েছিল আমাদের হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দাদের, আজ থেকে বছর পনেরো আগে বউবাজার থানার একটি খুনের মামলায়। কিনারা হওয়ার পর আদালতের বিচারপর্বে যে কেসের নামই হয়ে গিয়েছিল, 'দ্য বিলিয়ন ডলার কেস।'

কেস নম্বর ৪৯, তারিখ ০৭.০২.২০০৩। থানা, আগেই লিখেছি, বউবাজার। খুনের মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায়।

ধর্মতলা থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ধরে উত্তর দিকে হাঁটা দিলে ডান হাতে পড়ে যদুনাথ দে রোড। মধ্য এবং উত্তর কলকাতার বহু পুরনো রাস্তাগুলি যেমন হয়। চাকচিক্য নেই, আভিজাত্য আছে। নতুনের দেখনদারি নেই, পুরনো সেই দিনের কথা আছে। 'হোটেল পেঙ্গুইন' এই রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলেই। এ অঞ্চলে যথেষ্ট নামডাক আছে এই হোটেলের। গুগল ম্যাপে 'যদুনাথ দে রোড' লিখে সার্চ দিলে দুটো কাছাকাছি দিকচিহ্ন পাবেন। একটা সেন্ট জোসেফস্ কলেজ, অন্যটা এই হোটেল পেঙ্গুইন।

৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩। সকাল গড়িয়ে একটু বেলার দিকে ফোন বাজল বউবাজার থানায়, স্যার, হোটেল পেঙ্গুইন থেকে বলছি। তাড়াতাড়ি আসুন, মার্ডার! থানা থেকে গাড়িতে খুব বেশি হলে পাঁচ মিনিটের দূরত্ব, অফিসাররা ছুটলেন। খবর গেল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে। তড়িঘড়ি রওনা দিলেন হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারাও।

কী ব্যাপার? হোটেলের দু'তলায় রুম নম্বর ১০২, ডাবল-বেড। ৬ তারিখ সকালে দু'জন এসে ওই রুমে ওঠেন। রেজিস্টারে নাম রয়েছে, সুমন বিহারি আর মতিলাল সাউ। সন্ধের দিকে মতিলাল হোটেল থেকে বেরিয়ে যান। রাতে ফিরতে দেখেনি কেউ। পরের দিন সকালে হোটেলের হাউসকিপিং-এর কর্মীরা নিয়মমাফিক ঘরে ঘরে যাওয়া শুরু করলেন। শুধু ১০২ নম্বরের দরজা কিছুতেই খুলছে না, বারবার বেল বাজানো আর 'নক' করা সত্ত্বেও। কর্মীরা অপেক্ষাও করলেন কিছুক্ষণ। হয়তো বেশি রাত করে শুয়েছেন বোর্ডাররা, গভীর ঘুম ভাঙছে না সহজে। আধঘণ্টা পর আবার ডাকাডাকি, দরজায় শুধু টোকা নয়, এবার রীতিমতো ধাক্কা। তবু কোনও সাড়াশব্দ নেই। সন্দেহ এবং আশঙ্কা গাঢ় হল। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা

খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন ম্যানেজার।

হোটেল পেঙ্গুইন

ঘরের ভিতরের দৃশ্য এইরকম। অবিন্যস্ত একটি বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছেন সুমন বিহারি। নাড়ি টেপার দরকার নেই, এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায়, প্রাণহীন শরীর। মৃতের শরীরে সাদা শার্ট, হাফ-হাতা ক্রিমরঙা সোয়েটার, ছাই রঙের ট্রাউজার। নাকমুখ দিয়ে চুঁইয়ে পড়া রক্ত জমাট বেঁধে আছে আশেপাশে। শরীরে আর কোথাও কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই। লক্ষণ যা, সম্ভবত শ্বাসরোধ করে খুন। একটি খালি বিয়ারের বোতল ঘরের এক কোণে। আর ঘরের ডেস্কের উপর ৬ তারিখের 'সংবাদ প্রতিদিন' কাগজটি পড়ে। বারো পাতার কাগজের একটি পাতা নেই।

অনেকেই জানেন হয়তো, অপরাধের ঘটনাস্থলকে পুলিশি পরিভাষায় বলে P.O. (Place of Occurrence)। যে-কোনও অপরাধের তদন্তে P.O. হল সেই প্রথম সিঁড়ি, যার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণেই শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছনোর চাবিকাঠি লুকিয়ে থাকে কখনও কখনও। গোয়েন্দারা কিচ্ছু বাদ দিলেন না ঘরের। বিয়ারের বোতলটি খুঁটিয়ে দেখা হল। 'ডেভেলপ' করার মতো স্পষ্ট হাতের ছাপ নেই। তবু নেওয়া হল, যৎসামান্য যা পাওয়া গেল। ৬ তারিখের 'সংবাদ প্রতিদিন' কাগজটি সংবাদপত্রের অফিস থেকে আনা হল চটজলদি। যে পাতাটি ঘরে পাওয়া কাগজে ছিল না, সেটি দেখা হল মন দিয়ে। নাহ্, তদন্তে সাহায্য করার মতো কিছু নেই। ঘরে পাওয়া কাগজটির বাকি পাতাগুলিতেও কোথাও কিছু নেই হাতে লেখা, যা দিশা দেখাতে পারে।

রুম নং ১০২

বিছানার চাদর-বালিশ-তোশক, ডাস্টবিনের আনাচকানাচ, খাট-চেয়ার-টেবিল, আয়না-সিলিং ফ্যান-এসি, মায় বাথরুমের বেসিন-কমোড-সিস্টার্ন, ঘরের প্রতিটি সেন্টিমিটার-মিলিমিটার চিরুনিতল্লাশি করেও এমন কোনও সূত্র মিলল না, যা দিয়ে আততায়ীর কাছে পৌঁছনোর প্রাথমিক দিকনির্দেশ সম্ভব। মৃতের ট্রাউজারের পকেট থেকে একটি নোটবুক ছাড়া, যাতে বেশ কিছু নাম-ঠিকানা, কিছু ফোন নম্বর। বেশ উৎসাহব্যঞ্জক 'ক্লু', ভাবলেন অফিসাররা।

নোটবুকের আদ্যোপান্ত দেখা হল। লিখে রাখা নাম-নম্বর যাচাই করে নিহত ব্যক্তির শনাক্তকরণ বিশেষ কষ্টসাধ্য হল না। মৃতের নাম সুমন বিহারি নয়। ভুল নামে উঠেছিলেন হোটেলে। আসল নাম তপন দাস, থাকতেন তপসিয়া থানার রাইচরণ পাল লেনে পেয়িং গেস্ট হিসেবে। পূর্ণচন্দ্র সাহা নামের এক মাঝবয়সির বাড়িতে। সাহাবাবু দেখা গেল নিপাট ভদ্রলোক, শনাক্ত করলেন মৃতকে। বললেন, তপন কম কথা বলতেন। মাঝে মাঝে কিছু লোকজন দেখা করতে আসতেন তাঁর সঙ্গে। তপন বলেছিলেন ব্যবসা করতেন, তবে ঠিক কীসের ব্যবসা, বিশেষ কিছু জানেন না সে ব্যাপারে। তবে তপন যে অবিবাহিত, এটুকু জানতেন। আত্মীয় বলতে নিহতের এক ভাইয়ের খোঁজ পাওয়া গেল খড়দহে। যিনি জানালেন, তপনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না দীর্ঘদিন।

দাহ হওয়ার আগে ময়নাতদন্তে পাওয়া গেল প্রত্যাশিত তথ্য, খুন শ্বাসরোধ করেই।

'হোটেলের ঘরে সঙ্গীকে খুন করে আততায়ী ফেরার, অন্ধকারে পুলিশ' জাতীয় হেডিং দিয়ে খবর হল কাগজে। শহরে নাগরিক-নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা শুরু হল। আর অবধারিত চাপ তৈরি হল গোয়েন্দা বিভাগের উপর। কিনারা চাই, এবং দ্রুত। খুনিকে, সে যে-ই হোক, ধরে আনতে হবে।

লাও তো বটে, কিন্তু আনে কে! সত্যিই তখন অন্ধকারেই পুলিশ। হোটেলের কর্মীরা যাঁরা ছিলেন ৬ তারিখ ভোর থেকে পরের দিন ঘরের দরজা ভাঙা পর্যন্ত, কথা বলা হল সকলের সঙ্গে। কেমন দেখতে ছিল

মৃতের সঙ্গীকে? উত্তরে যা পাওয়া গেল, তাতে এক ইঞ্চিও এগোল না তদন্ত। মাঝারি উচ্চতা, গায়ের রং সামান্য চাপা, চেহারা একটু মোটার দিকে। এটুকুতে হয়? এমন চেহারার শ'পাঁচেক লোক তো হোটেলের এক কিলোমিটারের মধ্যে পাওয়া যাবে অনায়াসে। চশমা ছিল? না। টাক ছিল? না। অন্য কোনও বিশেষত্ব চেহারায়, কোনও কাটা দাগ মুখে, বা খুঁড়িয়ে হাঁটার প্রবণতা? না স্যার, মনে পড়ছে না। কথা বলার কোনও বিশেষ ভঙ্গি? খেয়াল করিনি স্যার, হিন্দিতে কথা বলছিল রেজিস্টারে নাম লেখার সময়, তবে বাংলা টান ছিল।

মৃত যে বাঙালি, সে তো জানাই হয়ে গিয়েছে। ধরে নেওয়া গেল, সম্ভাব্য আততায়ী 'মতিলাল'-ও বাঙালি। কিন্তু এই তথ্যের থেকেও ঢের বেশি জরুরি প্রশ্ন, ভুল নাম-ঠিকানা কেন রেজিস্টারে? নিজেদের হিন্দিভাষী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা কেন? অপরাধের মতলব ছিল কোনও? থাকলে কী অপরাধ? সেখানেই কি লুকিয়ে রহস্যভেদের ঠিকানা?

মৃতের পকেট থেকে পাওয়া নোটবুকের প্রতিটি নাম-ঠিকানা, প্রতিটি নম্বরের ঠিকুজিকুষ্ঠি নিয়ে পড়লেন গোয়েন্দারা। প্রায় সব নম্বরই উত্তর চব্বিশ-পরগনার। বিস্তর তথ্যতালাশ করে জানা গেল, নানা ধরনের জালিয়াতিই ছিল মৃত তপনের পেশা বলুন বা জীবিকা। চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বেকার যুবক-যুবতীদের টাকা আত্মসাৎ করা, তাড়াতাড়ি ব্যাংক থেকে লোন পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোক ঠকানো, আরও এই জাতীয়।

পাওয়া গেল আরও একটি তথ্য। সম্প্রতি এক অভিনব প্রতারণা-চক্রের পান্ডাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তপনের। অনেকের মনে থাকতে পারে, সেসময় 'চাল টানা'-র গুজবে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশে। কাগজেও লেখা হয়েছিল বিষয়টি নিয়ে। 'চাল টানা' মানে? গুজব ছড়িয়েছিল, পুরনো দিনের হাঁড়িকুড়ি-বাসনপত্র নাকি চুম্বকের মতো টেনে নিচ্ছে কাছাকাছি থাকা চালের স্তূপকে। আর যে বাসনপত্র চাল টানছে, তা যে ধাতু দিয়ে তৈরি তার দাম নাকি আন্তর্জাতিক বাজারে আকাশছোঁয়া। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার স্বপ্নে একরকম প্রতিযোগিতাই শুরু হয়ে গেল বাড়িতে বাড়িতে। যে যার বাসনপত্র আর চাল জড়ো করে হা-পিত্যেশ করে 'চাল টানা'-র অপেক্ষায়। তৈরি হল অশিক্ষা, গুজব আর লোভের ত্রিভুজ।

সুযোগটা লুফে নিয়েছিল কিছু প্রতারক। যারা ধাতু বিক্রির এজেন্ট হিসেবে পরিচয় দিয়ে ঘরে ঘরে ঢুঁ মারতে শুরু করল। এবং প্রতিশ্রুতি দিল, কিছু টাকা অগ্রিম দিলে তারা বাসনকোসনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেবে। অনেকে বিশ্বাস করে ঠকলেন। উল্লেখ্য, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের অন্যান্য রাজ্যেও বিভিন্ন সময়ে এই 'rice pulling trick'-এর নামে প্রতারণার ঘটনা ঘটেছিল।

উত্তর চব্বিশ পরগনায় 'চাল টানা'-র সক্রিয় চক্রগুলির কয়েকটিকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। কিন্তু লাভ হল না বিশেষ। শ্যামবর্ণ মাঝারি উচ্চতার মোটা লোকের কথা কেউ কেউ বলল বটে, কিন্তু ওটুকুই। নাম-ঠিকানার হদিশ মিলল না। যে তিমিরে ছিল, তদন্ত রয়ে গেল সেই তিমিরেই।

আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন সূত্র অধরা থাকে, তখন হতাশাগ্রস্ত না হয়ে পড়াটা দক্ষ তদন্তকারীর আবশ্যিক গুণের মধ্যে পড়ে। গোয়েন্দারা ঠিক করলেন, আবার শূন্য থেকে শুরু করবেন। ফিরে যাওয়া হল হোটেলে। শুরু হল আর এক প্রস্থ প্রশ্নোত্তর হোটেলকর্মীদের নিয়ে। ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অনন্ত ধৈর্য লাগে একই প্রশ্ন অনেককে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অসংখ্যবার করতে। তবু করে যেতেই হয়, কার কথায় কী কখন বেরিয়ে আসে তার অপেক্ষায়। বারবার তোতাপাখির মতো আউড়ে যেতে হয়, আর একটু ভেবে দেখুন, আর কিছু মনে পড়ছে?

সম্ভাব্য সূত্র বেরিয়েও এল এক কর্মীর কথায়। রুম সার্ভিসে কাজ করেন। জানালেন, ৬ তারিখ দুপুরে এক প্লেট চিকেন পকোড়া আর স্যালাডের অর্ডার এসেছিল ১০২ নং রুম থেকে। এ তথ্য আমরা হোটেলের নথি থেকে আগেই পেয়েছিলাম, অজানা ছিল না। প্রথম অর্ডারের কিছুক্ষণ পর রুম সার্ভিসে এসেছিল দ্বিতীয়

অর্ডার, চিকেন পকোড়া আর এক প্লেট। এটাও জানাই ছিল। বাড়তি কিছু জানালেন কর্মীটি। বললেন, দ্বিতীয় বার যখন খাবার দিয়ে বেরিয়ে আসছেন, দুই বোর্ডারের মধ্যে তর্কাতর্কি হচ্ছিল। কী নিয়ে তর্ক? কর্মীটির যতদূর মনে পড়ছে, 'সার্কাস' শব্দটি শুনেছিলেন কয়েকবার।

'সার্কাস'? এ-ই কি তা হলে সেই কাঙ্ক্ষিত সূত্র? এরা কি সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত ছিল কোনও ভাবে? ঘটনার আগের দিন সার্কাস দেখেছিল? ঠকিয়েছিল কোনও সার্কাসের কর্মীকে?

আজকাল সার্কাসের সেই রমরমা নেই। যখনকার কথা লিখছি, তখন ছিল। শহরে তো বটেই, গ্রামেগঞ্জেও তুমুল জনপ্রিয় ছিল সার্কাস। খুনের ঘটনা ফেব্রুয়ারি মাসের, শীত তখনও ছুটি নেয়নি। সার্কাসের দলগুলিও তাঁবু গোটায়নি। হইহই করে বেরিয়ে পড়া হল, চষে ফেলা হল শহর ও আশেপাশের জেলার নামী-অনামী সার্কাস। সম্ভাব্য আততায়ীর ছবি (বিবরণ অনুযায়ী হাতে আঁকা) দেখিয়ে অনুসন্ধান হল যতরকম ভাবে সম্ভব। ফল কিন্তু শূন্য, আততায়ীর পরিচয়ের সামান্যতম ইঙ্গিতও পাওয়া গেল না।

এ বার? কূলকিনারা পাওয়ার আর রাস্তা কই? হতাশ তদন্তকারী দল ফিরছিল নৈহাটির একটি সার্কাসের খোঁজখবর নিয়ে, শূন্য হাতেই। কেসের কিনারা বোধহয় আর হল না, এই আক্ষেপকে সঙ্গী করে। কিন্তু ওই যে, "কখনও সময় আসে, জীবন মুচকি হাসে, ঠিক যেন পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা..."। কলকাতা ফেরার পথেই কিনারাসূত্র এল আচম্বিতে, পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতোই।

গাড়ি ছুটছিল নৈহাটি পেরিয়ে জগদ্দলের দিকে, ঘোষপাড়া রোড ধরে। পরিশ্রান্ত অফিসারেরা ঠিক করলেন, কোথাও গাড়ি থামিয়ে একটু চা খাবেন। ড্রাইভারের বাড়ি নোয়াপাড়ায়। বললেন, সামনেই সার্কাস মোড়। ওখানে দাঁড় করাচ্ছি, ভাল দোকান আছে। গাড়ি দাঁড়াল জগদ্দলের সার্কাস মোড়ে। চা খেতে খেতে হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখলেন এক অফিসার। অন্যদের বললেন, আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, রুম সার্ভিসের ছেলেটা পুরোটা খেয়াল করেনি। সার্কাস মোড়ের 'সার্কাস'-টুকু শুধু স্মৃতিতে থেকে গিয়েছে। আততায়ী যে প্রতারকদের সঙ্গে ওঠাবসা করেছিল, সবই তো উত্তর চব্বিশ পরগনার। সার্কাস মানে এই সার্কাস মোড় নয় তো? অন্যরা ভাবলেন, সত্যিই তো, কর্মীটি তো আর আড়ি পাততে ঘরে ঢোকেনি। অত খেয়াল করা বা মনে রাখার কথাও নয়। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর 'সার্কাস'-ই হয়তো শুধু মনে করতে পেরেছে। খোঁজ নিয়ে দেখাই যাক না সার্কাস মোড়ের সংলগ্ন এলাকায়।

একাধিক অভিজ্ঞ সোর্স লাগানো হল জগদ্দলে, যারা সিঁধিয়ে গেল এলাকার অলিগলি-মহল্লায়। দিন দুয়েকের মধ্যেই খোঁজ মিলল একজনের, জগদ্দলেই বাড়ি। 'মতিলাল'-এর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে মিল প্রচুর, এলাকায় সুনাম নেই তেমন। আটক করা হল। আসল নাম জানা গেল, বাপি মুখার্জি। খুচরো চড়-থাপ্পড়ও দেওয়ার দরকার পড়েনি। লালবাজারের 'ইন্টারোগেশন রুমে' কড়া পুলিশি ধমকেই কাজ হল। এবং বাপির মুখ থেকে বেরোল সেই পাঁচটি শব্দ, যার থেকে বেশি শ্রুতিমধুর কিছু তদন্তকারী অফিসারদের কাছে হতে পারত না, 'মারবেন না, সব বলছি স্যার!'

যে খুন হল এবং যে খুন করল, দু'জনেই ছিল ঝানু প্রতারক। বাপির সঙ্গে তপনের আলাপ হয় মাসখানেক আগে জগদ্দল স্টেশনে, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, হওয়ারই ছিল। কিন্তু পরিণতি যে এত বিয়োগান্ত হতে যাচ্ছে, দু'জনেরই বোধহয় কল্পনার বাইরে ছিল। তপন একটা বিলিয়ন ডলারের জাল নোট পেয়েছিল তার কোনও প্রতারক বন্ধুর থেকে। এমন জাল মিলিয়ন-বিলিয়ন ডলারের নোট বিক্রি করার চেষ্টা করে ধরা পড়ার বেশ কিছু ঘটনা ইন্টারনেট ঘাঁটলেই পাবেন। অতীতে ঘটেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, ঘটেছে বিদেশেও। বাপির লোভ হয় দেখে। জানত না, এমন নোটের অস্তিত্বই নেই। আবার তপনও ছিল এলেমদার জালিয়াত, 'চাল-টানা'-র ঠগবাজির সঙ্গে বাপি জড়িত জানতে পেরে দুষ্টুবুদ্ধি খেলে যায় মাথায়। বাপিকে বলে, এই ব্যবসায় সে পুরনো খিলাড়ি। তার অনেক চেনাজানা এজেন্ট আছে, যারা দুর্মূল্য ধাতুর বেচাকেনার কারবার করে। বিলিয়ন ডলার নোটপ্রাপ্তি তো এই কারবার করেই। কিছু টাকা দিলে বাপির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে তাদের।

তপন বুনো ওল হলে বাপিও ছিল বাঘা তেঁতুল। বিশ্বাস অর্জনের জন্য কিছু টাকা দিয়েও দেয় তপনকে। তপনও প্রতিশ্রুতিমতো বাপিকে নিয়ে রওনা দেয় কলকাতায় এজেন্টের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে বলে। সম্ভবত ভেবেছিল, ভুলভাল কিছু লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে আরও কিছু টাকা হাতিয়ে নেবে। বাপি অন্য ছক কষেছিল, হোটেলে রাত্রে তপন ঘুমিয়ে পড়লে বিলিয়ন ডলারের নোটটি হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেওয়ার। দুই প্রতারক একে অপরকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে এসে উঠল হোটেলে, নিজেদের আসল নাম গোপন করে।

ঘটনার দিন দুপুরে বিয়ার খেতে খেতেই বাগবিতণ্ডার সূত্রপাত। এজেন্টের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য আরও টাকা দাবি করে তপন। ক্ষিপ্ত বাপি উত্তরে আগে দেওয়া টাকা ফেরত চায়। স্পষ্ট বলে দেয়, তার মনে হচ্ছে, পুরোটাই ধাপ্পাবাজি। দরকার নেই তার বহুমূল্য ধাতু বেচে বিলিওনেয়ার হওয়ার। তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি। তপনের বিলিয়ন ডলার নোট ছিনিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করে বাপি। ধস্তাধস্তি শুরু হয় প্রবল। একসময় মরিয়া বাপি গলা টিপে ধরে তপনের। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে। ঠান্ডা মাথায় ঘরে চাবি দিয়ে বেরিয়ে যায় সূর্য ডোবার পর, পকেটে নোটটি নিয়ে। পালানোর আগে সকালে কেনা 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর একটি পাতা বার করে নিয়েছিল। তাতে মুড়ে রেখে দিয়েছিল চাবিটি, যা উদ্ধার হয় জগদ্দলের বাড়ি থেকেই।

নোটটির কী হল? কয়েকবার একে-ওকে বিক্রি করার ব্যর্থ চেষ্টার পর বাপি বুঝে যায়, কানাকড়িও মূল্য নেই ওই কাগজের টুকরোর। ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল হতাশায়।

কিনারা তো হল, কিন্তু শাস্তি? গ্রেফতার-পরবর্তী তদন্ত একদিনের ক্রিকেট নয়, টি-২০-র বিনোদনী জগঝম্প তো নয়-ই। এ হল ধ্রুপদী টেস্ট ক্রিকেট, যা চূড়ান্ত পরীক্ষা নেয় ক্রিকেটারের ধৈর্য-সংকল্প-মনোসংযোগ-অধ্যবসায়ের। রান আসছে না ওভারের পর ওভার, বোলার দাপট দেখাচ্ছে নিরঙ্কুশ, তবু দাঁত কামড়ে লোটাকম্বল নিয়ে বাইশ গজে পড়ে থাকা। উইকেট পড়ছে না কিছুতেই, নির্বিষ পিচে আয়েশি আধিপত্য কায়েম করছে ব্যাটসম্যান, তবু লেংথ-লাইন অভ্রান্ত রেখে বোলারের অপেক্ষা করা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা অসতর্ক স্ট্রোকের জন্য। তদন্ত-ও তাই, হতাশার জায়গা নেই কোনও। লেগে থাকতে হবে, নয়তো বিচারের শেষে হাতে থাকবে শুধু পেনসিল। মিথ্যে হয়ে যাবে প্রাক্-গ্রেফতার পর্বের ঘাম ঝরানো।

হোমিসাইড বিভাগের সাব-ইনস্পেকটর শুভাশিস ভট্টাচার্য তদন্ত করেছিলেন। পদোন্নতির পর বর্তমানে ইনস্পেকটর হিসেবে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যান্টি-চিটিং শাখায় কর্মরত। তুখোড় তদন্ত করেছিলেন।

'সংবাদ প্রতিদিন'-এর বাকি পাতাগুলি এবং খোওয়া যাওয়া পাতাটি যে একই কাগজের, সেটা প্রমাণ করতে হয়েছিল ফরেনসিক পরীক্ষায় । অভিযুক্তের হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করে তার সঙ্গে হোটেলের রেজিস্টারে থাকা লেখার তর্কাতীত সাদৃশ্য প্রমাণ করা হয়েছিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। যে চাবি দিয়ে ঘরের তালা বন্ধ করে পালিয়েছিল খুনি, বাজেয়াপ্ত হওয়া চাবিটি যে সেটিই, প্রমাণ করতে হয়েছিল তা-ও। চার্জশিটের জাল কেটে বেরনোর পথ ছিল না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় অপরাধী, এখন সংশোধনাগারে।

মামলার নির্যাস? বিষে বিষে বিষক্ষয়!

অতি পুরাতন ভৃত্য

হুইস্কি, রাম, ভদকা, ওয়াইন, ব্র্যান্ডি। পরিপাটি সাজানো সুদৃশ্য ড্রয়িং রুমের লিকার ক্যাবিনেটে। দেশি নয়, বহুমূল্য বিদেশি ব্র্যান্ডের সব। সাধারণ পানীয়পিপাসুর নাগালের বাইরে।

হইহুল্লোড়ের পার্টি শেষে যেমন চেহারা হয় উচ্চবিত্তের বসার ঘরের। সোফার কুশন অবিন্যস্ত। কাচের সেন্টার টেবলে প্লেট গোটাতিনেক, কাঁটাচামচ সমেত। একটায় চিকেন রেশমি কাবাব দু' টুকরো। পনির পকোড়ার আধখাওয়া অংশ আর একটায়। শসা-পেঁয়াজ-টমেটোর কয়েক কুচি তিন নম্বর প্লেটে। ফেলে ছড়িয়ে খাওয়ার পর যেমন পড়ে থাকে অবশিষ্ট। হাত মোছার পর দাগ ধরে যাওয়া পেপার ন্যাপকিন পড়ে ইতিউতি। দুটো গ্লাসে সোনালি তরলের তলানি, হুইস্কি।

তিনটে রংবেরং মোমবাতি জ্বলছে টেবিলে। গড়পড়তা সাইজের নয়, পেল্লায়। ক্রিকেটের উইকেটের থেকে একটু ছোট। পুড়তে সময় লাগে বেশ কয়েক ঘণ্টা। নেভেনি এখনও, জ্বলছে।

এহ বাহ্য। বিশাল ফ্ল্যাটের তিনটে প্রশস্ত বেডরুমের একটার দৃশ্য আমোদপ্রমোদের চিহ্নহীন। একটা লেপে বুক অবধি মোড়ানো, মহিলা পড়ে আছেন মেঝেতে। প্রাণ নেই আর, ঝলকের দেখাতেই বোঝা যায় দিব্যি। ডাক্তার না হলেও চলে।

বয়স যে পঞ্চাশ ছাড়িয়ে একান্ন, বোঝাই যায় না। দেখলে মনে হবে, খুব বেশি হলে কত আর, মাঝচল্লিশ। বয়সানুপাতে মহিলার চেহারা নির্মেদ। শরীরচর্চার অভ্যেস ছিল?

নিজেকে বাঁচাতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আততায়ীর কাছে বিনা যুদ্ধে জমিও ছাড়েননি, স্পষ্ট। লড়েছিলেন আপ্রাণ, প্রমাণ ধরা রয়েছে ডান হাতের মুঠোর মধ্যে আটকে থাকা কয়েক গাছি চুলে। এ চুল খুনির, বুঝতে গোয়েন্দা হওয়ার প্রয়োজন নেই। গলায় শুধু ফাঁসের দাগ নয়। হুক জাতীয় কিছুর আঁচড়ও দেখা যাচ্ছে। নখের কোণে ময়লার ছোপ। নিশ্চিত, ওই ছোপও ঘাতককে প্রতিরোধকালীন। বাঁচতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, জানান দিচ্ছে চোখ-মুখ-ঘাড়-গলায় আত্মরক্ষাজনিত আঘাতের আভাস।

শ্বাসরোধ করে খুন, নির্মম এবং পরিকল্পিত। কে এভাবে গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলল? কে, না কারা?

একটা ল্যাডার দরকার।

হ্যাঁ, তা ছাড়া তো আর উপায়ও নেই। দাঁড়ান, দেখছি।

দুধের প্যাকেটগুলো পড়ে আছে ফ্ল্যাটের বাইরে, মাটিতে। রোজ বাস্কেট থাকে রাখার জন্য। আজ নেই। অযত্নে পিঠোপিঠি পড়ে আছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া, আনন্দবাজার পত্রিকা আর ইকনমিক টাইমস। দুধ যিনি দেন রোজ, কাগজ যিনি বিলি করেন দৈনিক, বেল বাজিয়ে বাজিয়ে ধৈর্য হারিয়ে চলে গিয়েছেন। আরও কত বাড়ি যাওয়ার আছে। সময় কোথায় অপেক্ষার? অন্যদিন একবার বেল বাজালেই দরজা খুলে দেয় নিক্কু। দীর্ঘদিনের কর্মচারী এ বাড়ির। আজ খোলেনি।

ঝাঁকা নিয়ে সবজিওয়ালা অবশ্য অপেক্ষায়। এ বাড়ি তার চেনা। 'বালিগঞ্জের ভাবি' প্রতি সপ্তাহেই টেলিফোনে অর্ডার দেন টাটকা শাকসবজির। যদুবাবুর বাজারের 'মাইতি ভেজিটেবলস'-এর কর্মীকে হুকুমমাফিক সবজি দিয়ে যেতে হয় ফি হপ্তায়। অপেক্ষায় আরও দু'জন। কাজের লোক রাধা আর ড্রাইভার আয়ুব। সকাল ন'টা বেজে গেল। এমন হয়নি কখনও, হওয়ার তো কথা নয়। মেমসাহেবের যদি ঘুম কোনও কারণে না-ও ভেঙে থাকে, নিক্কু তো অন্তত খুলবে। সে কী করছে?

উলটোদিকের ফ্ল্যাট থেকে চিন্তিত মুখে বেরিয়ে এলেন অশোক পোদ্দার। অসিতমোহন লুথরা ব্যবসার কাজে দক্ষিণ ভারত গিয়েছিলেন গত পরশু। ভাইজ্যাগ থেকে ফোনে স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে গত সন্ধেতেও। আজ সকাল থেকে মোবাইলে ফোন করে যাচ্ছেন সহধর্মিণীকে। নো রিপ্লাই। ল্যান্ডলাইনও নিরুত্তর। উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন করেছেন প্রতিবেশী মিস্টার পোদ্দারকে। —দেখুন না একটু, কী হল?

ঘড়ির কাঁটা তখন সোয়া ন'টা ছাড়িয়েছে। অশোকের ফোনেই আয়ুবের সঙ্গে কথা বললেন অসিত লুথরা।

—গাড়িগুলো গ্যারেজে আছে?

—আছে সাব।

'গাড়িগুলো' বলতে দুটো। একটা টয়োটা করোলা, অন্যটা হন্ডা সিটি। দরজা খুলছে না দেখে আধঘণ্টা আগেই একতলার গ্যারেজে ঢুঁ মেরে এসেছেন আয়ুব। এই ভেবে, মেমসাহেব নিজেই কোথাও বেরিয়েছেন হয়তো জরুরি কাজে। সাহেব-মেমসাহেব দু'জনেই তো ভাল ড্রাইভিং জানেন।

গাড়ি গ্যারেজেই? দুশ্চিন্তা আরও বাড়ল মিস্টার লুথরার।

—আয়ুব, এক্ষুনি পারভিন ম্যাডামের বাড়ি যাও। খোঁজ নাও ওখানে আছে কি না।

—জি সাব।

ডোভার রোডে বাড়ি তলোয়ার দম্পতির। সুদেশ আর পারভিন। দু'জনেই সদ্য পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। সুদেশের ব্যবসা চামড়ার সামগ্রী রফতানির। স্ত্রী পারভিন বাড়িতেই জিম চালান বেশ কয়েকবছর ধরে। লুথরা পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা তলোয়ারদের। একে অন্যের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত। পারভিনের জিমে সপ্তাহে তিনদিন ঘাম ঝরাতেন অসিতের স্ত্রী রবিন্দর কউর লুথরা।

না, তলোয়ারদের বাড়িতেও নেই। আয়ুবের সঙ্গেই সুদেশ-পারভিন ছুটে এলেন লুথরাদের ফ্ল্যাটে। ভিড় জমে গিয়েছে ততক্ষণে কেয়ারটেকার আর নিরাপত্তাকর্মীদের। বেরিয়ে এসেছেন অন্যান্য ফ্ল্যাটের আবাসিকরাও। কৌতূহল-উদ্বেগ-আশঙ্কা, গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ।

জি প্লাস সেভেন বহুতল। আটতলায়, টপ ফ্লোরেই ফ্ল্যাট লুথরাদের। মূল দরজায় অটোমেটিক লক। পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে ছাদে। ছাদের মাঝামাঝি একটা বেশ উঁচু দেওয়াল। টপকে এদিক-ওদিক পারাপার অসম্ভব। দেওয়ালটা ছাদকে ভাগ করে দিয়েছে। পশ্চিম অংশটা লুথরাদের ব্যক্তিগত মালিকানায়। সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে কেউ যে ওই অংশে ঢুকে পড়বে, জো নেই।

ঢুকতে হলে ফ্ল্যাটের ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে। যা বসার ঘরের পাশ দিয়ে উঠে গিয়েছে ছাদে। ছাদে লুথরাদের দিকের অংশে একটা গেট থাকে তালাবন্ধ, ভিতর থেকে। ফ্ল্যাটের ভিতরের সিঁড়ির মুখে একটা দরজা, তার পাশে চাবি রাখা থাকে গেটের। সেটা নিয়ে কেউ ছাদে উঠে গেট খুলে দিলে তবেই দেওয়ালের ওপার থেকে লুথরাদের অংশে আসা সম্ভব।

ছাদটা ভারী সুন্দর, চোখের আরাম। এক দিকে সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টার, যেখানে নিক্কু থাকে। কাচ দিয়ে ঘেরা একটা ঘর পাশেই। পোষা দুটো ল্যাব্রাডর, 'ফ্যান্ডি' আর 'বিগল'-এর রাত্রিবাস ওই ঘরেই। ঘাসের এক চিলতে লন, ফুলের বাগান ছিমছাম। পাথরের স্তূপের মধ্য থেকে কৃত্রিম ঝরনা। জল উছলে পড়ছে অনর্গল। মন ভাল হয়ে যায় দেখলে, আরও একটু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

তিনটে গেট আবাসনের। একটা গাড়ি এবং লোকজনের ঢোকার। একটা বেরনোর। তৃতীয়টা ইমার্জেন্সি গেট, বন্ধই থাকে সাধারণত। আবাসিকরা থাকেন দুটো ব্লকে। 'এ' আর 'বি'। দুটো ব্লকই আটতলার। একতলায় পার্কিং-এর ব্যবস্থা। 'এ' ব্লকে প্রতি তলায় তিনটে করে ফ্ল্যাট। Unit-I, Unit —II আর Unit-III। 'বি' ব্লকে দু'তলায় একটা ফ্ল্যাট। বাকি ফ্লোরগুলোয় দুটো করে। নাম ওই 'Unit' দিয়েই। সব মিলিয়ে চৌত্রিশটা ফ্ল্যাট, দুটো ব্লক মিলিয়ে। লুথরারা থাকতেন 'বি'-তে।

নিরাপত্তায় বিনিয়োগে কার্পণ্য করেননি আবাসিকরা। দায়িত্ব দিয়েছিলেন 'ম্যাক সিকিউরিটি সার্ভিস' নামের বেসরকারি নিরাপত্তাসংস্থাকে। গেটে এবং দুটো ব্লকের একতলার রিসেপশনে তিন শিফটে চব্বিশ ঘণ্টা

পাহারায় থাকতেন একজন সুপারভাইজার এবং তিনজন নিরাপত্তাকর্মী।

লিফট এবং সিঁড়ি, দুটো করে প্রতি ব্লকে। একটা লিফট ইমার্জেন্সির জন্য, বন্ধ থাকত। লিফটম্যান ছিল না। আবাসিকরা নিজেরাই লিফট অপারেট করতেন। রিসেপশনে বন্দোবস্ত ক্লোজ় সার্কিট ক্যামেরার। যার সংযোগ প্রতিটি ফ্ল্যাটের সঙ্গে ভিডিয়ো লিঙ্কেজের মাধ্যমে। অপরিচিত কেউ কোনও ফ্ল্যাটে যেতে চাইলে রিসেপশন থেকে ছবি পাঠানো হত সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটে, জানানো হত ইন্টারকমে। সবুজ সংকেত পেলে তবেই ছাড়পত্র মিলত লিফট বা সিঁড়িতে ওঠার। রোজকার পরিচিত গৃহকর্মীদের ছাড় ছিল এই সুরক্ষাবলয় থেকে। আবাসিকদের পরিচিত আত্মীয়বন্ধুদেরও, নিয়মিত যাতায়াতে যাঁদের মুখচেনা হয়ে গিয়েছে।

ফ্ল্যাটে ঢুকতে হলে ছাদে উঠে দেওয়াল টপকানো ছাড়া উপায় নেই, ল্যাডার দরকার একটা। জোগাড় হল। ওই মই বেয়ে কোনওমতে দেওয়াল টপকালেন আয়ুব। চাবি রাখা ছিল যেখানে থাকার। ফ্ল্যাটের ভিতর দিয়ে ছাদে ওঠার সিঁড়ির পাশে। গেট খোলার পর বাকিরা ঢুকলেন। নিক্কু কই? নেই কোত্থাও।

পোষা কুকুর দুটো কাচের ঘরে। তালাবন্দি, অস্থির। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, চিৎকার করছে। কখনও ফ্যান্ডি আর বিগলসকে এভাবে আটকে থাকতে হয় না। প্রতিটা ঘরে দিনভর স্বচ্ছন্দ বিচরণ বাধাহীন। সোচ্চার প্রতিবাদ স্বাভাবিকই।

বসার ঘরে গ্লাস-প্লেট-পানীয় আর বেডরুমে রবিন্দর কউর লুথরার মৃতদেহ। বিবরণ দিয়েছি শুরুতে। বাড়তি যেটুকু বলার, লেপ সরিয়ে দেখা গেল, মৃতার শরীরে ফুলফুল নীলরঙা ম্যাক্সি। পায়ে মোজা। গলায় ফাঁসের দাগ ছাড়া অন্য কোনও শারীরিক হেনস্থা হয়নি।

বেডরুমের আলমারি-ড্রয়ার লন্ডভন্ড। মিসেস লুথরা হাতে হীরের আংটি পরে থাকতেন সবসময়। সেটা তো গেছেই, সঙ্গে ড্রয়ার আর আলমারিতে থাকা প্রচুর গয়নাগাটি। নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা, যা ছিল চামড়ার ব্যাগে। এবং প্রায় চারশো মার্কিন ডলার। মোদ্দা কথা, মূল্যবান যা ছিল, সব লোপাট।

পুলিশে ইনফর্ম করা দরকার ইমিডিয়েটলি, আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে প্রথম মুখ খুললেন অশোক পোদ্দার। সায় দিলেন সুদেশ তলোয়ার, জাস্ট আ মিনিট। লালবাজার কন্ট্রোলের নম্বর সেভ করা আছে আমার। পারভিনের কাছে নম্বর ছিল বালিগঞ্জ থানারও। ফোনের কনট্যাক্টস লিস্টে তিনিও চোখ বোলাচ্ছেন দ্রুত।

সোয়া দশটায় ফোন বাজল কলকাতা পুলিশের কন্ট্রোল রুমে। তারও মিনিটখানেক আগে বালিগঞ্জ থানায়।

—মার্ডার, শিগগিরি আসুন, অ্যাজ় আর্লি অ্যাজ় পসিবল। ওসি আছেন?

—মার্ডার? কোথায়?

ত্রিপুরা এনক্লেভ। ৫৯, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। শহরের অন্যতম অভিজাত এলাকায় উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা আবাসন। পূর্বদিকে এগোলেই বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ। পশ্চিমে হাঁটা দিলে সেন্ট লরেন্স হাইস্কুল আর বালিগঞ্জ মিলিটারি ক্যাম্প।

সিকিউরিটি এজেন্সির রমরমা ব্যবসা ছিল চুয়ান্ন বছরের অসিত লুথরার। GI Securities। পরিধি বিস্তৃত দেশের বিভিন্ন শহরে, এমনকী বিদেশেও।

মিসেস লুথরা

সুখী পরিবার। বড়ছেলে কবীরের বয়স পঁচিশ। দক্ষিণ ভারতের ব্যবসা দেখাশোনা করেন। ছোট অঙ্গদ, কুড়ির কোঠা পেরিয়েছেন সদ্য। পড়াশোনা করেন লন্ডনে। ব্যবসার কাজে মিস্টার লুথরাকে প্রায়ই ট্যুরে যেতে হয়। যেমন গিয়েছিলেন ১৩ ফেব্রুয়ারি। ফেরার কথা ছিল একুশে। ফিরতে হল ১৫ তারিখ দুপুরের ফ্লাইটে, নৃশংসভাবে স্ত্রীর খুন হওয়ার খবর পেয়ে।

ফ্ল্যাটে যার থাকার কথা ছিল এবং নেই, সেই নিক্কু যাদব বছর চব্বিশের যুবক। বিহারের বাঁকা জেলায় বাড়ি। গত সাত বছর ধরে এ বাড়িতে কাজ করছে। যখন স্রেফ ষোলো-সতেরোর কিশোর, তখন থেকে। রান্নাবান্না করে, পাশাপাশি বাজারহাট, টুকটাক ফাইফরমাশ খাটা।

আয়ুব আরও পুরনো, বয়স প্রায় ষাট। লুথরাদের গাড়ি চালায় তেরো বছর হল। মিতা এবং সরস্বতী দুই দিনরাতের কাজের লোক। দু'জনেই ছুটি নিয়েছেন গত ১১ তারিখ থেকে। সাময়িক কাজ চালাতে রাধা বলে এক মহিলাকে দিন সাতেকের জন্য রাখা হয়েছে। প্রতিবেশীদের প্রশ্নের উত্তরে যিনি জানালেন, গত রাতে সাড়ে আটটায় মেমসাহেব ছেড়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন আজ সকাল-সকাল চলে আসতে। যখন রাতে রাধা ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়েছিলেন, ঘরে এক ভদ্রলোক ছিলেন। নিক্কু তো ছিলই।

খুন এই আবাসিক বহুতলেই

কে ভদ্রলোক?

প্রদীপ লাল। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, টিনের কনটেনার তৈরির জমাটি ব্যবসা। থাকেন কাছেই, রোল্যান্ড রোডে। প্রদীপ ও তাঁর স্ত্রী সুনীলার বহুদিনের সামাজিক সখ্য লুথরা-পরিবারের সঙ্গে। অসিত লুথরার সঙ্গে আড্ডা দিতে প্রদীপ এসেছিলেন গতকাল সন্ধে সোয়া সাতটায়। অসিত নেই দেখে ঘণ্টাদেড়েক গল্পগুজব করেছিলেন মিসেস লুথরার সঙ্গে। খুনের খবর পেয়ে ত্রিপুরা এনক্লেভে চলে এসেছেন সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে। গতকাল সন্ধেবেলা এসেছিলেন, নিজেই বললেন প্রতিবেশীদের।

বেশ। কিন্তু নিক্কু কোথায়? ভ্যানিশ?

ত্রিপুরা এনক্লেভ। ৫৯, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড।

রবিন্দর কউর লুথরা হত্যা মামলা। বালিগঞ্জ থানা কেস নম্বর ১৭/২০০৭। তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি। ধারা ৩০২/৩৯৪ আইপিসি। খুন ও লুঠ।

বালিগঞ্জ থানার অফিসাররা পৌঁছলেন। একটু পরেই চলে এলেন হোমিসাইড শাখার অফিসাররা। কন্ট্রোল রুম মারফত খবর ছড়িয়ে গিয়েছে।

এলে কী হবে, ঢুকতে পারলে তো! কমপ্লেক্সের প্রধান ফটক বন্ধ, সামনে জড়ো হয়েছেন আবাসিকরা। পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে। প্রায় লাগোয়া বহুতল 'সপ্তপর্ণী'-র বাসিন্দারাও খবর পেয়ে নেমে এসেছেন। শুনতে হচ্ছে, যা পুলিশকে সচরাচর শুনতে হয় এমন কোনও ঘটনার পর স্পটে গেলে।

এখন আর এসে কী লাভ, যা হওয়ার তো হয়ে গিয়েছে। কী করে আততায়ী এসে খুন করে যায় এভাবে? পুলিশের টহলদারি ভ্যানকে তো চোখেই পড়ে না এ তল্লাটে। আজ আটতলায় হয়েছে, কাল পাঁচতলায় হবে। পরশু চারতলায়।

এসবে অভ্যস্ত আমরা। বুঝিয়েসুঝিয়ে কোনওমতে ঢোকা হল। বাড়তি ফোর্স পৌঁছল লালবাজার থেকে।

ফ্ল্যাটে আঙুলের ছাপ মিলল একাধিক। আলমারিতে, গ্লাসে, সোফার হাতলে, বেডরুমের আয়নায়, ড্রয়ারে। নগরপাল প্রত্যাশিতভাবেই তদন্তের ভার দিলেন গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইড শাখাকে। দায়িত্ব পড়ল তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর আশিক আহমেদের উপর, যিনি বর্তমানে তপসিয়া থানার ওসি।

হইচই হওয়ার কথা খবর ছড়িয়ে পড়ার পর। হচ্ছিলও। মাত্র তো বছর এগারো আগের কথা। শুরু হয়ে গিয়েছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার রমরমা। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে সার দিয়ে সংবাদমাধ্যমের গাড়ি। গোটাদুয়েক ওবি ভ্যানও। 'ব্রেকিং নিউজ' টিভি খুললেই, 'বহুতলে নৃশংস হত্যা, অন্ধকারে পুলিশ' কিংবা 'নাগরিক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে লালবাজার'। এবং নানা মুনির নানা মত।

হোমিসাইড শাখা অবশ্য এসবে বিচলিত হওয়ার কারণ দেখছিল না কোনও। খুব খাটাখাটনি যাবে না

কিনারায়। আগামীকাল বা পরশুর হেডলাইন চোখ বুজলেই দেখতে পাচ্ছিলেন আশিক, 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কিনারা মহিলা খুনের, ধৃত গৃহভৃত্য।'

সমাধান তো স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। সোজা মামলা, 'open and shut case'। ওই নিক্কু বলে চাকরটা খুন করে গয়নাগাটি-টাকাপয়সা হাতিয়ে পালিয়েছে। মার্ডার ফর গেইন। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়, আর কতক্ষণই বা?

মোবাইল ফোন ভারতে এসে গিয়েছে ঘটনার বারো বছর আগে। মুঠোফোন তখন সবার হাতে। নিক্কুরও ছিল। পাওয়াও গিয়েছে নম্বর। যদি বন্ধও করে দেয়, শেষ টাওয়ার লোকেশন আর কল ডিটেলস নিয়ে খুঁজে বার করতে বড়জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা। কপাল ভাল থাকলে তারও কম। কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে technical surveillance-এর। বাংলা কী হবে? প্রযুক্তি-প্রহরা?

আত্মতুষ্টির ঘোর কাটল লুথরাদের ফ্ল্যাটে বসে বেডরুমের স্কেচ ম্যাপ তৈরি করার সময়ই। ফোন বাজল ল্যান্ডলাইনে।

'হ্যালো, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল থেকে বলছি। একজন বাইশ-তেইশের যুবককে এখানে ভরতি করা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ট্রাফিকের লোক দেখতে পেয়ে অ্যাডমিট করেছে। রোড অ্যাক্সিডেন্ট, হেড ইনজুরি আছে। মানিব্যাগে আই ডি কার্ড থেকে ফোন নম্বরটা পেলাম। ছবিও আছে। নাম নিক্কু যাদব। আপনাদের বাড়ির কেউ? আমরা পেশেন্টকে এসএসকেএম-এ ট্রান্সফার করছি, কন্ডিশন আনস্টেবল।'

এটা কী হল? নিক্কু দুর্ঘটনাগ্রস্ত! হিসেব মিলছে না তো! আরও বড় অঙ্ক আছে খুনের নেপথ্যে, যার পরিণতি নিক্কুর প্রাণনাশের চেষ্টা?

টিম ছুটল এসএসকেএম-এ। নিক্কু কথা বলার অবস্থায় নেই, অচৈতন্য। চোখের কোণে জমাট বাঁধা রক্ত। ডাক্তার বললেন, সাইকেল থেকে মুখ থুবড়ে পড়েছে ফুটপাথে। ছড়ে গিয়েছে চোখমুখ। শক্ত কিছুতে আঘাত লেগেছে মাথায়। পেশেন্টের CT Scan জরুরি অবিলম্বে। জ্ঞান ফেরা দরকার। মাথার আঘাত বেশি হলে নিউরোলজিতে রেফার করা হবে, বাড়াবাড়ি হলে আইসিইউ তো রয়েইছে।

তদন্তকারী দলের একজন বললেন, 'জ্ঞান ফিরলে ওর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। একটু আর্জেন্ট। শুনেছেন তো, একটা ব্রুটাল মার্ডার হয়েছে বালিগঞ্জে। ওই বাড়িতে কাজ করত ছেলেটি। ওর স্টেটমেন্ট ভাইটাল।'

ডাক্তারবাবু এমন ভঙ্গিতে তাকালেন, যেন ভস্ম করে দেবেন। মুখে বললেন, 'প্রাণ বাঁচানো বোধহয় আপাতত বেশি ভাইটাল। জ্ঞান ফিরুক, আই মিন, যদি আদৌ ফেরে। তারপর কথা বলবেন।'

কেসের সমাধান সহজেই হতে চলেছে, এমন ধারণা হলে একটা প্রাথমিক ঢিলেঢালা ভাব আসেই। যেটা নিমেষে কেটে গেল নিক্কুর দুর্ঘটনায়। দ্রুত স্থির হল তদন্তের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি। উঠে এল অনেক প্রশ্ন, সম্ভাব্য থিয়োরির জল্পনাকল্পনা।

এক, সিসিটিভি ফুটেজ আদ্যোপান্ত খতিয়ে দেখা দরকার। কে কে কখন ঢুকেছে, কখন বেরিয়েছে লুথরাদের ব্লক থেকে গত চব্বিশ ঘণ্টায়। কিন্তু মুশকিল, রিসেপশনের ক্যামেরার অবস্থানটাই এমন, কেউ রিসেপশনের কাছে এসে কোনও ফ্ল্যাটে যেতে চাইলে তবেই ছবি উঠবে। রোজকার পরিচিত কেউ, সে বাসিন্দাই হোন বা ফ্ল্যাটগুলির নিত্যদিনের কর্মচারী বা নিতান্ত অপরিচিত, পাশ দিয়ে চুপচাপ সরাসরি লিফটে উঠে গেলে ছবি ওঠার প্রশ্ন নেই। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।

অসিত লুথরার নিজের সিকিউরিটি এজেন্সির ব্যাবসা, এই গোড়ার গলদটা চোখে পড়েনি? যাক গে, ফুটেজ দেখতেই হবে খুঁটিয়ে। যা পাওয়া যায়।

দুই, সমস্ত নিরাপত্তারক্ষী ও কাজের লোকদের তালিকা তৈরি করতে হবে। আবাসনের দুটো ব্লকেরই। জানতে হবে তাদের ঠিকুজিকুষ্ঠি। কারওর কি অপরাধের গোপন পূর্বইতিহাস আছে? কারওর সঙ্গে কি কোনও কারণে শত্রুতা তৈরি হয়েছিল লুথরা দম্পতির? জানতে হবে। অসিত লুথরার পেশাগত দিকটাও

দেখা দরকার, কোনও গুরুতর ব্যবসায়িক শত্রুতা ছিল কারও সঙ্গে?

তিন, আবাসিকরাও সন্দেহের বৃত্তে। দ্রুত গতির জীবনযাপনে বিশ্বাসী ছিলেন শ্রীমতী লুথরা। বস্তুত, আবাসনের অধিকাংশ পরিবারই। বিলাসবহুল গাড়ি, জিম-টেনিস-গলফ-ক্লাব-কিটি পার্টি।

খুনের দিনটাও মাথায় রাখতে হবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেনটাইনস ডে। এখন তো বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই কোনও না কোনও দিবস। বছরটা সাতশো তিরিশ দিনের হলেই ভাল হত, মনে হয় এক এক সময়। দ্বিগুণ 'অমুক ডে', 'তমুক ডে' উদযাপনের সুযোগ পাওয়া যেত!

তখন, এগারো বছর আগে, এত হরেকরকম দিবসের চল ছিল না। বিত্তশালী মহলে ভ্যালেনটাইনস ডে-র ধুমধাম অবশ্য তখনকার দিনেও শুরু হয়ে গিয়েছে। লুথরাদের ফ্ল্যাটে পার্টি হয়েছিল সে-রাতে। মিস্টার লুথরার অনুপস্থিতিতে কে বা কারা এসেছিলেন প্রেমদিবসের নৈশবাসরে? কতক্ষণ ছিলেন? আবাসিকদের কেউ? না কি কোনও বহিরাগত? দুটো গ্লাস ছিল টেবলে। মিসেস লুথরা ছাড়া তা হলে কি একজনই ছিলেন? কে?

চার, আবাসিকদের প্রত্যেকের, সমস্ত গৃহকর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীর মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে কল ডিটেলস আর টাওয়ার লোকেশন নিতে হবে। একজনও যেন বাদ না যায়। কে ঘটনার সময় কোথায় ছিলেন, জানতে হবে সব, পুঙ্খানুপুঙ্খ। নিতে হবে প্রত্যেকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট, মিলিয়ে দেখতে হবে ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত নমুনার সঙ্গে।

পাঁচ, সবসময়ের দুই কাজের লোক সরস্বতী ও মিতাকে ডেকে পাঠাতে হবে। দু'জনেরই একই সময় ছুটিতে যাওয়ার দরকার পড়ল? আর রাধাও তো সবে কাজে ঢুকেছে দিন পনেরো হল। এমন তো কতই হয়, উদাহরণ আছে অসংখ্য, বিত্তশালী পরিবারে গৃহকর্মী হিসেবে যোগ দিয়ে সব ঘাঁতঘোঁত জেনে নিয়ে ডাকাতির ছক।

ছয়, এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ, নিক্কুর দুর্ঘটনা। যদি নিক্কুই খুনি হত, যেমন ভাবা হয়েছিল শুরুতে, অনায়াসে সরে পড়তে পারত। যদুবাবুর বাজারের কাছে যখন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখেন ট্রাফিক কনস্টেবল, সঙ্গে কোনও ব্যাগ-ট্যাগ ছিল না। টাকাপয়সা-গয়নাগাটি নিক্কুই নিয়ে থাকলে একটা কিছু তো দরকার সেগুলো ভরার জন্য। সিকিউরিটি গার্ড বলেছেন, নিক্কু পৌনে ছ'টা নাগাদ বেরিয়েছিল বড় চটের ব্যাগ নিয়ে। ব্যাগটা গেল কোথায়? নিক্কু কি এমন কিছু দেখে ফেলেছিল, দরকার ছিল পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেওয়ার? প্রত্যক্ষদর্শী থাকাটা আততায়ীর পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারত?

না কি দুর্ঘটনাটা নিক্কুই সাজিয়েছে? সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রশ্নই নেই, সে যতই চিকিৎসাধীন থাক। ভুললে চলবে না, যেভাবে খুনটা হয়েছে, যদি জড়িত থাকে একাধিকও, পরিচিত কাউকে থাকতেই হবে ষড়যন্ত্রে। হতেও পারে, নিক্কুই আততায়ীর জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল গভীর রাতে।

সাত, আততায়ীর জন্য, না আততায়ীদের জন্য? মিসেস লুথরা শারীরিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। তাঁকে কাবু করা একজনের পক্ষে অত সহজ নয়। নিক্কুর সঙ্গে যোগসাজশে অন্য কেউ বা কারা খুনটা করল, এবং পাছে লুঠের বখরা দিতে হয় বা ব্ল্যাকমেলের শিকার হতে হয়, তাই সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হল নিক্কুকে? অথবা, লুঠপাট স্রেফ পুলিশকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে, আদৌ নয় "murder for gain", অন্য কারণ আছে?

আট, লুথরাদের দাম্পত্য সম্পর্কে কি কোনও টানাপোড়েন ছিল? জানা জরুরি। প্রদীপ লালের ভূমিকাতেও প্রশ্ন। বলছেন, বন্ধু অসিতের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। নেই দেখে মিসেস লুথরার সঙ্গে দেড়ঘণ্টা গল্প করেছিলেন। মোবাইল ফোনের যুগে প্রদীপ জানতেন না, অসিত বাইরে আছেন? বিশ্বাসযোগ্য? আর যদি ধরেও নিই, খোঁজ নেননি সেভাবে, বন্ধুপত্নীর সঙ্গে সৌজন্যের হাই-হ্যালো বা চা-বিস্কুট-কোল্ডড্রিঙ্ক বড়জোর আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটে মিটে যাওয়ার কথা। ঘণ্টাদেড়েকটা একটু বেশি ঠেকছে না?

ধোঁয়াশা অনেক, খটকা বিস্তর। কী কী জানা দরকার, কী কী করা দরকার, নোটবইয়ে তালিকা বানাচ্ছিলেন তদন্তকারী অফিসার আশিক। যত সহজ হবে ভেবেছিলেন, তেমন আর হল কই? পিঠে হাত

রাখলেন ওসি হোমিসাইড, 'কী রে, কী এত ভাবছিস?'

আশিক তাকালেন, 'কমপ্লিকেটেড লাগছে স্যার।'

ঘটনার যা ঘনঘটা, বাস্তবের গোয়েন্দা তো বলবেনই, ২১, রজনী সেন রোডের বাসিন্দা হলেও নিশ্চিত বলে ফেলতেন, "গোলমাল লাগছে রে তোপসে!"

এসএসকেএম হাসপাতালে হত্যে দিয়ে পড়েছিলেন গোয়েন্দারা। নিক্কুর জ্ঞান ফিরল বিকেল নাগাদ। সৌভাগ্যের কথা, CT Scan-এর রিপোর্ট জানাল, মাথায় চোট আছে। তবে ইন্টারনাল হেমারেজ নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে ব্যথা কমার ওষুধ দিয়ে।

—ডাক্তারবাবু, ওর কাছে কিছু জানতে চাওয়ার ছিল। কথাবার্তা বলা যাবে?

—আজই বলতে হবে? পেশেন্ট ট্রমায় আছে এখনও।

—যদি সম্ভব হয়...

—দেখবেন, যেন বাড়তি স্ট্রেস না হয়...

ফের ডাক্তারবাবুর সেই ভস্ম-করা চাউনি। এবার উপেক্ষা করলেন অফিসার। ডাক্তার তাঁর কাজ করবেন। পুলিশ পুলিশের। নিক্কুর বয়ানেই রহস্যভেদের জাদুকাঠি লুকিয়ে থাকতে পারে, ডাক্তার কী করে বুঝবেন?

লালবাজারে তখন যুদ্ধকালীন ব্যস্ততায় কাজ চলছে। গোটা পঞ্চাশেক মোবাইল নম্বরের CDR (Call details record) এবং TL (tower location) সংগ্রহ করার কাজে নেমে পড়েছে technical wing। রাধা, আয়ুব আর নিরাপত্তারক্ষীদের বেশ কয়েকজনকে আনা হয়েছে লালবাজারে। যদুবাবুর বাজারের সবজির দোকানের মালিক মদন মাইতিকেও। তলোয়ার দম্পতি, অশোক পোদ্দার আর প্রদীপ লালও এসে পড়বেন কিছুক্ষণের মধ্যে। আর কাকে কাকে আজই ডাকা প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি হচ্ছে। কেউ না কেউ হয় মিথ্যে বলছেন নয় সত্য গোপন করছেন। বয়ানে অসংগতি খুঁজে বার করতে হবে।

আয়ুব কেঁদেই চলেছেন। এক স্থানীয় সোর্স খবর দিয়েছে, মাইনে বাড়ানো নিয়ে নাকি লুথরাদের সঙ্গে কিছুদিন আগে মনকষাকষি হয়েছিল আয়ুবের। চেপে ধরতে আয়ুব কেঁদে ফেললেন, 'মেমসাহেব আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমি এত বড় পাপ করতে পারি না স্যার!'

নিক্কুকে যখন লালবাজারে আনা হল, ধুঁকছে। চোখেমুখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। দ্বিধায় পড়লেন অফিসাররা, একে বেশিক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা ঠিক হবে? হাঁটতেই তো পারছে না ভাল করে। জলটল খাওয়ার পর নিক্কু যেটুকু বলল, তাতে ফের নাটকীয় মোড় নিল তদন্ত।

'মিস্টার লাল গত রাতে ন'টা নাগাদ চলে গিয়েছিলেন। রাধা সাড়ে আটটার সময়। এক পুরুষ এবং এক মহিলা রাত এগারোটা নাগাদ আসেন। মেমসাহেব নিজেই দরজা খুলেছিলেন। মহিলা জিনস আর টপ পরে ছিলেন। ভদ্রলোক কুর্তা-পাজামা, দু'জনকে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।

মেমসাহেব খুব ভাল রান্না করতেন। চাইনিজ-কন্টিনেন্টাল-মোগলাই, সব রকম রান্না আমাকে শিখিয়েছিলেন। রাতের খাওয়ার পর আমাকে কিচেনেই থাকতে বলেছিলেন। গেস্ট আসার কথা আছে, বলেছিলেন সোয়া দশটা নাগাদ।

ওই দু'জন আসার পর আমাকে কাবাব, পকোড়া বানাতে বললেন। বানালাম, স্যালাডও তৈরি করলাম। মেমসাহেব আর ভদ্রলোক ড্রিঙ্ক করছিলেন। অন্য মহিলা শুধু জল চেয়ে খেয়েছিলেন। আমি ট্রে—আইসবক্স সব সাজিয়ে দিয়েছিলাম। ফ্ল্যাটে প্রায়ই বেশি রাত অবধি পার্টি হত, জাগতে হত আমায়। ভোর রাত অবধি পার্টি চলছিল গতকাল। আমি কিচেনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। তখন ক'টা বাজে মনে নেই। আড়াইটে-তিনটে হবে। মেমসায়েবের সঙ্গে ওই মহিলার তর্ক হচ্ছিল। ভদ্রলোক থামাতে চেষ্টা করছিলেন। মহিলা রেগেমেগে বেরিয়ে গেলেন। কুর্তা-পাজামা পরা ভদ্রলোক থেকে গেলেন। তারপর আর ঘুম হয়নি।

মেমসাহেব আমাকে বলেছিলেন, ভোরভোর বেরিয়ে পুজোর ফুল আর কিছু ওষুধ আনতে। আমি সাড়ে

পাঁচটা-পৌনে ছ'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছিলাম সাইকেল নিয়ে।'

—তখনও ভদ্রলোক ছিলেন?

—হ্যাঁ, মেমসাহেব আর উনি বেডরুমে ছিলেন। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।

—তারপর?

—যখন যদুবাবুর বাজারের দিকে যাচ্ছি ফুল কিনতে, পিছন থেকে একটা বাইক এসে ধাক্কা দিল। মেরে বেরিয়ে গেল। ল্যাম্পপোস্টে মাথা ঠুকে গেল। ফুটপাথে পড়ে গেলাম। তারপর আর মনে নেই।'

গোয়েন্দারা ধন্দে পড়লেন। সকালের শিফটের নিরাপত্তারক্ষীর বয়ানের সঙ্গে নিক্কুর বেরনোর সময়টা মিলে যাচ্ছে। যিনি নিক্কুকে বেরতে দেখেছিলেন ব্যাগ হাতে। খুনটা কি তা হলে হয়েছে নিক্কু বেরিয়ে যাওয়ার পর? না কি তারও আগে, বন্ধ বেডরুমে? মহিলা কে, যিনি রেগেমেগে চলে গেলেন আড়াইটে-তিনটে নাগাদ? কুর্তা-পাজামা পরিহিতেরই বা কী পরিচয়?

—ভদ্রলোককে দেখলে চিনতে পারবি? মহিলাকে?

—নিশ্চয়ই স্যার। একবার দেখলেই পারব।

ছবি-আঁকিয়েকে ডাকা হল সঙ্গে সঙ্গে। বর্ণনা অনুযায়ী শুরু হয়ে গেল 'Portrait Parle' আঁকা। পুরুষ-মহিলা, দু'জনেরই। সমস্ত আবাসিকদের ও কর্মীদের দেখানো হবে সেই ছবি, স্থির হল।

সেই দুপুর থেকে টানা চলছে খোঁজখবর, একে-তাকে জিজ্ঞাসাবাদ। দুপুর-বিকেল-সন্ধে গড়িয়ে রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। ঠিক হল, আজ রাতের মতো ইতি টানা যাক জিজ্ঞাসাবাদে। Technical wing-এর বিশ্লেষণ থেকে কিছু নির্দিষ্ট দিশা আবাসিকদের গতিবিধি সম্পর্কে মিলতে বাধ্য কাল সকালের মধ্যে। সরস্বতী-মিতাকে খবর পাঠানো হয়েছে। কাল এসে পড়বে। অন্য আবাসিকদের বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ বাকি, কাল হবে।

আশিক ভাবছিলেন, যতটুকু দেখা হয়েছে সিসিটিভি ফুটেজ, কুর্তা-পাজামা এবং জিনস-টপ পরা মহিলার ছবি ধরা পড়েনি। তা হলে? অবশ্য সিসিটিভির যা পজিশন, ফাঁকি দিয়ে ঢোকা যায় সহজে। না কি ওই দু'জন ওই ব্লকেরই কোনও আবাসিকদের অতিথি, নিক্কু চিনত না? অনেক ফ্ল্যাটেই ভ্যালেনটাইনস ডে-র খানাপিনা-নাচাগানা হয়েছে সে-রাতে। অপরিচিত অতিথি এসেছিলেন অনেক। তাঁদের মধ্যেই কেউ?

রাত পৌনে বারোটা। তলোয়ার দম্পতি, অশোক পোদ্দার আর প্রদীপ লাল নিজেদের গাড়িতে বেরিয়ে গেলেন আর এক প্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদের পর। রাধা-আয়ুব-নিক্কুর জন্য লালবাজারের ট্রান্সপোর্ট সেকশন থেকে গাড়ি ডাকা হল।

আশিক তখন মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তিনজনেই যেন কাল দশটার সময় উপস্থিত থাকে ত্রিপুরা এনক্লেভে। কথা আরও বাকি আছে। গাড়িতে ওঠার সময় কাঁধে হাত রেখে নিক্কুকে বললেন, ওষুধগুলো খাবি ঠিক করে।

নিক্কু মাথা নাড়ে, এবং একই সঙ্গে মুখ থেকে ছিটকে বেরোয়, 'উঃ!'

আশিক কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নেন, 'কী হল রে?'

—চোট আছে স্যার। ও কিছু নয়।

গাড়িতে উঠতে যাওয়ার মুহূর্তে থামান আশিক।

—এক মিনিট দাঁড়া। কোথায় চোট?

—ঘাড়ের কাছে।

এই সেই মুহূর্ত, ক্লান্তি-শ্রান্তি-ক্ষুধা-তৃষ্ণা বন্ধক রেখে তদন্তকারীর স্নায়ু নিজের অজান্তেই অতিসক্রিয় হয়ে ওঠার।

—দেখা তো, কোথায় চোট?

—পুরনো চোট স্যার।

—পুরনো কি নতুন, আমরা বুঝব। জামাটা খোল।

জামা খোলায় প্রবল অনীহা নিক্কুর চোখমুখে। এতক্ষণের যন্ত্রণাপীড়িত মুখে হঠাৎই দ্বিধা আর উদ্বেগের আঁকিবুকি।

ট্রান্সপোর্ট বিভাগের গাড়ির আর স্টার্ট দেওয়া হল না। তিনজনকেই ফের নিয়ে যাওয়া হল ইন্টারোগেশন রুমে। শার্ট খোলার পর নিক্কুর ঘাড়ের কাছে দেখা গেল গভীর আঁচড়ের দাগ। নখ চেপে বসলে যেমন হয়। ডাক্তাররা স্বাভাবিকভাবেই নিক্কুর মাথার আঘাত নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, হয় গুরুত্ব দেননি ওই আঁচড়কে, নয় নজর এড়িয়ে গিয়েছিল।

—এটা কী করে হল?

—পড়ে গিয়ে স্যার। ওই যে বাইক ধাক্কা মারল সকালে...

—তবে যে বললি, পুরনো চোট? পড়েছিস তো মুখ থুবড়ে। ঘাড়ের পিছনে লাগল কী করে?

নিক্কু ঘামতে শুরু করেছে তখন। আশিকের এক সহযোগী অফিসার তেড়ে যান নিক্কুর দিকে, 'কী হয়েছিল বল? স্যার, দুটো ঠিকঠাক পড়লেই সব উগরে দেবে গড়গড় করে। দেব?'

নিরস্ত করেন আশিক, 'আঃ, হেড ইনজুরি আছে ওর। ছাড়ো, এমনিতেই বলবে।'

এমনিতেই বলল। একটা মিথ্যে ধরা পড়ে গেলে পোড়খাওয়া অপরাধীরও রক্ষণ ভেঙে পড়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা, অভিজ্ঞতা আমাদের। নিক্কু তো তুলনায় নেহাতই আনাড়ি, কী করে ব্যতিক্রম হবে? বলতে শুরু করল, আর স্তম্ভিত গোয়েন্দারা শুনতে থাকলেন।

—বেশ কিছুদিন ধরে প্ল্যান করেছি স্যার। যা মাইনে পেতাম, ওতে কোনওমতে সংসার চলত। বিহারের বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে নিজের হাতে আর কিছু থাকত না। ভাবতাম, এভাবেই কি চাকরগিরিতে জীবনটা কেটে যাবে? সাহেব বাড়িতে থাকলে সম্ভব হত না কিছু করার। মাঝেমাঝেই ব্যবসার কাজে বাইরে যেতেন সাহেব। তেমন একটা সুযোগ খুঁজছিলাম।

—বুঝলাম। কিন্তু খুনটা করলি কেন? চুরি করেও তো পালাতে পারতিস?

—কোথায় পালাতাম স্যার? আপনারা বাড়ি থেকে ধরে আনতেন। ছবি আর ঠিকানা তো সাহেবের কাছে ছিলই। আমার ইচ্ছে ছিল গ্রামে জমিজমা কিনে চাষবাসের। তাই এমন কিছু করতে হত যাতে টাকাটা হাতে আসে, আর ধরাও না পড়ি।

—হুঁ...

—গত কাল সন্ধেয় মিস্টার লাল এলেন, চলে গেলেন পৌনে ন'টা নাগাদ। রাধা তার আগেই চলে গিয়েছিল। আমি খেয়েদেয়ে শুতে গেলাম। মেমসাহেবও ডিনার করে শুয়ে পড়লেন। ফ্যান্ডি আর বিগলসকে রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ ছাদের কাচের ঘরে বন্ধ করে দিলাম। ওদের গলার বেল্টটা নিজের কাছে রাখলাম।

—বলে যা।

—একটা নাগাদ ছাদের কোয়ার্টার থেকে নেমে ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। মেমসায়েবের বেডরুমে নক

করলাম। উনি বেশ কিছুক্ষণ পরে ভিতর থেকে বললেন, 'কে?' বললাম, 'নিক্কু। প্রচণ্ড শরীর খারাপ লাগছে। খুব মাথা ব্যথা করছে। একটা ওষুধ দেবেন?' উনি দরজা খুলে দিলেন। ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওঁর উপর। উনি প্রস্তুত ছিলেন না, হকচকিয়ে গেলেন। আমি ধাক্কা দিয়ে ওঁকে মেঝেতে ফেলে বেল্ট দিয়ে গলায় ফাঁস দিলাম। উনি জিম করতেন, খুব ফিট ছিলেন। ঘাড়ে-পিঠে আঁচড়ালেন। হাতে হিরের আংটি পরে থাকতেন, চোখে খুব জোরে ঘুষি মারলেন।

—চোখের ওই রক্ত জমে যাওয়াটা তা হলে ঘুষি থেকেই?

—স্যার।

—বলতে থাক।

—মেমসাহেব পারলেন না। শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল একটু পরে। এরপর আলমারির চাবি খুলে টাকাপয়সা-গয়নাগাটি নিয়ে ড্রয়ারে থাকা একটা চামড়ার ব্যাগে ভরলাম। সেদিন ভ্যালেনটাইন না কী যেন ছিল। ইশক-মহব্বতের দিন। বেলুন টাঙানো হয়েছিল অনেক ফ্ল্যাটে। প্রায়ই পার্টি হত তো ফ্ল্যাটে। ভাবলাম, পার্টির মতো করে সাজাই বসার ঘরটা।

মেমসাহেব যখন পড়ে আছেন বেডরুমে, আমি কিচেনে ঢুকে রান্না শুরু করলাম। চিকেন কাবাব, পনির পকোড়া। ক্যাবিনেট থেকে বোতল বার করে দুটো গ্লাসে মদ ঢাললাম অল্প। মোমবাতি রান্নাঘরেই ছিল, জ্বালালাম। ন্যাপকিন-কাঁটাচামচ সাজিয়ে টেবিলে এমন ভাবে রাখলাম, যাতে মনে হয় অনেক রাত অবধি পার্টি চলেছিল। সে রাতে রাধা চলে যাওয়ার পর আর কেউ আসেনি ফ্ল্যাটে। সব বানিয়ে বলেছি।

—বেরলি তো ভোর পৌনে ছ'টায়?

—হ্যাঁ, তার আগে বেরলে সন্দেহ করত সিকিউরিটিরা। শীতকাল ছিল, মাথার উপর দিয়ে একটা মাফলার জড়ালাম। যাতে আঁচড়গুলো তেমন চোখে না পড়ে। চটের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। বেরিয়ে STD booth থেকে বাবলুকে ফোন করলাম।

—কে বাবলু?

—বাবলু মন্ডল। বিহারে আমার জেলাতেই বাড়ি, পরিচিত। আলিপুরের অনন্ত অ্যাপার্টমেন্ট থাকে। নরেন্দ্র বাগলিয়া সাহেবের বাড়িতে রান্নার কাজ করে। ওর কাছে টাকাগয়না ভরতি ব্যাগটা রেখে এলাম কাগজে মুড়ে। বাবলু অসুস্থ ছিল কিছুদিন ধরে। ওকে ঘটনার কথা কিছু বলিনি। বলেছিলাম, পরে এসে ব্যাগটা নিয়ে যাব। ও সরল মনে বিশ্বাস করেছিল। চটের ব্যাগটা রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলাম।

—চামড়ার ব্যাগটা বাবলুর কাছেই আছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—এখনই যাব। তার আগে অ্যাক্সিডেন্টের গল্পটা বল।

—যদুবাবুর বাজারের কাছে ইচ্ছে করে সাইকেল নিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মেরেছিলাম। জানতাম, লাগবে। অজ্ঞান হয়ে যেতে পারি। চেয়েওছিলাম, অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি দু'দিন। এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে যাব, ভাবিনি।

—যদি মরে যেতিস বেকায়দায় লেগে?

—ওটুকু ঝুঁকি নিতেই হত স্যার। পালিয়ে গেলে তো সবাই আমাকেই সন্দেহ করত।

নিক্কু দম নেয় একটানে এতটা বলে। আশিক মোবাইলে ধরেন ডিসি ডিডিকে।

—স্যার, কেস ক্র্যাকড। নিক্কু কনফেস করছে। He only created the party scene.

রাতেই লালবাজার রওনা দিলেন গোয়েন্দাপ্রধান। এবং যখন মুখোমুখি হলেন নিক্কুর, আশিক বলে ফেললেন, 'কঠিন জিনিস স্যার। শুনুন একবার গল্পটা। অস্কার না হোক, ফিল্মফেয়ারের বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাওয়ার্ড এর বাঁধা।'

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এগোল প্রত্যাশিত পথে। সে-রাতেই অনন্ত অ্যাপার্টমেন্টে বাবলুর কোয়ার্টারে হানা দিল পুলিশ। বাবলুর কাছ থেকে পাওয়া গেল চামড়ার ব্যাগ। উদ্ধার হল সমস্ত টাকা-ডলার-গয়নাগাটি। যে বেল্টের ফাঁস দিয়ে খুন করেছিল রবিন্দর লুথরাকে, সেটা নিক্কু লুকিয়ে রেখেছিল ছাদের ঝরনার পাথরের চাঁইয়ের নীচে। পাওয়া গেল। পোস্টমর্টেম আর ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের মতামত জানাল, মৃতার গলায় আঁচড়ের দাগ বেল্টের হুক থেকেই হয়েছিল খুব সম্ভব। আর আঙুলের ছাপ তো ছিলই একাধিক জায়গায়। যা হুবহু মিলে গিয়েছিল নিক্কুর সঙ্গে।

খুনের প্রত্যক্ষদর্শী অমিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক প্রমাণ ছিল এতটাই সংশয়াতীত, চার্জশিট-উত্তর বিচারপর্বে

আলিপুর জেলা ও দায়রা আদালত নিক্কু যাদবকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

হাইকোর্টে আবেদন হল যথানিয়মে। সাজা কমে দাঁড়াল যাবজ্জীবন কারাবাসে।

ঘটনা ফিরে দেখলে মনে হয়, বিশ্বাস এক আশ্চর্য অনুভূতি। যখন সত্যিই করে কেউ, চেনা-পরিচয়ের সড়কপথে বেশ কিছুটা দূরত্ব অতিক্রমের পর, তা হয় শর্তহীন। ঠিক যেমন নিক্কুকে করেছিলেন মিসেস লুথরা। স্নেহ করতেন নিখাদ, বিশ্বাসও প্রশ্নহীন। টাকাপয়সা-গয়নাগাটি আলমারিতে খোলা রেখে বেরতেন নিশ্চিন্তে, নিক্কুর ভরসায়।

দূরতম কষ্টকল্পনাতেও ভাবেননি, বিশ্বাসভঙ্গ হবে প্রাণের বিনিময়ে। আর, কে ঘটাবে বিশ্বাসের অপমৃত্যু?

অতি পুরাতন ভৃত্য!

পরিশিষ্ট ১
বিভিন্ন হত্যামামলার বিচার সিদ্ধান্তের নির্বাচিত অংশের প্রতিলিপি

দেবযানী বণিক হত্যামামলার বিচার সিদ্ধান্তের নির্বাচিত অংশ

অনুরাগ আগরওয়াল হত্যামামলায় অভিযুক্ত দেবাশিস ব্যানার্জির
আদালতে জবানবন্দির অংশবিশেষ

বাপি সেন হত্যামামলার বিচার সিদ্ধান্তের নির্বাচিত অংশ,
স্বীকৃতি তদন্তকারী অফিসারের

রমজান আলি হত্যামামলায় বিচার সিদ্ধান্তে তদন্তকারী অফিসারের সপ্রশংস উল্লেখ

রমজান আলি হত্যামামলায় বিচার সিদ্ধান্তে তদন্তকারী অফিসারের সপ্রশংস উল্লেখ

লুথরা হত্যামামলার বিচার সিদ্ধান্তের নির্বাচিত অংশ

পরিশিষ্ট ২
বিভিন্ন হত্যামামলার তদন্তকারী অফিসার

১। **এভাবেও মেরে ফেলা যায়!**
পাকুড় হত্যামামলা
এম এল রহমান

২। **মানুষ বড় শস্তা, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো**
বেলারানী হত্যামামলা
সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

৩। **অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো**
পঞ্চম শুক্লা হত্যামামলা
অনিল ব্যানার্জি

৪। **বণিকবাড়ির অন্তরমহলে**
দেবযানী বণিক হত্যামামলা
সুজিত সান্যাল

৫। **লাশই নেই, খুন কীসের?**
অনুরাগ আগরওয়াল হত্যামামলা
দুলাল চক্রবর্তী

৬। **করুণাধারায় এসো**
নওলাখা হত্যামামলা
সুজিত মিত্র

৭। **মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে**
বিশ্বনাথ দত্ত হত্যামামলা
অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়

৮। **কী বিচিত্র এই দ্বেষ!**
হারুন হত্যামামলা
আশিক আহমেদ এবং বিকাশ চট্টোপাধ্যায়

নির্দেশিকা